ভূমিকা

রবীন্দ্র মন ও রবীন্দ্র সাহিত্য জগতের বিস্ময়। সে মন ও সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশ ও পরম পরিণামকে বিশ্লেষণের সাহায্যে সকল শ্রেণীর পাঠক পাঠিকার সামনে তুলে ধরাই বর্তমান গ্রন্থের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছাবার অভিপ্রায়ে মুখ্যত রবীন্দ্র রচনা, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র এবং বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কবির মতামত ও মন্তব্যের উপর নির্ভর করেছি। এ কারণে গ্রন্থমধ্যে রবীন্দ্র রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। নিজের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্য প্রসঙ্গত যে সকল রবীন্দ্র সমালোচকের মতামত গ্রহণ করেছি বা মতামতের প্রতিবাদ করেছি যথাস্থানে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তবু গ্রন্থশেষে ঋণ স্বীকার করা হল। এ ছাড়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যদি কোন পূর্বসূরীর রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকি তাঁদের নিকটও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

রবীন্দ্র মন ও রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচায়ক গ্রন্থ ইতিপূর্বেও কম রচিত হয়নি। তবে কোন কোন গ্রন্থের বক্তব্য এত বেশী পাণ্ডিত্যভারাক্রান্ত যে, যে উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থগুলি লিখিত সে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ সকল শ্রেণীর পাঠক-মনের সঙ্গে এখনও রবীন্দ্র-মন ও সাহিত্যের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেনি। এ অপরিচয়ের বাধা দূর করবার উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থের আলোচনা ও রচনা-রীতিকে যথাসম্ভব সহজবোধ্য করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমির সকল ... শ্রেণীর পাঠক যদি কবির দুরবগাহ মন ও বিচিত্র সাহিত্যের সঙ্গে সহজ ...চয় স্থাপন করতে পারেন তবেই বর্তমান লেখকের সকল প্রয়াস সার্থক হ...

এ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশে যাঁরা আ... ...ভাবে উৎসাহিত ও আনুকূল্য করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীচিত্তর... ...াধ্যায়, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীরাধাশ্যাম বসু, অধ্যক্ষ শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীধরিত্রীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশক ও আমার যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে কতগুলি মুদ্রাঙ্কন প্রমাদ আত্মপ্রকাশ করায় আন্তরিক দুঃখিত ও লজ্জিত। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থকে সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত করব—বলাই বাহুল্য। আমার প্রতি প্রীতিবশত নির্দেশিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন আমার ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত, এম. এ., শ্রীশুভংকর চক্রবর্তী, এম. এ. শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত, এম. এ. এবং শ্রীকনকেন্দু মজুমদার বি. এ.। তাদের সারস্বত সাধনা জয়যুক্ত হোক—এ কামনা করি। ইতি

২৮, স্কুল রো,
কলিকাতা-২৫

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

এই লেখকের :

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য

সাহিত্য ও শিল্পলোক

দ্বারকানাথ ঠাকুর

(কিশোরীচাঁদ মিত্রের—

Memoir of Dwarkanath Tagore-এর অনুবাদ)

মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা

আমার প্রিয়তম কনিষ্ঠ কন্যা
৺তনুশ্রীর অন্তরঙ্গ সাহচর্যে
জীবনের দশটি বছরের
আনন্দিত দিনগুলি স্মরণে—

মোর নাম
এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক।

—রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রমন

রবীন্দ্র-মন

মহাকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের দিকে চেয়ে থাকি, গুনতে পারি না। সমুদ্রের বুকে তরঙ্গের পর তরঙ্গের লীলা দেখি, গুনতে পারি না। আর গুনতে পারি না রবীন্দ্র-মনের অজস্র চিন্তার রাশি—যে চিন্তা অবাধে বিচরণ করে সীমাহীন আকাশের নীলিমায়, পৃথিবীর অনন্ত বৈচিত্র্যে আর ইন্দ্রিয়াতীত লোকের অজানা রহস্যজগতে।

রবীন্দ্র-মনের কথা বলতে গিয়ে অবশ্য ভাবোচ্ছ্বসিত হল কথাগুলি। কিন্তু ভাবোচ্ছ্বাস সেখানে, যেখানে মনে জাগে বিস্ময়। রবীন্দ্র-মনের বিরাট প্রসারের দিকে চেয়ে আমার বিস্ময়ের সীমা নেই।

দেশকালের সীমায় বিচরণ করেও দেশকালোত্তীর্ণ সে মন। ছায়াচ্ছন্ন অতীত জগতে সে মনের নির্বাধ সঞ্চরণ। ভাব ও কর্মান্দোলিত বর্তমানে সে মন আপাত-বিক্ষিপ্ত। একটা অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে সে মন সহজে বিস্তৃত। সুন্দরের সাধনায় সে মন আনন্দতন্ময়। অসুন্দরের আঘাতে সে মন বিক্ষুব্ধ। সত্যের আলোকে সে মন উদ্ভাসিত। অসত্যের ম্লান ছায়ায় সে মন বিষণ্ণ। প্রেমের অমৃতলোকে সে মন নিত্যযাত্রী। বিরহের দীর্ঘশ্বাসে সে মন ভাবাকুল।

স্বদেশপ্রেমের চেতনায় রবীন্দ্র-মন উদ্দীপ্ত, বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায় সে মন শান্ত। মানবমাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সন্ধানে সে মন তৎপর। আবার নির্যাতিত মানবতার প্রতি সে মন সহানুভূতিশীল। জীবনের প্রতি সে মনের অনুরাগ অপরিসীম, মৃত্যুর প্রতিও একই ভালোবাসা সে মনে। আনন্দ রবীন্দ্র-মনের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু, দুঃখও রবীন্দ্র-মনের নিকট অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। জীবনে সফলতার মত বিফলতারও

সমান মূল্য সে মনের কাছে। দিনের আলোকে রবীন্দ্র-মনে আসে সচলতা, রাত্রির অন্ধকারে সে মন প্রবেশ করে গভীরে।

রবীন্দ্র-মনের সান্নিধ্যে পৌঁছাবার অনেক পথ। সে বিচিত্র পথের কাছে এসে আমার মন দিশেহারা হয়ে যায়। কোন পথ ধরে অগ্রসর হলে সে মনের নাগাল পাব? একবার মনে হয় একান্ত ভাবধর্মী সে মন। শুধুমাত্র অনুভূতির রাজ্যে সে মনের স্বচ্ছন্দ বিহার এবং সে অনুভূতি সৌন্দর্যসচেতন। জগৎ ও জীবনের কঙ্করময় পথে চলতে সে মন নারাজ। বসন্তের চঞ্চল হাওয়ায় যেন উড়ে চলে সে মন রোমান্টিক কল্পনার স্বপ্ন স্বর্গলোকের দিকে। বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তুজগৎ সে মনের সামনে অন্তর্হিত। অস্পষ্ট নীহারিকা জগতে সে মন ভ্রাম্যমাণ।

আবার অন্য পথ ধরি। সে পথে খানিকটা এগিয়ে দেখি সে মনের চেহারা একেবারে পৃথক্। সে মন বাস্তব জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। এত অভিজ্ঞতা কী করে সঞ্চিত হল একটি মাত্র মানুষের সীমাবদ্ধ মনের জগতে বারে বারে বিভ্রান্ত করে এ প্রশ্ন আমাকে। উত্তর খুঁজে পাই দার্শনিক ক্রোচের কথায়। ক্রোচে বলেন—মানবমনের জ্ঞানের উৎস অভিজ্ঞতার জগতে। এ জ্ঞানের প্রকার হল দু রকমের: intuitive knowledge আর logical knowledge. Intuitive knowledge-এর বাহন হল imagination বা কল্পনা, আর logical knowledge-এর বাহন intellect বা মনন। এই কল্পনা ও মননের সংযোগে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের বিপুল-বিস্তার অভিজ্ঞতার জগৎ। Intuitive knowledge-এর সাহায্যে রবীন্দ্র-মন কখনও কল্পনার সৌন্দর্য ও মাধুর্যময় জগতের রস-সম্ভোগে ব্যাপৃত, আবার logical knowledge-এর প্রভাবে সে একই মন বর্তমান জগতের বাস্তব সমস্যাচেতনায় পীড়িত। কোন সময় দেখা যায় নিছক কল্পনা-নির্ভর অভিজ্ঞতা রবীন্দ্র-মনে বিক্ষোভ

সৃষ্টি করেছে, আবার কখনও দেখা যায় একান্তভাবে মননির্ভর অভিজ্ঞতা রবীন্দ্র-মনের স্বাভাবিক রসপিপাসাকে আহত করেছে।

রবীন্দ্র-মন অনুভূতিনির্ভর কল্পনা ও অভিজ্ঞতানির্ভর মননপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে নিত্য আন্দোলিত। রবীন্দ্রনাথের অমর সাহিত্যসৃষ্টি সে দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর। এ দ্বন্দ্ব শুধু রবীন্দ্র-মনের নয়, মানব মনেরই চিরন্তন দ্বন্দ্ব। জটিল মানব-মনের সে নিত্যসত্যের স্বরূপ শিল্পরূপ পেয়েছে রবীন্দ্র সাহিত্যে। রবীন্দ্র সাহিত্য তাই শুধু কোন বিশেষ যুগের নয়, বিশেষ কালের নয়, চিরায়ত সাহিত্যের গৌরবে অমর মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

মহতের স্বপ্ন রবীন্দ্র-মনে, কিন্তু তুচ্ছের মূল্যও সমানভাবে অনুভব করে সে মন। অনন্ত কালের সীমাহীন ব্যাপ্তি উপলব্ধিতে সে মন বিস্মিত। ক্ষণিক কালের মাধুর্য সম্ভোগে সে মন পুলকিত। নিকট রবীন্দ্রনাথের প্রিয়, সুদূর রবীন্দ্র-মনের আকাঙ্ক্ষিত। মানুষের মধ্যে রবীন্দ্র-মন আবিষ্কার করে দেবতার ঐশ্বর্য, আর দেবতাকে কল্পনা করে সে মন মানুষের ছায়ায়। কায়ার মায়া রবীন্দ্র-মনে স্বীকৃত, ছায়ার মায়াও সে মনে সমানভাবে স্বীকৃত।

প্রকৃতির সৌন্দর্য আস্বাদনে রবীন্দ্র-মন চঞ্চল, মানবজীবনের বৈচিত্র্য উপলব্ধিতে সে মন সক্রিয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপজগতের আকর্ষণে রবীন্দ্র-মনে ফোটে সৃষ্টির ফুল, ইন্দ্রিয়াতীত অধ্যাত্মভাবের স্পর্শে সে ফুল পরিণতি লাভ করে চিন্তার ফলে। ভাব ও ভাবনার জগতের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সেতু রচনায় রবীন্দ্র-মন সদাজাগ্রত।

রবীন্দ্র-মনের আকাশ স্বচ্ছ, অনাবৃত। সে আকাশে গভীর রেখা এঁকে দিয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে তাঁর নিজের কালের কত মনীষী। সে আকাশকে রঙীন করে তুলেছে কত কবি কত শিল্পী। সে আকাশে কল্পনার ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণবিলাস, আশার আরক্তিম আলো, নিরাশার কালো ছায়া। অনাদি কালের সপ্তর্ষি সে আকাশে রচনা করে অনন্ত জীবনজিজ্ঞাসার গম্ভীর ভাবমণ্ডল, ধ্রুবতারা

তার অম্লান দীপ্তি বিকীর্ণ করে আভাস এনে দেয় ক্ষয়হীন মহাজীবনের।

স্রোতোমুখর নদীর ক্লান্তিহীন গতিবেগ রবীন্দ্র-মনে। কত দেশ দেশান্তর দিক দিগন্তের মধ্য দিয়ে বিসর্পিত গতিতে দ্রুত চলমান সে মনের গতি। কোন সময় তটপ্লাবী তার তরঙ্গোচ্ছ্বাস, কোন সময় সে শীর্ণ-রেখায় প্রবাহিত। ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্য, প্রাচুর্য ও রিক্ততা—এ দ্বৈতরূপে সার্থক সে মৃত্যুহীন মানস-স্রোতস্বিনী। ক্রমে ক্রমে সে স্রোতস্বিনী গিয়ে মিশে অন্তঃস্তব্ধ কূলহীন জীবনসমুদ্রে—যে সত্তার সৃষ্টিরহস্য আদিতে যেমন অন্তেও তেমনি সকল প্রশ্নের অতীত। সে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্র-মনে ধ্বনিত হয়ে ওঠে নিরাভরণ বাগ্‌রীতিতে পরম বিস্ময়ের বাণী :

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি ?
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল।
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগর তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি ?
পেল না উত্তর ॥

নতুন আলো ঃ জীবন প্রভাত

'জীবনস্মৃতি' পাঠে জানা যায় 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে' গঠিত রবীন্দ্র-মনের বিকাশ সাধনে সহায়তা করেছিল কয়েকটি স্থানিক পরিবেশ। রবীন্দ্র-মনের প্রাথমিক বিস্তৃতি সংগঠনে স্থানিক পরিবেশ-প্রভাবের দুটি অধ্যায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রথম অধ্যায়ে দেখি 'কড়ি-বরগা-দেওয়ালের জঠরের মধ্য হইতে' কিশোর-কবি-মন 'বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ' করেছে পেনেটির গঙ্গাতীরে ছাতুবাবুদের বাগানবাড়ীতে এসে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে যে মন প্রকৃতির উদার রাজ্যে মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সে মন সর্বপ্রথমে মুক্তির স্বাদ অনুভব করল পেনেটিতে গঙ্গার সান্নিধ্যে। সে সুখস্মৃতির কথা মনে করে রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন: 'গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।' বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে এ নব-পরিচয় কিশোর কবির বিকাশোন্মুখ হৃদয়ের গবাক্ষ প্রথমে উন্মুক্ত করল। সে উন্মুক্ত হৃদয়-গবাক্ষের মধ্য দিয়ে সীমাহীন প্রকৃতির সুদূরবিস্তারী আলো এসে পড়ল কিছুকাল পরে পিতার সঙ্গে ডালহৌসী পাহাড়ে ভ্রমণের সময়। প্রকৃতির সে নিঃসীম সৌন্দর্যের মধ্যে কিশোর মনের এ অবাধ সঞ্চরণের কথা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিপ্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালেও ভুলতে পারেন নি। হিমালয়ের অরণ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য বনস্পতির নীরব মহিমা আকাশের নীলিমা এবং জ্যোতিষ্কের রহস্যময় আহ্বান—রবীন্দ্রনাথের কিশোর চিত্তের উপর সেদিন যে মায়াস্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছিল তা সুরে ছন্দে রূপে রসে পরবর্তীকালে অনির্বচনীয় বাণীরূপ পেয়েছে রবীন্দ্র-কাব্যে এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতে।

রবীন্দ্র-মনের উপর স্থানিক পরিবেশ-প্রভাবের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হল হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে।

প্রকৃতির সঙ্গে এ নব-পরিচয় কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের মনের অনেক সঞ্চিত গ্লানি মুছে দিয়েছিল আর সে মনকে মুক্তি দিয়েছিল একটি বৃহত্তর চেতনালোকে সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবনের এ অধ্যায়ে মানবমনের রহস্যলোকে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়নি রবীন্দ্র-মন —এ কথা মনে করা অহেতুক নয়। মানবমনের রহস্যলোকে প্রবেশ করবার সে অপ্রত্যাশিত শুভক্ষণ এলো যখন তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রার পূর্বে কিছুকালের জন্য আমেদাবাদ ও বোম্বাই বাসের সুযোগ পেলেন। গুজরাট ও মহারাষ্ট্র ভৌগোলিক ও জাতীয় জীবনের নানা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরিণত মনকেও উত্তর-জীবনে আকর্ষণ করেছে বারবার। মহারাষ্ট্রের শৌর্য ও গুজরাটের শিল্পবোধের প্রতি কবি উত্তরকালে ব্যক্তিগতভাবে শুধু শ্রদ্ধান্বিতই হননি—সে শৌর্য এবং শিল্পচেতনাকে বাঙালী চিত্তে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়াসও পেয়েছিলেন—এ তথ্য অনেকেরই জানা। কিন্তু বিলাত যাত্রার পূর্বে স্বল্পকালের জন্য (ছয়মাস) আমেদাবাদ ও বোম্বাই-প্রবাস তরুণ-কবি রবীন্দ্রনাথের মনে যে আবেগোচ্ছ্বসিত মানবিক আবেদন সৃষ্টি করেছিল—ভাববিলাসী রবীন্দ্র-মনকে জীবন-চেতনাহীন অনুভূতি ও সূক্ষ্ম কাল্পনিকতার বায়ুমণ্ডল থেকে মুক্ত করে যে কামনা-বাসনা আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনাময় সজীব জীবনলোকে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল—সে প্রসঙ্গই হল আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়। বস্তুতপক্ষে শাহিবাগের বাদশাহি প্রাসাদ এবং বোম্বাইয়ের সুন্দরী তরুণী আন্না তরখড়ের অন্তরঙ্গ সাহচর্য মানব-মনের গোপন রহস্যের সন্ধান দিয়ে জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের মনে একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত করেছিল।

সাময়িকভাবে শাহিবাগের বাদশাহ প্রাসাদে প্রায়-নিঃসঙ্গ বাস

রবীন্দ্র-মনের বিকাশধারায় তিন দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, এ সময়টা ছিল অনাস্বাদিত পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের তরুণ-মনের কল্পনা বিকাশের প্রথম যুগ। দ্বিতীয়তঃ, অখণ্ড অবকাশের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য জগতে সাহিত্যিকদের জীবনলোকে প্রবেশের প্রস্তুতির যুগ। তৃতীয়তঃ, নিজের দেওয়া সুর সহযোগে সঙ্গীতের মধ্যে প্রথম জীবনমুক্তি আস্বাদনের যুগ।

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ এ বাদশাহি প্রাসাদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> শাহিবাগে জজের বাসা। ইহা বাদশাহি আমলের প্রাসাদ বাদশাহের জন্যই নির্মিত। এই প্রাসাদের প্রাকারপাদমূলে গ্রীষ্মকালের ক্ষীণ-স্বচ্ছস্রোতা সবরমতী নদী তাহার বালুকাশয্যার একপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নদীতীরের দিকে প্রাসাদের সম্মুখভাগে একটি প্রকাণ্ড খোলা ছাদ। মেজদাদা আদালতে চলিয়া যাইতেন। প্রকাণ্ড বাড়ীতে আমি ছাড়া আর কেহ থাকিত না—শব্দের মধ্যে কেবল পায়রাগুলির মধ্যাহ্নকুজন শোনা যাইত। তখন আমি যেন একটা অকারণ কৌতূহলে শূন্য ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

এ হল ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। রবীন্দ্রনাথ তখন সতের বছরের কল্পনাবিলাসী তরুণ যুবক। প্রথম যৌবনে অকারণ কৌতূহলে নির্জন বাদশাহি প্রাসাদে সে নিঃসঙ্গ ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনে ব্যর্থ হয় নি। এ বাদশাহি প্রাসাদের স্মৃতি, বাদশাহি প্রাসাদে বিস্মৃত অতীত যুগের জীবনসম্ভোগ এবং ব্যর্থ কামনার কাল্পনিক আখ্যান কবি-কল্পনার হীরক দীপ্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের পরিণত যৌবনে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অমর কাহিনীতে। সে ১৩০২ বঙ্গাব্দের কথা (১৮৯৫)। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চৌত্রিশ বৎসর।

'ক্ষুধিত পাষাণে' বাদশাহি প্রাসাদ ও সবরমতী নদী

কল্পনাবিলাসী শিল্পী রবীন্দ্রনাথের তুলিতে রূপান্তরিত হয়েছে এভাবে ঃ

নির্জন পাহাড়ের নীচে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি (সংস্কৃত স্বচ্ছতোয়ার অপভ্রংশ) উপলমুখরিত পথে নিপুণা নর্তকীর মতো পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড়-শত-সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেত প্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে—নিকটে কোথাও লোকালয় নাই।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় শা-মামুদ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জন স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন।······প্রথম প্রথম আসিয়া এই পরিত্যক্ত পাষাণ-প্রাসাদের বিজনতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভয়ংকর ভারের মতো চাপিয়া থাকিত······

'প্রাসাদের প্রাকারপাদমূলে' তরুণ রবীন্দ্রনাথের চোখে-দেখা 'গ্রীষ্মকালের ক্ষীণস্বচ্ছস্রোতা সবরমতী নদী' শিল্পীর কল্পনা-স্পর্শে জেগে উঠেছে প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ একদা-সজীব শুস্তা নদীরূপে ঃ

হঠাৎ গুমট্ ভাঙ্গিয়া হু-হু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরার কেশদামের মত কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বলো আর সত্যই বলো, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল।···

সে নির্জন বাদশাহি প্রাসাদে কৌতূহলী তরুণ রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গ ভ্রমণ পরবর্তীকালে চিরন্তন প্রেমাবেগের কবি রবীন্দ্রনাথের মনে সৃষ্টি করেছে বিস্মৃত অতীত যুগের প্রেতলোকের রাগিণী ঃ

আমি কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ···আমি সে দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম—ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল

সাদা পাথরের উপর আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কী সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের সিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্কণ, কখনও বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতিদূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিক দোলকগুলির ঠুন্‌ঠুন্ ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুল্‌বুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চারিদিকে একটা প্রেত-লোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

এ স্বপ্ন-সুরভিত কল্পনার রাজ্য থেকে অনুভূতিশীল কবিমন ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হল ব্যক্তিসৌরভমধুর রোমান্টিক প্রেমের জগতে :

এই স্বপ্নখণ্ডের আবর্তের মধ্যে,—এই ক্বচিৎ হেনার গন্ধ, ক্বচিৎ সেতারের শব্দ, ক্বচিৎ সুরভিজলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মতো চকিতে দেখিতে পাইলাম। তাহার জাফ্‌রান রঙের পায়জামা এবং দুটি শুভ্র রক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটিপরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির-ফুল-কাটা কাঁচুলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লাল টুপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।
সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতিরাত্রে নিদ্রার রসাতল রাজ্যে স্বপ্নের জটিল পথসঙ্কুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

বলা বাহুল্য, এ রোমান্টিক স্বপ্ন, রহস্যময় পাষাণপুরীতে আত্মবিস্মৃত এ ভ্রমণ, এ অতীত জীবনরাজ্যের স্পর্শ—তুলার মাশুল আদায়কারী অজানা যুবকের নয়—শাহিবাগে সত্যেন্দ্রনাথের নির্জন বাসগৃহে ভ্রাম্যমাণ কৌতূহলী তরুণ রবীন্দ্রনাথের। আমেদাবাদের সে রোমান্টিক স্মৃতিবিজড়িত প্রাসাদে বাসের সুযোগ না হলে আমরা রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মত এত উচ্চশ্রেণীর গল্প পেতাম কিনা সন্দেহ।

এ রোমান্টিক মানস ভ্রমণ ছাড়াও শাহিবাগের বাদশাহি প্রাসাদেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম প্রবেশ করেন স্বাধীনভাবে ইংরেজী

ও সংস্কৃত সাহিত্যজগতে। দিশী ও বিদেশী সাহিত্যের মর্মমূলে প্রবেশ করবার এত সচেতন প্রয়াস রবীন্দ্রজীবনে ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি। কোন সময় কবি-মন টেনিসনের কাব্যের উপর Dore-এর আঁকা ছবিগুলির পাতায় ঘুরে ঘুরে রস সংগ্রহ করে, কোন সময় হেবরলিন সম্পাদিত শ্রীরামপুরের ছাপা কালিদাসাদি সংস্কৃত কবিদের কাব্যসংগ্রহের মধ্যে কবি ডুবে থাকেন, আবার কোন সময় টেন্ (Taine) প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থপাঠে আত্মনিমগ্ন থেকে নিজেকে বিলিতী শিক্ষার উপযুক্ত করে তুলতে সযত্ন হন। আবার কোন সময় ইংরেজী সাহিত্যের বিষয়কে বাংলা গদ্যে-পদ্যে ভাষান্তরিত করে 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপতে পাঠান। দান্তে, পিত্রার্ক, গ্যেটে প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মনীষী লেখকদের বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রতিও এ সময় কৌতূহলী হয়ে উঠেন তরুণ কবি। শুধু সাহিত্য-জগতে নয়, সঙ্গীত-জগতেও সার্থকভাবে পরিক্রমা করে নিঃসঙ্গ কবি-মন। শুক্লপক্ষের রাত্রির নৈঃশব্দ্যের ভিতর সবরমতীর বালুকা-বেলায় লুটিয়ে-পড়া জ্যোৎস্নার সঙ্গে কবিচিত্ত আত্মীয়তা স্থাপন করে—উৎসারিত হয় কবিকণ্ঠে সঙ্গীতের ধারা ঃ

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো !
ঘুমঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলায় গো।

এ গানটিতে এবং আরও একটি গানে সুর দিয়ে গেয়ে কবি অনুভব করলেন তাঁর নিঃসঙ্গ মনের মুক্তির অন্যতম বাহন হল সঙ্গীত। যে ভাবগর্ভ সঙ্গীতের জন্য উত্তর জীবনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হন, সে সঙ্গীত রচনার শক্তি বিষয়ে আত্ম-আবিষ্কার ঘটে প্রথমে আমেদাবাদের এই বাদশাহি প্রাসাদেই।

এর পরে পাণ্ডুরঙ্গ পরিবারের সান্নিধ্যে দু মাসের জন্য তরুণ কবির বোম্বাই প্রবাস। ইংরেজী আদব-কায়দা ও কথাবার্তায় অনভিজ্ঞ তরুণ রবীন্দ্রনাথকে বোম্বাই পাঠাবার পিছনে সত্যেন্দ্রনাথের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভ্রাতাকে পাণ্ডুরঙ্গ পরিবারের সংস্পর্শে রেখে ইংরেজীয়ানায় পাকাপোক্ত করে তোলা। পাণ্ডুরঙ্গের বিলাত-ফেরৎ সুন্দরী তরুণী কন্যা আন্না নিলেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার ভার। আন্নার অন্তরঙ্গ সাহচর্যে তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনে জেগে উঠল যৌবনস্বপ্ন। এতদিন প্রকৃতির সাহচর্যে কবিমনে জেগেছিল সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনা। এবার আবেগময়ী সুন্দরী তরুণীর উষ্ণ হৃদয়ের স্পর্শে রবীন্দ্র-মনে জাগ্রত হল নারী-প্রেমের রহস্যচেতনা। আত্মীয়-পরিজনের গণ্ডীর বাইরে সুন্দরী নারীর সঙ্গে এ হৃদয়-বিনিময় রবীন্দ্র-মনের ক্রম-বিকাশের দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তখন থেকে রবীন্দ্র-কাব্যে লাগল মানবিকতার স্পর্শ। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন, "শৈশব-সঙ্গীতের কয়েকটি গানের মধ্যে এই তরুণীর মর্মবেদনা কবির ভাষায় রূপ পাইয়াছে। 'ফুলের ধ্যান,' 'অপ্সরার প্রেম' কবিতা দুটি এই বেদনাভারে নত। রবীন্দ্র-নাথের 'শুন, নলিনী খোল গো আঁখি' গানটি ইহারই উদ্দেশ্যে রচিত, তাহা কবি তো স্বয়ং ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। আর একটি গান এই তরুণী স্মরণে রচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়—'আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, সখী, আমারে জাগায়ো না'।"

নারীর দুই রূপ পরিকল্পনা উত্তরকালে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যকে একটি পরম মূল্যে মূল্যবান করেছে। এক রূপে নারী প্রেয়সী—আপন বক্ষোরক্তের বিপুল উন্মাদনায় পুরুষের চিত্তে জাগিয়ে তোলে কামনার ঢেউ। আর এক রূপে নারী শ্রেয়সী—এই রূপে শান্তশ্রী কল্যাণী মূর্তি নিয়ে চিরন্তনী মমতাময়ী নারী ভোগচঞ্চল পুরুষকে আকর্ষণ করে সংযমের পথে—কল্যাণের পথে। কবির প্রথম যৌবন-প্রণয়িনী আন্না তরখড় কবির জীবনে এমনি একজন প্রেয়সী নারী—

যে নারীর উষ্ণ সান্নিধ্যে এসে কবির যৌবনভীরু অন্তরে জেগেছে নারী-যৌবন-চেতনার ফেনিল উচ্ছ্বাস :

শিথিল-বসন তার—ওই দেখ চারিধার
স্বাধীন বায়ুর মত উড়িতেছে বিমানে—
যেথা যে গঠন আছে, পূর্ণভাবে বিকাশিছে
যেখানে যা উঁচুনিচু প্রকৃতির বিধানে।
ও আমার নলিনী গো—সুকোমলা নলিনী,
মধুর রূপের ভাস—তাই প্রকৃতির বাস
সেই বাস তোর দেহে নলিনী গো নলিনী !*

প্রথম যৌবনের এ প্রেয়সী নারী নলিনী হলেন আন্না তরখড় [দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৪]। মহারাষ্ট্রের একটি আবেগময় সজীব হৃদয় জীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্র-চিত্তকে আকর্ষণ করেছিল প্রকৃতির উদার-সুন্দর জগৎ থেকে মানবচিত্তের অতলান্ত রহস্যময়তার অভিমুখে। এর পর জীবনের নানা পর্যায়ে জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ সে রহস্যভেদের চেষ্টা করেছেন তাঁর কাব্যে নাটকে ছোট-গল্পে ও উপন্যাসে।

গুজরাট-মহারাষ্ট্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পালা শেষ হল যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর বিলাত যাত্রা করলেন।

এর পরবর্তী পাঁচ বৎসরে রবীন্দ্র-জীবনে আরও কত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে দেশে ও বিদেশে—কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে রবীন্দ্র-মন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নতুন জগতে প্রবেশ করল বোম্বাই প্রদেশের একান্তে অবস্থিত সমুদ্রতীরবর্তী কারোয়ার নগরীতে এসে। এক দিকে কারোয়ারের রম্য প্রকৃতির নীরব আকর্ষণ আর এক দিকে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে আত্মীয়-সমাগমে নিত্য উৎসবের

*অপ্রকাশিত কবিতা। রবীন্দ্র-জীবনীর প্রথম খণ্ডের ৭৫পৃষ্ঠায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত।

আয়োজন—শিল্পীর মনে এনে দিল নবসৃষ্টির চেতনা। নিত্য নতুন কবিতা নাটক ও সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্র-মন এ সময় খুঁজে পেল অভিনব মুক্তির ইঙ্গিত।

এ কারোয়ারে বাস করবার সময়ই রচিত হল রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের উল্লেখ্য কাব্যনাট্য 'প্রকৃতির পরিশোধ' [গ্রন্থপ্রকাশ ১২৯১ (১৮৮৪)]। কাব্য হিসেবে 'প্রকৃতির পরিশোধে'র মূল্য যাই থাক না কেন রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর ভবিষ্যৎ কাব্যসাধনার মূল সুর সর্বপ্রথম ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল এ কাব্যধর্মী নাটকে। অসীমের পথ থেকে সীমার বন্ধনের মধ্যে এসে প্রাণের অনন্ত মুক্তির সন্ধান পেয়েছিল 'প্রকৃতির পরিশোধে'র সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর এ মানস পরিবর্তন হৃদয়-রহস্যের গভীরে ভ্রাম্যমাণ তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের মানস-মুক্তিরই প্রতীক। স্বীয় মনের এ বিস্তৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উত্তর জীবনে জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন :

> আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধতার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাইরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির পরিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করে লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটি ভূমিকা…সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা।

রবীন্দ্র-দৃষ্টির সমুখ থেকে মোহের এই কালো যবনিকা সরিয়ে দেবার জন্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কারোয়ারের উদার প্রকৃতি। এ সম্পর্কে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে, এবং এইজন্য যে এই

সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা।

কারোয়ারে বাসকালে আরও একটি দিন রবীন্দ্রজীবনে উল্লেখযোগ্য। একদিন শুক্লপক্ষের গোধূলিতে কারোয়ারের অদূরে কালা নদীব উজানপথে স্বজনসহ নৌকা-ভ্রমণের সময় সে নদীর তীরবর্তী শিবাজীর প্রাচীন গিরি-দুর্গ দেখবার সুযোগ হয়েছিল তরুণ রবীন্দ্রনাথের। এ হিন্দু বীরের অপরিসীম শৌর্য এবং অনির্বাণ দেশপ্রেম পরবর্তী কালে রবীন্দ্রচিত্তে স্বাদেশিকতার যে জ্বলন্ত উন্মাদনা জাগিয়েছিল তার পরিচয় আছে 'শিবাজী উৎসব' কবিতায়। সকলেই জানেন, শিবাজীর অখণ্ড ভারত-স্বপ্নকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙ্গালী-প্রাণের রাখী-বন্ধনের স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারত-পথিক রবীন্দ্রনাথ।

দ্বিতীয় পর্বে সপরিবারে বোম্বাইয়ের অন্তর্গত শোলাপুরে রবীন্দ্রনাথের সাময়িক বাস বিশেষভাবে স্মরণীয়। সে ১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসের কথা। রবীন্দ্রনাথ তখন আটাশ বৎসরের যুবক—বিবাহিত এবং দুই সন্তানের পিতা। শোলাপুরে বাসকালেই রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক নাটক 'রাজা ও রাণী'। এ ছাড়া তাঁর প্রথম সার্থক কাব্য "মানসী"র 'প্রকাশ বেদনা' (১২৯৬) নামক কবিতাটিও এ সময় লিখিত হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠক মাত্রই জানেন, রাজা ও রাণী নাটকেই জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট একটা রূপ পেয়েছে। এ নাটকে প্রথম যৌবনের ভাবালুতাপূর্ণ কাব্যোচ্ছ্বাস নেই—মানবপ্রেমের ধ্বংসাত্মক ও কল্যাণময় প্রকাশের প্রতি মননশীল ও শিল্পময় ইঙ্গিত করা হয়েছে এ নাটকে।

এর পরেও রবীন্দ্রনাথ বহুবার এসেছেন গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে—কোন সময় সংস্কৃতির দূত হিসেবে, কোন সময় কার্যোপলক্ষে। এ দুই মহান দেশের সঙ্গে তাঁর প্রাণের বন্ধন ক্রমশঃ হয়েছে নিবিড়তর—এ

নিকট-সম্পর্কের ফলে তাঁর মনের রুদ্ধ দুয়ার ক্রমশঃ হয়েছে উন্মোচিত। ১৯২০ সনে মহাত্মা গান্ধীর আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে গেলেন আমেদাবাদে গুজরাটি সাহিত্য সম্মেলনের পৌরোহিত্য করবার জন্যে। এবার গুজরাটের কোন কোন নারী-প্রতিষ্ঠানের নিমন্ত্রণে সে দেশের নারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন কবি। ফিরবার পথে কবি যান একবার কাথিবাড়ে। সেখানকার ভজন গান মুগ্ধ করল অনুভূতিশীল কবিচিত্তকে—তিনি কাথিবাড়ের একজন মাঙ্গবা-ভজনকারিণীকে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে এনে আশ্রম-বাসীদের কাথিবাড়ের লোকসঙ্গীত শোনবার সুযোগ দিলেন। ফিরবার সময় কবি ঘুরে এলেন বোম্বে বরোদা ও সুরাট। সর্বত্রই জনসমাজের কাছ থেকে পেলেন তিনি অফুরন্ত প্রীতি ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্মান। এ দুটি মহান দেশের সঙ্গে কবির হৃদয়-গ্রন্থি আরো নিবিড়ভাবে বাঁধা পড়ল। ১৯২২ সনে কবি আবার বোম্বাই গেলেন। এবার পারসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশার ফলে শান্তিনিকেতনে পারসিক সংস্কৃতিকেন্দ্র স্থাপন করবার বাসনা জাগে রবীন্দ্র-মনে। সে বৎসরই ৪ঠা এপ্রিল কবি আমেদাবাদে গিয়ে মহাত্মাজীর সবরমতী আশ্রম দর্শন করেন। মহাত্মাজী তখন ইংরেজের কারাগারে। মহাত্মাজীর অনুপস্থিতিতে তিনি আশ্রমবাসীদের সামনে যে ভাষণ দেন তাতে মহাত্মাজীকে ভারতাত্মার প্রতীক এবং 'বিশ্বকর্মা' বলে অভিহিত করেন। বস্তুতঃ এ সময় থেকে এ মহান নেতার সঙ্গে তাঁর যে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হল তা ছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত অটুট। গান্ধীজীর জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় আশ্রমে গান্ধীজীর ফিনিক্স আশ্রমের ছাত্রদের সাময়িক বসবাসের ব্যবস্থা করেন। গুজরাটের মহাপ্রাণতা ও শিল্পবোধের জন্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন সে দেশের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত, তেমনি গুজরাটবাসীরাও বরাবরই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মহৎ কর্মোদ্যোগের সমর্থক। রবীন্দ্র-নাথের জীবনস্বপ্ন—বিশ্বভারতীর রূপদান কার্যে সক্রিয় সহযোগিতা

করেছিলেন কয়েকজন ধনী গুজরাটী ব্যবসায়ী। বস্তুতঃ এঁদের অর্থেই বিশ্বভারতীর শিশু বিভাগের বাড়ীটি প্রথমে তৈরী হয়। গুজরাট-বাসীর শিল্পবোধের প্রতি কবি যে কতটা শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন তার পরিচয় হল বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে এ প্রতিষ্ঠানের নৃত্যবিভাগে গুজরাটী 'গর্‌বা' (লোকনৃত্য) নৃত্যের প্রবর্তন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর বহু গুজরাটী ছাত্র ও সংস্কৃতি-প্রেমিক শান্তিনিকেতনে এসে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন—আর ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বভারতীর উদার ভাবধারা গুজরাটের সাংস্কৃতিক জীবনে।

মহারাষ্ট্র ও গুজরাট—ভারত ইতিহাসের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতের পশ্চিম প্রান্তবর্তী দুটি সুরম্য দেশ। শ্যামল বাংলা দেশ থেকে বহু বহু দূরে। কিন্তু এ দুটি দেশ প্রেমের আলোকে প্রীতির স্পর্শে শৌর্যময় জীবনবোধের প্রেরণায় শিল্প-সৌন্দর্যের সুস্নিগ্ধ আভায় মহা-প্রাণের মৃত্যুঞ্জয় জ্যোতিতে স্তরে স্তরে বিকশিত করে তুলেছে কল্পনা ও সৌন্দর্যবিলাসী রবীন্দ্র-মনকে—মহাজীবনের পূজারী বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথকে। সেজন্যে রবীন্দ্র-মনের বিকাশরেখা অনুসরণ করতে যাঁরা অগ্রসর হবেন তাঁদের নিকট মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের সঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনের সম্পর্কের অধ্যায় অতি প্রয়োজনীয় মনে হবে সন্দেহ নেই।

আত্ম-পরিচয়ের আলোকে রবীন্দ্রনাথ

কবি-পরিচয়

কোন বড় কবি বা মনীষীর বহির্জীবনের পরিচয় নেওয়া যত সহজ অন্তর্জীবনের পরিচয় পাওয়া তত সহজ নয়। এর কারণ মানুষের বহির্জীবন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সুতরাং প্রত্যক্ষ। আর মানুষের অন্তর্জীবন অনুভূতি ও উপলব্ধি-নির্ভর অতএব অপ্রত্যক্ষ। আধুনিক পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর শিল্প-স্রষ্টা ও মৌলিক চিন্তানায়কদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি অগ্রগণ্য আসনের অধিকারী—এ সত্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর বহির্জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচিত্র কর্ম ও সিদ্ধির কথা অনুস্যূত হয়ে আছে বহু চিঠি-পত্রে, আত্মজীবনীতে, বিপুল সংখ্যক জীবনীগ্রন্থে, সাময়িক ও সংবাদপত্রে এবং অনেক সরকারী দলিলে। এটা আশা করা অহেতুক নয় যে যতই দিন যাবে, রবীন্দ্রনাথের বহির্জীবনের পরিচায়ক আরো বহু নতুন উপকরণ সংগৃহীত হবে, যার ফলে এ অনন্যসাধারণ কবি-মনীষীর জীবনী-গ্রন্থ আরো বৃহদাকার ধারণ করবে।

কিন্তু এ বিচিত্রকর্মা কবি-মনীষীর অন্তর্জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় কোথায়? রবীন্দ্রনাথ জোর গলায় এ কথা ঘোষণা করেছেন 'বিচিত্রের দূত' হলেও তাঁর সব চাইতে বড় পরিচয় তিনি কবি এবং বহির্জীবনের ঘটনার মধ্যে তাঁর কবি-পরিচয় খুঁজতে যাওয়া বৃথা:

বাহির হইতে দেখোনা এমন করে
আমায় দেখোনা বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।...

যে আমি স্বপনমুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, এসেছ কাহারে ধরিতে ?
মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবনচরিতে ?

এ আত্ম-উদ্ঘাটনে রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন তাঁর কবি-সত্তা ব্যক্তি-সত্তা থেকে পৃথক্ ও রহস্যময়। এ কথাও তিনি স্বীকার করেছেন কবি-জীবনের এ রহস্যময়তা তাঁর নিজের কাছেও বিস্ময়ের বস্তু। স্ব-জীবনের এ পরম বিস্ময়কে রবীন্দ্রনাথ রূপ দিয়াছেন ১৯০৪ থেকে ১৯৪০ সন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধে ও অভিভাষণে। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবন, পরমাশ্চর্য কবি-মন, সাহিত্যাদর্শ ও জীবনাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় লাভ করতে হলে এ সমস্ত প্রবন্ধ ও অভিভাষণের প্রয়োজন অপরিহার্য। রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমুদ্রের ডুবুরী শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে ধন্যবাদ, সাময়িক পত্র থেকে এ বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ ও অভিভাষণগুলিকে তিনি পরম যত্নে সংগ্রহ করেছেন এবং বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের আত্ম-পরিচায়ক এ অমূল্য দলিলগুলিকে 'আত্মপরিচয়' নাম দিয়ে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এ গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হলেও ওজনে ভারী। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের পরিচয় ছাড়াও এ গ্রন্থখানিতে কবি-মনের বিচিত্র প্রবৃত্তি, সমসাময়িক কাব্যান্দোলন প্রভৃতি আরো বহু বিষয়ে অন্তরঙ্গ আলোচনা পাই।

সর্বসমেত মোট ছ'টি প্রবন্ধে এ গ্রন্থখানি সমাপ্ত। এর মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ বা প্রতিভাষণের প্রতি-লিপি। এ প্রবন্ধ-সমষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবন কী ভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এখন তাই আমরা আলোচনা করব।

নিজের কবিসত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ আত্মপরিচয়ের প্রথম প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ‘বঙ্গভাষার লেখক’ নামক গ্রন্থে ১৩১১ বঙ্গাব্দে (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে)। রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টি, ভাবানুভূতি এবং কাব্যপ্রকাশ যেমন ছিল স্ব-যুগের পক্ষে অভিনব, তেমনি নিজের কবি-সত্তার স্বয়ং-কৃত ব্যাখ্যাও হয়েছিল সমসাময়িক কালে তীব্র সমালোচনার সামগ্রী। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। বর্তমানে (আত্ম-ব্যাখ্যার আলোকে রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয় কী ভাবে এবং কতখানি সার্থক রূপ লাভ করেছে তার পরিচয় নেওয়া যাক।)

আত্মপরিচয়ের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যপ্রবাহের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর ভাবময় কবিজীবনকে সচেতন কর্মময় বাস্তব জীবন থেকে পৃথক্ করে নিয়েছেন। সত্তার এ দ্বৈতরূপ ব্যাখ্যায় কবি বলেন, মানুষ কর্ম করে আপন ইচ্ছায় এবং সে কর্ম জগৎ-বিচারে অর্থপূর্ণ। কিন্তু তাঁর কবি-কর্ম এমন একটি অহেতুক প্রয়াস যার উপর তাঁর নিজের ‘কোন কর্তৃত্ব ছিল না’। বিভিন্ন সময়ে রচিত খণ্ড-বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলির তিনি যে অর্থ কল্পনা করেছিলেন তার সামগ্রিক রূপের দিকে চেয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন অর্থকে অতিক্রম করে তাঁর খণ্ড-বিচ্ছিন্ন কবিতা একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য অর্জন করেছে।

কাব্য প্রয়াসের যে পরিণতি ছিল কবির ধারণাতীত, সে পরিণতি তাঁর কাব্য তা হলে অর্জন করল কী করে? এ জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথের যে কোন সচেতন কাব্যপাঠকের মনকে আলোড়িত করে। এ সম্ভাব্য জিজ্ঞাসার উত্তরে কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন, “তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান”। কবির এ উক্তিতে আস্থা স্থাপন করতে হলে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে তাঁর সমস্ত কাব্যপ্রয়াসের মূলে যে শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল সে তাঁর সচেতন বুদ্ধি নয়—সে হল সর্বশক্তিমান একটি দৈবী প্রেরণা। এ প্রেরণা শুধু যে তাঁর খণ্ড

কবিতার মধ্যে একটি অখণ্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐকতান এনে দিয়েছে তা নয়, কবি-জীবনের 'সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত যোগ বিয়োগের বিচ্ছিন্ন-তাকে একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে' এক সূত্রে গ্রথিত করেছে। জীবনের সমস্ত ভালোমন্দ, সমস্ত অনুকূল প্রতিকূল উপকরণ নিয়ে যে অদৃশ্য শক্তি কবি-জীবনকে নির্মাণ করে চলেছে তাকে কাব্যে তিনি নাম দিয়েছেন 'জীবন-দেবতা'। ক্রমশঃ তিনি অনুভব করেছেন এ জীবন-দেবতা শুধু তাঁর কাব্যপ্রয়াসের নিয়ন্ত্রী শক্তিমাত্র নয়, অনাদি অতীতকাল থেকে এ শক্তি বর্তমানের মধ্য দিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে অপ্রত্যাশিতভাবে অনায়াসে তাঁর সামগ্রিক চৈতন্যকে বিকশিত করে তুলেছে। এ চৈতন্যের ব্যাপ্তি শুধু স্থান বা কালকে অবলম্বন করে কবি-জীবনে সত্য হয়ে ওঠেনি, জগতের মানবসমাজ তরুলতা পশুপক্ষী প্রভৃতি জড় ও জীবনের সঙ্গে কবি-মনকে একটি নিগূঢ় আত্মীয়তার যোগ-সূত্রে গ্রথিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজনধর্মী শিল্প রচনায় বা মননশীল ভাব-ভাবনায় বারে বারে যে বিশ্বানুভূতির কথা বলেছেন তার উৎসে রয়েছে স্বীয় জীবনে অনুভূত এ অপ্রতিহত-শক্তি দৈবী প্রেরণা।

আদি কবি বাল্মীকি থেকে শুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত অনেক ভারতীয় কবি তাঁদের দুর্লভ কবি-কল্পনার উৎস হিসেবে দৈবীপ্রেরণার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন কবিই সে শক্তিকে জীবনের সর্ব কর্মের নিয়ন্ত্রণকারী চরাচরব্যাপী চৈতন্য-সম্প্রসারক অদৃশ্যসত্তা বলে উপলব্ধি করে একটি দুরধিগম্য জীবনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নি। আধুনিক যুক্তিবাদী বিজ্ঞানযুগ প্রতিষ্ঠার পূর্বে মানুষের বিশ্বাস যখন সরল ও সহজ ছিল তখন সে যুগের মানুষ কবিদের কাব্যসৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় দৈবীপ্রেরণার কথা শুনে শুধুমাত্র বিস্মিত হত না—কবিদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও বহুগুণে বেড়ে যেত। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের এ অভিনব জীবনতত্ত্বও একশ্রেণীর রবীন্দ্রভক্ত কাব্যপাঠকের বিস্মিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল এবং তাঁরা সে তত্ত্ব নিয়ে বহু আলোচনা গবেষণা

শুরু করলেন। কিন্তু যুক্তি-আশ্রয়ী কোন কোন রবীন্দ্র-কাব্য-পাঠক *কবির এই জীবনতত্ত্ব ব্যাখ্যার ভেতর 'দম্ভ ও অহমিকার সন্ধান' পেয়ে কবিকে আক্রমণ করলেন। এ প্রসঙ্গে ১৩১৪ সালের মাঘ মাসে 'বঙ্গদর্শন'* পত্রে প্রকাশিত কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কাব্যের উপভোগ' শীর্ষক প্রবন্ধ স্মর্তব্য। 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদকের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ উক্ত দম্ভ ও অহমিকার অভিযোগকে সরাসরি অস্বীকার করে স্বীয় জীবনতত্ত্বের আরও স্পষ্ট এবং বিস্তৃততর ব্যাখ্যা করেন। সে ব্যাখ্যায় তিনি বলেন:

> এই বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে। বরঞ্চ অহংকারের ঠিক উল্টা। কেননা, এই বিশ্বশক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে, তাহা সকলের মধ্যে কাজ করিতেছে।
>
> তাই যদি হয় তবে এত বড়ো একটা অত্যন্ত সাধারণ কথাকে বিশেষ-ভাবে বলিতে বসা কেন?
>
> ইহার উত্তর এই যে, অত্যন্ত সাধারণ কথারও যখন জীবনের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ উপলব্ধি হয় তখন তাহা আমাদিগকে হঠাৎ একটা আলোকের মতো চমৎকৃত করিয়া দেয়। যাহা সাধারণ তাহাকেই বিশেষ করিয়া যখন জানিতে পাই তখন তাহার বিস্ময় বড়ো বেশি করিয়া আঘাত করে। মৃত্যুর মতো অত্যন্ত বিশ্বব্যাপী নিশ্চিত ও পুরাতন পদার্থেরও বিশেষ পরিচয় আমাদিগকে একটা সদ্যোনূতন আবির্ভাবের মতো চমক লাগাইয়া দেয়। এইজন্য বিশেষ অবস্থায় সাধারণ কথাকেও বিশেষ করিয়া বলিবার আকাঙ্ক্ষা মনে উদয় হইয়া থাকে।......
>
> যে আইডিয়া সম্বন্ধে আমরা প্রথমে অচেতন ছিলাম তাহাই যে আমাদিগকে বলাইয়াছে ও করাইয়াছে এবং আমাদের অপরিণত অবস্থারও কথা ও কাজকে আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই আইডিয়ারই শক্তি প্রবর্তিত করিয়াছে—আমার ক্ষুদ্র আত্মজীবনীতে এই কথাটার উপলব্ধিকে আমি কোন এক রকম করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

কথাটা সত্য কি মিথ্যা সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ইহা অহংকার নহে; কারণ, ইহা কাহারও এলাকার সামগ্রী নহে। তবে কিনা যখন নানা কারণে নিজের জীবন-বিকাশের মধ্যে এই আইডিয়াকে স্পষ্ট করিয়া প্রত্যক্ষ করা যায় তখন তাহাকে নিতান্ত সাধারণ কথা ও জানা কথা বলিয়া আর উপেক্ষা করিতে পারি না।

রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য। বঙ্গদর্শন ১৩১৪ মাঘ।

রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠক মাত্রই জানেন কাব্য ও জীবন তত্ত্ব ব্যাখায় রবীন্দ্রনাথের এ কৈফিয়ৎ বিরুদ্ধবাদীদের নিবৃত্ত করতে পারেনি। কবির অভিনব জীবনদৃষ্টি শিল্পরীতি ও সাহিত্য দর্শনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যে রবীন্দ্র বিরোধ জেগে ওঠে আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে সে একটি কৌতুককর অধ্যায়। পরবর্তী একটি প্রসঙ্গে তার বিস্তৃততর পরিচয় দেওয়া হবে।

আবার কবির জীবনদেবতা প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। জীবন-দেবতা সম্পর্কে যুক্তিবাদী সমালোচকেরা যে মনোভাবই পোষণ করুন না কেন এ অনুভবগ্রাহ্য অদৃশ্য প্রেরণা শক্তি কবি রবীন্দ্রনাথের নিকট দিনের আলোর মতই সত্য। তাঁর অনুভূতিশীল অন্তরে সে প্রেরণার প্রকাশ কখনও অন্তর্দেবতা রূপে কখনও বা বিশ্বদেবতা রূপে। কবি বিশ্বাস করেন তাঁর অন্তরে যে একটা আনন্দময় প্রকাশ-ব্যাকুলতা রয়েছে সে তার অন্তর্দেবতা জীবনদেবতারই দান—"সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধি মন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে।"

এখানে এসে আমরা রবীন্দ্রনাথের শিল্প স্থষ্টির উৎস কোথায় জানতে পারি। কাব্যে নাটকে গল্পে উপন্যাসে চিত্রশিল্পে সঙ্গীত শিল্পে নৃত্যশিল্পে তিনি যে অভিনব রূপলোকের সন্ধান দিয়ে গেছেন তা ছিল কবি-অন্তরের এক দুর্নিবার প্রেরণারই ফল। সে প্রেরক শক্তির নামকরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ অন্তর্দেবতা বা জীবনদেবতা।

বাস্তবিক পক্ষে অন্তর্নিহিত কোন প্রচণ্ড শক্তি ক্রিয়াশীল না হলে একটি মাত্র জীবনে একক ব্যক্তির পক্ষে এত সৌন্দর্যের ফসল ফলানো সম্ভব কিনা তা বিবেচনার বিষয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিল্প সম্পর্কে মৌলিক ধারণাটি স্মরণযোগ্য। শিল্পের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে জগতের শিল্প-সমালোচকেরা যুগ যুগ ধরে হিমসিম খেয়েছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ ছোট্ট একটি অর্থব্যঞ্জক কথায় শিল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন: Art is expression.

যে আনন্দময় অন্তর্দেবতা রবীন্দ্রচিত্তে সঞ্চার করেছিলেন অন্তহীন প্রকাশ-চঞ্চলতা তিনিই আবার কবি-চিত্তে এনে দিয়েছেন সুগভীর প্রশান্তি। অন্তরে প্রশান্তি ছাড়া কোন মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হয় না। মানুষের চঞ্চল হৃদয়ে সে প্রশান্তি আসে কোন বৃহৎ শক্তি বা চৈতন্যের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। সে প্রশান্তি লাভ হলে মানুষ অনুভব করে জীবনে সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা কিছুই মূল্যহীন নয়—সব কিছুকে নিয়েই জীবন সম্পূর্ণ। সে সম্পূর্ণ জীবনানুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ আত্মপরিচয়ের 'কবি-পরিচয়' অধ্যায়ে:

> যখন বুঝতে পারি, আমার প্রত্যেক আনন্দের উচ্ছ্বাস তিনি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, আমার প্রত্যেক দুঃখ বেদনা তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন জানি যে, কিছুই ব্যর্থ হয় নাই, সমস্তই একটা জগদ্ব্যাপী সম্পূর্ণতার দিকে ধন্য হইয়া উঠিতেছে।

বিরুদ্ধবাদীরা রবীন্দ্রনাথের এ মনোভাবের ভেতর যতই অহং-ভাবের সন্ধান পান না কেন আসলে রবীন্দ্রনাথ এখানে আত্মনিবেদনের উপরই জোর দিয়েছেন বেশী। আত্মসংযমের সাহায্যে আত্মসুখ বা আত্মদুঃখকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা অংশ রূপে অনুভব করবার এ প্রবৃত্তিকে কেউ বলেছেন রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা, কেউ বলেছেন তত্ত্বজ্ঞান। এ সুগভীর আত্মনিবেদনের আনন্দময় সুরটি রবীন্দ্রকাব্যে যে গভীরতা এনে দিয়েছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তা বিরলদৃষ্ট। এ শান্ত সুন্দর আনন্দময় জীবন সঙ্গীত শুনেই যে চঞ্চল পাশ্চাত্ত্য জগৎ

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সমসাময়িক জগতের শ্রেষ্ঠ কবির বিজয় মাল্য পরিয়ে দিয়েছিল রবীন্দ্র-জীবনী পাঠক মাত্রই এ খবর জানেন।

অধ্যাত্মচেতনার এ সুস্পষ্ট প্রকাশ সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা প্রধানত মানবতারই সাধনা। অন্তর্দেবতা যদি শুধুমাত্র কবি-জীবনকে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ আনন্দ-বেদনা সফলতা-বিফলতার মধ্য দিয়ে একটি সামঞ্জস্যময় সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেবার প্রেরণামাত্রই হত তবে তার মধ্যে বিশ্বজনীন কোন মাহাত্ম্য থাকত না। বিস্মিত চেতনার সাহায্যে কবি এ অন্তর্দেবতার বিশাল ব্যাপ্তি অনুভব করছেন স্বজীবনে। যে ব্যক্তিগত জীবনদেবতা কবি-জীবনকে সমস্ত বিরোধ বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে একটি পরম রমণীয় পরিণতির দিকে আকর্ষণ করেন সে জীবনদেবতাই আবার তাঁর অনুভূতিশীল কবিচিত্তকে সমগ্র বিশ্বজীবনের সঙ্গে প্রেম ও আনন্দের স্বর্ণসূত্রে যোগমুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চৈতন্যশক্তি এভাবে বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সুগভীর ব্যক্তিনিরপেক্ষ তৎপর্য অর্জন করল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জীবনদেবতা আইডিয়াকে যে কবির ব্যক্তিগত কল্পনার খেয়াল, দম্ভ এবং অহমিকার প্রকাশ বলে মনে করা হয়েছিল তা সত্য নয়। একটি আইডিয়াকে জীবনতত্ত্বরূপে খাড়া করবার পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী মন যে ক্রিয়াশীল ছিল না এ কথা বলা যায় না। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথকে অভিহিত করেছেন "মননধর্মী কবি ও কবিধর্মী মনীষী" বলে। রবীন্দ্র মনের কবি-ধর্ম ও যুক্তিবাদকে লক্ষ্য করে এত সুপ্রযুক্ত কথা আর বেশী কেউ বোধ হয় ব্যবহার করেন নি।

আত্মপরিচয়ে মননধর্মী কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতা আইডিয়াকে যে ভাবে রূপ দিয়েছেন বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে ক্রমবিকাশের কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা যাবে ঃ

প্রথমতঃ, কবি-জীবনে জীবনদেবতার আবির্ভাব কাব্যরচনা

শক্তির একটি দৈবী প্রেরণা রূপে।

দ্বিতীয়তঃ, সে দৈবী প্রেরণা কবির কাব্যরচনা প্রয়াসকে শুধু নিয়ন্ত্রিত করেনি, তাঁর ব্যক্তিজীবনের সমস্ত কর্ম ও আশা নিরাশাকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে।

তৃতীয়তঃ, সে শক্তি তাঁর সীমাবদ্ধ ব্যক্তিমনকে চরাচরব্যাপ্ত বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে যোগযুক্ত করেছে।)

সে জন্য রবীন্দ্র-জীবন-প্রবুদ্ধ সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী যখন বলেনঃ জীবনদেবতা মানে একটি 'ever-evolving personality' 'ক্রমশঃ উদ্ভিদ্যমান ব্যক্তিত্ব'—তখন বিজ্ঞ সমালোচকের এ জীবনতত্ত্ব বিশ্লেষণ আমাদের কাছে যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হয়।

(জীবন দেবতাকে কেউ কেউ বলেছেন বিশ্বদেবতা। আসলে উত্তর জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বানুভূতিকে তত্ত্বরূপে প্রচার করে বিশ্বমনা হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন জীবনদেবতা আইডিয়া তারই কাব্যময় প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতি এবং আধুনিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত বিশ্ববোধ সম্পর্কে একটি মন্তব্য এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ যে পথ ধরেই অগ্রসর হোক না কেন আধুনিক রাজনীতির আশ্রয়ে যে হয়নি একথা বোধ হয় তাঁর অতি বড় শত্রুও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতির সঙ্গে আধুনিক রাজনৈতিক Internationalism-এর তুলনা করা চলেনা। আধুনিক Internationalism বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচিত্র স্বার্থান্বেষী মানুষকে ঐক্যসূত্রে বাঁধবার প্রয়াসে ব্যর্থ। এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল জগতের বিভিন্ন জাতির (nation) রাজনৈতিক স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখে এ দর্শন মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কামনা করে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থবোধকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়েই মানুষের লোভ হিংসা প্রভৃতি হীন প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করছে এবং মানুষ এ সমস্ত

প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার জন্য আধুনিক বিধ্বংসী বিজ্ঞান শক্তির যে সাহায্য নেবে তা তো সহজেই অনুমেয়।

এ কারণে আমরা নিত্যনিয়তই দেখতে পাচ্ছি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও আধুনিক পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের উপর সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে ওৎ পেতে আছে। যতদিন পর্যন্ত মানুষের এ আপাত-মহৎ রাজনৈতিক আদর্শ সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মানুষের আদিম হিংসা প্রবৃত্তিকে সংযত করতে না পারবে ততদিন সে আদর্শ শুধু কথার মারপ্যাঁচেই বদ্ধ হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ প্রজ্ঞা-দৃষ্টির সাহায্যে রাষ্ট্রস্বার্থান্বেষী মানুষের চরম নৈতিক অধঃপতনের ভবিষ্যৎ চিত্র বহু পূর্বেই যেন দেখতে পেয়েছিলেন। আধুনিক স্বার্থান্ধ জাতীয়তাবোধ মানুষকে কোন সর্বনাশের পথে আকর্ষণ করছে তার মননশীল আলোচনাও তিনি করেছেন *Nationalism* ও *Personality* গ্রন্থে। এ রচনায় সর্ব মানবের মিলনের পথে বাধার কারণ কি নির্ণয় করে ঐক্যের মহৎ আদর্শ প্রচার করেছিলেন তিনি মননশীলতার সাহায্যে। সে আদর্শেরই কাব্যময় রূপ দিয়েছেন তিনি বিশ্বচৈতন্যময় জীবনদেবতার অনুভাবনায়। কবি অনুভব করছেন বিশ্বজীবনের সঙ্গে তাঁর মনের যে সংযোগ তা হল প্রেমের আনন্দের প্রাণের :

> নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দ-সূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই……আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণু-পরমাণুও থাকতে পারে না……আমার সঙ্গে অনন্ত জগৎ-প্রাণের যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগণ্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণগন্ধগীত।'

এবং

নিজের জীবনের মধ্যে এই-যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে—যে আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম।'

কবিচিত্তে বিশ্বানুভূতির আবির্ভাব যে প্রবল আবেগ সঞ্চার করেছে তারই প্রকাশ ঘটেছে কাব্যোচ্ছ্বসিত ভাষায়। সেজন্যে কবির বক্তব্য একটু অস্পষ্ট হলেও তার মর্ম বুঝতে পাঠকের কষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথের এ বিশ্বমানবতা বোধ একটি সজীব ও সক্রিয় শক্তি। প্রেমানুভূতি আনন্দানুভূতি ও সৌন্দর্যানুভূতির সাহায্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যের যোগ অনুভব করা এবং সে অনুভবের সাহায্যে মানুষের মিলনকে সার্থক করে তোলার সাধনা যে কত আয়াসসাধ্য প্রয়াস তা সহজেই অনুমেয়।

বিশ্বজীবনের সঙ্গে কবি-অন্তরের যোগকে ঘনিষ্ঠতর করেছে বিশ্ব-প্রকৃতি। প্রকৃতির সঙ্গে নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু মাত্র রবীন্দ্র কাব্যে নয়—রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনায় এমন কি তাঁর বাস্তবজীবনেও এত সজীব রূপ লাভ করেছে যে তাকে কবি-মনের একটি attitude বা ভঙ্গী বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আত্মপরিচয়ের কবি-পরিচয় অংশে তারও বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশে গভীর প্রকৃতি প্রেমিক কবি কম জন্মাননি। কিন্তু খুব কম কবির কাব্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের এত গভীরতা ও বিস্তৃতি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলতে চান প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগ শুধু এ জন্মের নয়—জন্ম জন্মান্তরের। এবং সে জন্যই তিনি জীবনের সর্ব কর্মে সর্ব ভাবনায় প্রকৃতির প্রভাব এত বেশী করে অনুভব করেন। রবীন্দ্র কাব্য সমালোচক প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রকাব্য-জীবনে প্রকৃতির প্রভাব সম্পর্কে একটি সুন্দর কথা বলেছেন। তাঁর মোটামুটি কথা হল এই : রবীন্দ্রনাথের বিশাল কাব্যধারা আবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে তিনটি

বস্তুকে আশ্রয় করে—মানুষ, ভগবান ও প্রকৃতি। এর মধ্যে তাঁর কবি-মনের ওপর প্রকৃতির প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী। এর কারণ প্রকৃতির পটভূমিকায় তিনি মানুষ ও ভগবানের স্বরূপকে যে কাব্যরূপ দিয়েছেন তার বিস্তৃতি অপরিসীম। কিন্তু তাঁর কাব্যে যেখানে মানুষ ও ভগবান অনুপস্থিত সেখানেও প্রকৃতি অবস্থান করে। এক কথায় রবীন্দ্রনাথের সুবিস্তৃত কাব্য জগতে প্রকৃতি একটি সর্বব্যাপী স্থান অধিকার করে আছে।

প্রকৃতি প্রীতি যদি কবি-মনের একটা কাব্যোচ্ছ্বাস মাত্র হত তাহলে তা রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকত। কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই জানেন অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি তাঁর জীবনকেও কী গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

মননধর্মী কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-পরিচয়ে প্রকৃতির সঙ্গে এ নিগূঢ় চৈতন্যের যোগের কথা বিবৃত করেছেন সুন্দর কাব্যোচ্ছ্বসিত ভাষায়। তিনি বলেছেন ঃ

> "নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে।...আমার স্বাতন্ত্র্য গর্ব নাই—বিশ্বের সহিত আমি আমার কোন বিচ্ছেদ স্বীকার করিনা ...আমি আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।...আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া, কোনো জিনিষকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই।"

পৃথিবীর সঙ্গে জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে কবি লিখেছেন ঃ

> এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম তখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, আমি কত দূর দূরান্তর দেশ দেশান্তরের জল স্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ

> সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অনন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে।…এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন……

স্বপ্নে-পাওয়া লোকের কথার মত প্রকৃতিচৈতন্য সম্পর্কে উক্ত কথাগুলির যদি কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকত তাহলে লোকে তা রবীন্দ্রনাথের ভাবোচ্ছ্বসিত কাব্যকথা বলেই উড়িয়ে দিত কিংবা এ সমস্ত উক্তিকে কবির অহং ভাবের স্পর্ধিত প্রকাশ বলেই ধরে নিত— যেমন মনে করেছিলেন রবীন্দ্রবিরোধী কোন কোন সমালোচক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনা এমন একটি মননশীল বৈজ্ঞানিক যুক্তির বর্মে গঠিত যে স্বয়ং বৈজ্ঞানিকেরাও তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন না।

আসলে রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত প্রকৃতিচেতনা কবিদৃষ্টির সঙ্গে প্রজ্ঞা-দৃষ্টির সমন্বয়ে গঠিত।

স্বীয় কবি-পরিচয়ের আর একটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মপরিচয়ে। প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি মোহমুগ্ধ দৃষ্টি যেমন তাঁর কবিচেতনার বিকাশের মূলে তেমন তাঁর জীবন-চেতনারও পরম সহায়ক। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন জগতের রূপ ও রসলোকের প্রতি এ মোহমুগ্ধতাই তাঁর মনের সমস্ত সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা ঘুচিয়ে দিয়ে তাঁকে বৃহৎ জীবনের দ্বারপ্রান্তে এনে উপস্থিত করেছে।

> প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করিনা, সেই মোহকে আমি নিন্দা করিনা।…জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর কাহারও টানিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের

এই রূপের মধ্য দিয়াই সেই অরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি।

রবীন্দ্রনাথের এ মুক্তিসাধনা ভারতীয় মায়াবাদী দার্শনিকদের মুক্তিসাধনার প্রায় বিপরীতধর্মী। মানবপ্রেম ও জগৎ সৌন্দর্যের মধ্যে মুক্তির এ উপলব্ধি রবীন্দ্রকাব্যকে করে তুলেছে গভীর মানব-রস সিক্ত। রবীন্দ্রকাব্যে রূপোল্লাস ও বিচিত্র রসসৃষ্টির উৎস খুঁজতে হবে এখানে। ভাবরসপ্রধান কাব্যে যে কথাকে স্পষ্ট করে বলতে পারেননি কবি তাকে স্পষ্টতর করে তুলতে চেয়েছেন কোন কোন নাটকে ও উপন্যাসে।

এই হল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কবিকর্মের প্রেরক শক্তি। কিন্তু খণ্ড বিচ্ছিন্ন কবিকর্মের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিরাটব্যাপ্ত কবি-জীবনের পরিচয় পাওয়া কি সম্ভব? কবি নিজেই বলেছেন তাঁর কবিপরিচয় খুঁজতে হবে তাঁর সামগ্রিক রচনার মধ্যে। "তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্ব-জগতের প্রকাশশক্তি আপনাকে কোন আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই দেখিবার বিষয়।"

কাব্যের সফলতা বিচারের আরও কয়েকটি মাপকাঠি উপস্থিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-পরিচয়ে। কবির মতে সে কাব্যই সফল যা অনির্বচনীয়কে ভাষায় রূপ দিতে পারে, অরূপকে রূপের মধ্যে, বাস্তবকে ভাবরূপে, বিদেহী ভাবকে রূপমূর্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে সক্ষম—সে কাব্যই সফল।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। স্বীয় কাব্যবিচারে রবীন্দ্রনাথ শুধু আত্মসমালোচক নন, ভবিষ্যৎ সমালোচকদের জন্যও পথনির্দেশ করে গেছেন। সমগ্র কাব্যসৃষ্টির মধ্যে কবির জীবন-বাণী অনুসন্ধান না করে বিচ্ছিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয় খুঁজতে যান তাঁরা কবির প্রতিও সুবিচার করেন না, কাব্যের প্রতিও

না। দুর্ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের প্রথম যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বহু রবীন্দ্র-কাব্য-সমালোচকই বিচ্ছিন্নভাবে রবীন্দ্র কাব্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ভ্রমে পতিত হয়েছেন। বস্তুতপক্ষে সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যে যে মহৎ জীবনবাণী ধ্বনিত হয়েছে সে বাণীই রবীন্দ্র কাব্যের উৎকর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। কাব্যের সফলতা বিচারে যে সমস্ত মাপকাঠির কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন তা কবির নিজস্ব হলেও সনাতন। সে বিচারের সঙ্গে হয়ত আধুনিক বস্তুবাদী সমালোচক একমত হবেন না। না হোন, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ কথাটা স্মরণযোগ্য, রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ জীবন যেমন আধুনিক জগতের স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-কোলাহলপূর্ণ বাস্তব জগতকে স্বীকার করেও বার বার তাকে অতিক্রম করে একটি শান্তিময় ও সুন্দর আদর্শলোকের অভিমুখী হয়েছিল তেমনি রবীন্দ্রকাব্যের নিত্যগতিও ছিল 'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'।

ভাবজগতের সঙ্গে রূপলোকের এ স্বর্ণসেতু বন্ধনই রবীন্দ্র কাব্যের সব চাইতে বড় পরিচয় এবং এখানেই রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয় সার্থক।

আত্মবীক্ষা

সাহিত্যিক খ্যাতি ও সম্মান লাভের প্রতি লোভ লেখক মাত্রেরই একটি মজ্জাগত প্রবৃত্তি। একনিষ্ঠ সাহিত্য সেবাব্রতের ফলে লেখকদের জীবনে যদি কোন স্বীকৃতি আসে সে সম্মানকে প্রথমে চেখে তারপরে চেটেপুটে খেতেই সাধারণতঃ তাঁরা ভালবাসেন। রবীন্দ্র-জীবনী পাঠকেরা জানেন, অভিনব রীতি ও ভাবের আশ্রয়ে কাব্য নাটক রচনার জন্যে কবিকে অনেক সাহিত্যিক বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছিল। সে বিরোধ বিক্ষোভে রবীন্দ্র-মন যে পীড়িত হয়েছিল তার প্রমাণ কবির কাব্যে ও চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। অবশেষে কবির সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতি এল যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ বৎসর। দেশবাসীর পক্ষ থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলকাতার

টাউন হলে কবি-সংবর্ধনা করেন ১৩১৮ সালের ১৪ই মাঘ। এ অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গরূপে ছয়দিন পরে ২০ শে মাঘ পরিষদ্ ভবনে একটি আনন্দ সম্মিলনের আয়োজন করা হয়। সে অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ নিজের সাহিত্য-জীবন ও সাহিত্য কর্মকে বিশ্লেষণ করে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ প্রবন্ধটি সে বৎসরের ফাল্গুন মাসে ভারতী পত্রিকায় 'অভিভাষণ' নামে প্রকাশিত হয়।

আত্মবীক্ষার সাহায্যে আত্মবিশ্লেষণ না করে রবীন্দ্রনাথ যে কোন সম্মানকেই নির্বিচারে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না—কবির উক্ত প্রবন্ধটিই তার প্রমাণ। কবির চারিত্র্যধর্ম যে কত প্রবল কত বলিষ্ঠ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য প্রসঙ্গে।

এ অভিভাষণে কবি বলেন, কবিকৃতির জন্য তিনি স্ব-জীবনে যে খ্যাতি লাভ করেছেন তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। কালের সান্নিধ্য হেতু সে কবিকর্মের যথার্থ মূল্য যাচাই করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। কবির জীবিতাবস্থায় অনেক মূল্যহীন জিনিষও মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। কবির সৃষ্টি মূল্যবান কি মূল্যহীন তার একমাত্র বিচার করতে পারে মহাকাল। মহাকালের দরবারে মূল্যহীনের কোন স্থান নেই।

কবি-আত্মাই কবির সত্যিকারের পরিচয়। সে সত্য পরিচয়ের সঙ্গে কবির অহং জড়িত হয়ে জীবৎ কালেই কবিকে খ্যাতিলোলুপ করে তোলে। এ খ্যাতিলোলুপতাই স্থায়ী কাব্যকীর্তি লাভ করবার পক্ষে চরম বাধা। অতএব স্ব-জীবনে যদি কোন সম্মান আসে সেজন্যে উল্লাস বোধ না করে বরং ধীরভাবে নিজের কবি-কর্মের প্রকৃত মূল্য বিচার করাই কবির পরম কর্তব্য। এতে কবির অহং-বোধ স্ফীত হয়ে উঠবার অবকাশ পায় না।

দীর্ঘকাল কাব্যসাধনার পর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে যখন কবিজীবনে সাহিত্যিক স্বীকৃতি এল তখন সে সম্মানে স্ফীত না হয়ে আত্মবীক্ষার সাহায্যে নিজের কবি-কর্মের মূল্য নির্ধারণ করতে বসলেন

রবীন্দ্রনাথ। তাও আবার বাংলা দেশের কাব্যপ্রিয় জ্ঞানী-গুণীর সামনে। একেই বলে সাহিত্যিকের fidelity. নিজের কবিকৃতির সত্যমূল্য নির্ণয়ে যুক্তিশীল রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নৈর্ব্যক্তিক।

স্বকীয় কবিকৃতির মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে দুই শ্রেণীর কবির কথা উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এক শ্রেণীর কবি কাব্য রচনা করেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে আর এক শ্রেণীর কবি মানসিক নির্বাচনের নিয়মে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর কবির কাব্য-সৃষ্টিতে অজস্রতা আছে কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে তাদের কবিতার অপমৃত্যু ঘটতেও দেরি হয় না। কলানিপুণ কবিরাই সাধারণতঃ মানসিক নির্বাচনের নিয়মকে রচনায় প্রাধান্য দেন। সে জন্য তাঁরা 'যাহা কিছু প্রকাশ করেন তাহা সমস্তটাই একেবারে সার্থক হইয়া উঠে'।

বহুব্যাপ্ত কবিখ্যাতির অধিকারী হয়েও রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না যে যেহেতু তাঁর সৃষ্টিতে প্রাচুর্য বেশী সেজন্যে তাঁর রচনা 'বহুপরিমানে ব্যর্থতা বহন করে'। নিজের এ ব্যর্থতার প্রতি সকৌতুক ব্যঙ্গ কটাক্ষ হানতেও কবি কুণ্ঠাহীন :

> আমার বোঝা অত্যন্ত ভারী হইয়াছে—ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে ইহার মধ্যে অনেকটা অংশে মৃত্যুর মার্কা পড়িয়াছে। যিনি অমরত্বের রথী তিনি সোনার মুকুট, হীরার কণ্ঠি, মানিকের অঙ্গদ ধারণ করেন, তিনি বস্তা মাথায় করিয়া লন না। কিন্তু আমি কারুকরের মতো সংহত অথচ মূল্যবান গহনা গড়িয়া দিতে পারি নাই। আমি, যখন যাহা জুটিয়াছে তাহা লইয়া কেবল মোট বাঁধিয়া দিয়াছি; তাহার দামের চেয়ে তাহার ভার বেশি। অপব্যয় বলিয়া যেমন একটা ব্যাপার আছে অপসঞ্চয়ও তেমনি একটা উৎপাত। সাহিত্যে এই অপরাধ আমার ঘটিয়াছে।

সাহিত্য সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর কলাবিদ্‌ হয়েও নির্দ্বন্দ্ব চিত্তে নিজের সাহিত্যসৃষ্টির অসম্পূর্ণতার কথা যেরূপ অকপটভাবে স্বীকার করেছেন এ যুগের কোন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিকও তা স্বীকার করতেন কিনা সন্দেহ।

রবীন্দ্র সাহিত্যের সে অসম্পূর্ণতা কি এ পর্যন্ত তার বিস্তৃত আলোচনা হয়নি। অধিকাংশ রবীন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনাই কবির প্রতি শ্রদ্ধাবনত স্তুতি বা বিদ্বিষ্ট নিন্দার ভারে ভারাক্রান্ত। রবীন্দ্র-যুগের দু' একজন শক্তিশালী সমালোচক তার সূচনা মাত্র করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সে ধারার সাহিত্য-সমালোচনায় উপযুক্ত উত্তরসূরীর আবির্ভাব আজও ঘটেনি।

সাহিত্যকে চিরন্তনতা দিতে পারে স্রষ্টার অকৃত্রিম জীবনানুভূতি। যে সাহিত্যে 'অনুভবের চেয়ে অনুকরণের মাত্রা অধিক হইরা উঠে' সে সাহিত্য ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। আত্মবিশ্লেষণের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ সবিনয়ে একথা স্বীকার করেন, 'আমার সুদীর্ঘকালের সাহিত্য-কারবারে সেই সকল ফাঁকি জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক জমিয়াছে'।

সে ফাঁক বা ফাঁকির পরিচয় কি রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠকের সামনে তুলে ধরাই সমালোচকের আজ সর্বপ্রধান কর্তব্য। এতে রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতি বা তাঁর শ্রদ্ধেয় সাহিত্যকর্মের প্রতি অমর্যাদা করা হয় না। বরং কঠোর বিচারের আলোকে রবীন্দ্র-প্রতিভার হীরক-দ্যুতি পাঠকের সামনে স্পষ্টতর হয়ে উঠে।

নিজের সাহিত্য সৃষ্টির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সেদিনকার উপস্থিত শ্রোতাদের দৃষ্টি আর একটি দিকে আকর্ষণ করেন—যা রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকের অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেন, তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূল্য যাই হোক, জনমনকে তৃপ্ত করবার জন্যে কোন ফরমায়েসী সাহিত্য তিনি রচনা করেন নি। তাঁর রচনার মূল উৎস আত্মপ্রকাশের জন্যে একটি অনির্বাণ আকূতি। জনমনের দিকে দৃষ্টিপাত করে সাহিত্য-রচনার বিপদ এই যে তাতে লেখক সাময়িক খ্যাতি লাভের লোভে জনগনের খেয়াল-খুশীমত রচনা করে তাদের প্রবঞ্চিত করেন এবং জনরুচি পরিবর্তিত হলে লেখক নিজেও বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবে যান। কাব্যরচনার প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠক-

সমাজে বহুল পরিমানে অনাদৃত হলেও তিনি কখনও জনরুচি তৃপ্ত করবার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করেননি।

যাকে চিরন্তন এবং ক্ষণিক সাহিত্য বলা হয় সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যে অপ্রিয় সত্য বলবার ঝুঁকি অনেক। তাতে লেখকের জনপ্রিয়তা অতি সহজেই ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু যে লেখকের সাহিত্যবিবেক পরিচ্ছন্ন তিনি সত্য কথা অপ্রিয় হলেও বলতে ভয় পান না। এতে সাহিত্য সমাজে বিরোধ জেগে উঠে। অপ্রিয় সত্যভাষী লেখকের উপর স্বার্থসংশ্লিষ্ট লেখক খড়্গ হস্ত হয়ে উঠেন। এ পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা সাহিত্য জীবনে রবীন্দ্রনাথেরও বারে বারে হয়েছে। ভারতবর্ষ চিরদিন সত্য-সাধনার দেশ। সে সত্যসন্ধ স্বদেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা চিরদিনই ছিল পর্বতপ্রমাণ। স্বদেশের চিরকালীন সত্য-সাধনাকে মিথ্যার ধুলিজঞ্জাল নিক্ষেপ করে যে কেউই কলঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছে সাহিত্যকর্মে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই নির্মমহস্তে তাদের উপর কশাঘাত করেছেন। এর ফলে পাঠক-সমাজে বিরোধ-বিক্ষোভ জেগে উঠেছে, বন্ধু শত্রুতে আত্মীয় পরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দেশের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাতে রবীন্দ্রনাথ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। মিথ্যাচারীকে আঘাত দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও আহত কম হন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠা এত দৃঢ় ছিল যে কখনও তিনি অপ্রিয়তাকে এড়াবার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে যান নি।

সত্যসন্ধ রবীন্দ্রনাথের জীবন কাহিনীতে এরূপ বিরোধ-বিক্ষোভের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। স্ব-যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিতর্কে প্রথম যৌবনেই রবীন্দ্রনাথের সত্যবোধের দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায়। সে সত্যবোধ রূপ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের ‘প্রকৃতির পরিশোধ,’ ‘বিসর্জন’ ‘মালিনী’ প্রভৃতি নাটকে, ‘কাহিনী’ নাট্য কাব্যে এবং বহু মমনশীল রচনায়।

সমাজাদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

যে সমাজে মানুষ নিজের সত্য আদর্শকে বজায় রাখিয়া নিজের সত্য মতকে খর্ব না করিয়াও শ্রদ্ধালাভ করিতে পারে সেই সমাজই যথার্থ শ্রদ্ধাভাজন—যেখানে আদর পাইতে হইলে মানুষ নিজের সত্য বিকাইয়া দিতে বাধ্য হয় সেখানকার আদর আদরণীয় নহে।

শুধু ব্যক্তিগত জীবনে বা সাহিত্য জীবনে নয় সমাজ-জীবনেও সত্যানুধ্যানকে সার্থক করে তুলবার জন্যে সত্যসন্ধ রবীন্দ্রনাথের এ ব্যাকুলতা লক্ষণীয়। আত্মবীক্ষার সাহায্যে মনে আত্মপ্রত্যয় না জন্মালে সত্যের প্রতি এত অচঞ্চল নিষ্ঠা মানুষের জীবনে প্রায় দেখা যায় না।

কবির ধর্ম

রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রধর্মী সাহিত্যস্রষ্টা, রবীন্দ্রনাথ নাট্য ও নৃত্য প্রযোজক, রবীন্দ্রনাথ সুরকার, সঙ্গীতশিল্পী, রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী—এ ধরণের পরিচয়েই রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের সাধারণ্যে সুপরিচিত। কিন্তু ধর্মদেশনার ক্ষেত্রেও যে তিনি মৌলিক চিন্তার অধিকারী এ খবর অনেকে রাখেন না। এ বিভাগে মৌলিকচিন্তার জন্যেও বিরুদ্ধবাদীদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে কম সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি। নিজের ধ্যানধারণা ও উপলব্ধি মত রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম সম্পর্কে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন নারায়ণ, প্রবর্তক, বিজয়া প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় তার তীব্র সমালোচনা হয়। সে ১৩২৪ সালের কথা। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ছাপ্পান্ন বৎসর। রবীন্দ্রনাথের মৌলিক ধর্মধারণাকে কেন্দ্র করে সে বৎসরের প্রবর্তকে 'ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সে প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ হয় ১৩২৪ সালেরই আষাঢ় সংখ্যা নারায়ণে। ইতঃপূর্বে সুবিখ্যাত বিপিনচন্দ্র পাল ১৩২০ সালের বিজয়া পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীতের সমালোচনায় 'রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত' নামে প্রবন্ধ রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তকে প্রকাশিত 'ধর্মপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধের উত্তর দেন ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা সবুজপত্রে প্রকাশিত

'আমার ধর্ম' নামক প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধটিরও প্রত্যুত্তরে প্রবর্তকের দ্বিতীয় বর্ষ দ্বাবিংশ সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম' নামে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

ধর্ম সম্বন্ধে বাদানুবাদের তীব্র উত্তেজনার মধ্যেও শান্ত চিত্তে রবীন্দ্রনাথ ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে যে মৌলিক ধারণা ব্যক্ত করেন কবির মননরাজ্যে তা বিশিষ্টতার দাবি রাখে।

মানুষের ধর্ম-ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম। সেই প্রাণধর্মটির কোনো খবর রাখা জন্তুর পক্ষে দরকারই নেই। মানুষের আর একটি প্রাণ আছে, সেটা শারীর-প্রাণ চেয়ে বড়ো—সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনীশক্তিই হচ্ছে তার ধর্ম। এই জন্যে আমাদের ভাষায় 'ধর্ম' শব্দটা খুব একটা অর্থপূর্ণ শব্দ। জলের জলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে আগুনের ধর্ম। তেমনি মানুষের ধর্মটিই হচ্ছে তার অন্তরতম সত্য'।

তাহলে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে ধর্ম হল:

মানুষের শারীর প্রাণ থেকে বড়।

তার এক নাম মনুষ্যত্ব।

প্রাণের ভিতরকার সৃজনী শক্তিকেও ধর্ম বলা চলে।

ধর্ম মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—তার অন্তরতম সত্য।

এ ছাড়া বহির্জগতে মানুষ যে ধর্মের দ্বারা পরিচিত রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন সাম্প্রদায়িক ধর্ম।

সমাজ জীবনে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ একটি সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও সে সাম্প্রদায়িক ধর্মকে অতিক্রম করে তিনি একটি বৃহৎ চেতনাময় পরিপূর্ণ মানবধর্ম লাভের সাধনা করেছেন সমগ্র জীবন ধরে। ধর্ম সাধনায় এখানেই রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব।

উদার ধর্মপ্রত্যয়ের ফলে রবীন্দ্রনাথ তাই বলতে পারেন 'আমার ধর্ম আমার জীবনেরই মূলে'। এ অন্তর্নিহিত ধর্মবোধ কবির জীবন-

বিকাশকে আশ্রয় করে ক্রমশঃ বৃহৎ ব্যাপ্তি লাভ করেছে।

শুধু জীবন-বিকাশের ক্ষেত্রে নয় কবির বিশ্বাস তাঁর রচনার বিভিন্ন স্থানেও এ ক্রমবিকাশশীল ধর্মবোধ চিহ্ন রেখে গেছে।

কবি-জীবনের এ বিশিষ্ট ধর্মবোধ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের প্রধান অভিযোগ এই যে—এ ধর্ম মুখ্যতঃ শান্তির ধর্ম, এর মধ্যে শক্তির পরিচয় নেই।

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে কবি এ অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন সমাজে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর ধর্মানুসরণকারী দেখা যায়। এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা কর্মকে বাদ দিয়ে বৈরাগ্যের মধ্যে ধর্মের পথ খোঁজেন। আর এক শ্রেণীর লোক সংসারকে ভুলে গিয়ে রসসম্ভোগের পথে ধর্ম অর্জন করতে চান। আবার আর এক দল লোক আছেন 'যাঁরা সুখ দুঃখ সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব-সমেত এই সংসারকেই সত্যের মধ্যে জেনে চরিতার্থতা লাভ করাকেই ধর্ম বলে জানেন'।

রবীন্দ্রনাথের মতে যে ধর্ম সংসার-বৈরাগ্যের মধ্যে মুক্তি খোঁজে কিংবা যে ধর্ম সংসারকে ভুলে রসসম্ভোগের মধ্যে তৃপ্ত হয়ে থাকে সে ধর্মবোধে কোন-পৌরুষ বা শক্তি নেই। যে ধর্ম সংসারের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব সুখ দুঃখকে স্বীকার করে তার মধ্যে আনন্দ উপলব্ধি করে সে ধর্মই পৌরুষবীর্যশালী শক্তিমানের ধর্ম।

এখন আলোচ্য রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ কোনটি?

রবীন্দ্রনাথ বলেন সংসারের সুখদুঃখ আনন্দবেদনা সব কিছুই মানবজীবনে সত্য এবং সব কিছুকে নিয়েই মানুষ সম্পূর্ণতা অর্জন করে। সত্যের কোন অংশকে বাদ দিয়ে বা কাটছাট দিয়ে ধর্ম-উপলব্ধির জগতে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সামঞ্জস্য সত্যের ধর্ম হলেও সে সামঞ্জস্য 'বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ করে এবং অতিক্রম করে'। রবীন্দ্রনাথের সত্যধর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি অসামঞ্জস্যকেও ধর্মের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না। এখানেই বঙ্কিম প্রভৃতি পূর্ববর্তী চিন্তানায়কদের ধর্মবোধ থেকে

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা।

নির্দ্বন্দ্ব শান্ত অবস্থা থেকে সমস্ত বিরোধ-বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে একটি পরিপূর্ণ সত্যবোধের জগতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনা শুধু রবীন্দ্র-জীবনকে একটি বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত করেনি—রবীন্দ্র-কাব্যকেও একটি মহৎ পরিণতির দিকে আকর্ষণ করেছে।

শান্তরসাস্পদ প্রকৃতির সাহচর্যে ররীন্দ্রনাথের কবি-মন অতি অল্প বয়সেই মুকুলিত হয়ে উঠেছিল। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবি-মনের এ মিলনে কোন বাধা ছিল না। বৃহত্তর মানব-জীবনের নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিরোধ-বিক্ষোভ তাঁর শান্ত মনকে তখনও আলোড়িত করেনি। কিন্তু এতে তাঁর মন ভরেনি। যৌবনে মানবরাজ্যে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন জীবনের আর এক রূপ। সে রূপ অতি জটিল। মানুষের ক্ষুদ্রতা বৃহত্তর জীবন-প্রয়াসকে আঘাত করে, মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, বর্তমান ভবিষ্যৎকে বিনষ্টির পথে এগিয়ে দেয়। সর্বশেষে ব্যক্তিগত দুঃখশোক এমন একান্ত হয়ে উঠে যে কোথাও সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন মানুষের নিত্য-নিয়ত প্রয়াস হয় প্রাণপণে সঞ্চয় করার, ছোট ছোট ঈর্ষা দ্বেষ এমন প্রচণ্ড আঘাত করে যে জীবন ধারণের প্রয়াস পর্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

জীবনের এরূপ বিমর্ষ অবস্থার মধ্যেই রবীন্দ্র-মনে জেগে উঠেছিল বৃহত্তর জীবন সত্য লাভের জন্য একটি ক্লান্তিহীন ব্যাকুলতা—'বর্ষশেষ' কবিতায় যার জীবন্ত স্বাক্ষর বর্তমান। 'সোনার তরী'র অন্তর্গত 'বিশ্ব-নৃত্য' কবিতা সে বৃহত্তর জীবন-সত্যের একটি আবেগময় প্রকাশ। এ কবিতার মর্মার্থ সম্পর্কে কবি বলেছেন: 'বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে একজন চিণ্ময় পুরুষ সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেদ করে দুর্গম বন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করছেন এখানে তারই কথা দেখি। এখন থেকে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল'।

জীবনে বিরোধ-বিক্ষোভের সম্মুখীন হওয়াটাই বড় কথা নয়। সে বিরোধের মধ্যে মঙ্গলময় ঐক্যের যে একটি স্বর্ণসূত্র বর্তমান তার

সন্ধান পাওয়ার প্রয়াসই হল বৃহত্তর মানবসত্য লাভের উপায়। জীবন যদি শুধু দ্বন্দ্বময় হত, তার মধ্যে কোন মঙ্গলময় সামঞ্জস্য না থাকত তাহলে সে জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। সেজন্যেই জীবনের এ স্তরে এসে রবীন্দ্রচিত্তে জেগে উঠল শিব বা মঙ্গললাভের আকাঙ্খা। কিন্তু সে মঙ্গলের রূপ মধুর নয়। জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত বিরোধ-বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হয় বলে মঙ্গলের রূপও ভীষণ-মধুর। এ ভীষণ-মধুর মঙ্গল দেবতাকে জানার বেদনা বড় তীব্র। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন 'এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ শান্তির মধ্যে তার গর্ভবাস'। 'নৈবেদ্যে'র কোন কোন কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্ব-জীবনে অনুভূত এ ভীষণ-মধুর মঙ্গল দেবতার প্রভাবের কথা বলেছেন। 'চিত্রা' কাব্যেও নির্দ্বন্দ্ব শান্তির পথ ত্যাগ করে কর্মজগতের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জীবনসত্য লাভের জন্য আকাঙ্খার তীব্রতাই ব্যক্ত হয়েছে। কবি-জীবনের এ পর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে অবর্ণনীয় দুঃখ দুঃসহ নির্যাতন ও পরিপূর্ণ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত স্মরণীয় মহাপুরুষ জীবনের মহত্তম সত্যের সন্ধান করেছেন তাঁদের দ্বন্দ্বময় জীবনই ধর্মাদর্শের প্রতীক। 'কল্পনা' কাব্যও সে বৃহত্তর জীবনের বাণীস্পন্দিত। এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যে জীবনের আহ্বান শুনতে পেয়েছেন সে আহ্বান শক্তির —'কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক ; রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়'।

এভাবে রবীন্দ্র-চিত্তের উত্তরণ ঘটল অস্পষ্ট ভাবলোক থেকে প্রত্যক্ষ মানবলোকে। অবশ্য এ উত্তরণের যাত্রাপথ ছিল কবির চোখে অস্পষ্ট ছায়াছন্ন।

দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ প্রত্যক্ষ মানবলোকের সংস্পর্শে এসে কবির নব-উপলব্ধ ধর্ম-ধারণাও হয়ে উঠল স্পষ্ট :

> ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে চাই, তারপরে সুখ পাই আর না-পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।

পত্রে লিখিত স্ব-জীবনের এ ধর্ম ব্যাখ্যার মধ্যে হয়ত বা কিছু ভাবোচ্ছ্বাস আছে। তথাপি কবির জীবন-ধর্ম এখানে অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ বিবর্তনে বিশ্বাসী। বর্ষশেষ কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন তাঁর ধর্মবোধেরও একটি বিবর্তন আছে। সে বিবর্তনের গতি হল শান্ত মাধুর্যময় নিসর্গলোক থেকে বিরোধ-বিক্ষুব্ধ মানবলোকের দিকে। এ বিবর্তন অবশ্য সহজে ঘটেনি। বর্ষশেষে রুদ্র-প্রকৃতির অকস্মাৎ আবির্ভাব রবীন্দ্রচিত্তে এ অঘটন ঘটাতে সাহায্য করল। 'সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে'।

স্বীয়-জীবন-পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন তিনি মুখ্যতঃ কবি। ধর্মবোধের এ নবতর উপলব্ধিকেও প্রথমে রূপ দিলেন তিনি কাব্যোচ্ছ্বসিত অলংকৃত ভাষায়। এ প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত লেখকের 'পাগল' প্রবন্ধ স্মর্তব্য। এ প্রবন্ধে তিনি এ কথাটিই বলতে চেয়েছেন ধ্বংসের দেবতা যদি আমাদের জীবনকে সকল জীর্ণতা ও মালিন্যমুক্ত না করত তাহলে আমরা সীমাবদ্ধ জীবনের মোহত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তর জীবনের সন্ধান পেতাম না। 'অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনই রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে'।

শুধু প্রবন্ধে নয় এ যুগের কাব্য-কবিতায়ও 'দুঃখ বিপদ বিরোধ মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব'-এর সুগভীর উপলব্ধি। উৎসর্গের 'মরণ মিলন' খেয়ার 'আগমন' 'দান' প্রভৃতি কবিতা এ উপলব্ধির অভ্রান্ত স্বাক্ষর।

আঘাত সংঘাত বিরোধ-মৃত্যু অশান্তি মানুষকে আরামগর্ভ জড় জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে বৃহত্তর জীবনের সন্ধান দেয় এ কথাটা

সত্য। কিন্তু শান্তরসের কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে এও জীবনের চরম সত্য নয়। কবির উপলব্ধিতে জীবনের চরমতম ও পরমতম সত্য হল অসংখ্য বিরোধ-বাধার মধ্য দিয়ে একটি গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ শান্তি লাভ। রবীন্দ্র-জীবন-জিজ্ঞাসার এ হল একটা বড় সূত্র।

শুধু কাব্যে নয় 'শারদোৎসব' থেকে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত সমস্ত নাটকের মর্মকথাও হল এই।

দ্বন্দ্বহীন শান্তি তত্ত্বজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের কাছে চরম সত্য নয়। দ্বন্দ্বজনিত দুঃখকে অস্বীকার করে নয়—অতিক্রম করে জীবনে যে আনন্দ লভ্য সে আনন্দের সাধনাই রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

স্বীয় ধর্মবোধের পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে যে সমস্ত কথা বলেছেন তাতে তাঁর উপলব্ধ ধর্মের রূপ হয়ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেনি। এ অসম্পূর্ণতার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন তাঁর জীবনধর্ম 'অনুশাসন-আকারে তত্ত্ব-আকারে কোন পুঁথিতে লেখা ধর্ম নয়। সেই ধর্মকে জীবনের মর্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, উদ্ঘাটিত ক'রে, স্থির ক'রে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরস ভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ কথা নিশ্চয়ই জানি'।

যে প্রথা ও অনুশাসন শাসিত ধর্ম স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের জাতীয় জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্বজীবনে অনুভূত উদার ধর্মবোধ তারই যেন তীব্র প্রতিবাদ! রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটাতে পারে—কর্মের যোগে আনন্দের যোগে। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের উদার ধর্মবোধ সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই অভিনন্দনযোগ্য মনে হবে নিশ্চয়ই।

নিজের ধর্মবোধের ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করে তিনটি স্তর-পরম্পরার কথা উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে ঃ

১ ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তম, মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মত কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়।

২ তারপরে মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না। সেই অবস্থায় শিবম, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়।

৩ শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা সঙ্গম। সেখানে অদ্বৈতম। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদ ও বিরোধের সাগর পার হওয়া, তা নয়। সেখানে তরী থেকে তীরে উঠা। সেখানে যে আনন্দ সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়।

ধর্মবোধের এ উদার উপলব্ধিকে রবীন্দ্রনাথ যেমন রূপ দিতে চেয়েছিলেন নিজের ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসে আচরণে এবং জীবনের বিচিত্র কর্মপ্রয়াসের মধ্যে তেমনি সে উপলব্ধিকে রূপ দিয়েছেন তিনি তাঁর বহুব্যাপ্ত শিল্প-সৌন্দর্যমণ্ডিত সাহিত্য-কর্মে।

সাহিত্যে প্রকাশিত ধর্মবোধের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন ঃ

> আমার রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ-উপলব্ধিই ধর্মবোধ যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ আর একদিকে মিলন, একদিকে বন্ধন আর এক দিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে।

রবীন্দ্র চিত্তের এ আপাত-বিরোধী ধর্মবোধের মর্মগ্রহণ না করে

রবীন্দ্র সাহিত্যের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করার মত ব্যর্থ প্রয়াস আর বোধ হয় কিছুই নেই।

আত্মানুসন্ধানের প্রেক্ষিতে আত্মপরিচয়

কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বাসীরা যখন আনন্দোদ্বেল কবি তখন নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির আলোকে আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটন করেন তাঁদের সামনে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে। সে ১৩৩৮ সনের কথা (১৯৩১ খ্রীঃ অঃ)। সে ভাষণের কবি-কর্তৃক সংশোধিত অনুলিপি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় সে বৎসরেরই জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসী পত্রিকায়।

এ অভিভাষণে পরিণতবয়স্ক কবির আত্মানুসন্ধানটাই ছিল মুখ্য। সেজন্যে এ সময়কার আত্মপরিচয়ও ছিল গভীর জীবনবোধের সুর-স্পন্দিত।

স্বীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে বিভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত হয়েছেন। কেউ বলেছেন তাঁকে উগ্র স্বদেশ-প্রেমিক, কারো মতে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদী বিশ্বপ্রেমিক, কারো মতে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন শিক্ষাবিদ্, কেউ বলেন তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ধর্মগুরু, আবার কারো কারো মতে তিনি মনীষী সমাজনেতা। এ তো বাইরের লোকের কাছে রবীন্দ্রনাথের নানা পরিচয়। কিন্তু পরিণত আয়ুর ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে কী?

> নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না।

মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঐক্যসূত্রটি ধরা দুঃসাধ্য কর্ম বলেই জনসমাজে মানুষ বিভিন্ন পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করে—যেমন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সে খণ্ড বিচ্ছিন্ন পরিচয়ের মধ্যে মানুষের পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। সত্তর বৎসরের আয়ুঃসীমায় দাঁড়িয়ে আত্মানুসন্ধানের আলোকে কবি তাই নিজের সামগ্রিক পরিচয়টি

পেতে চাইলেন। এ প্রয়াসের ফলেই ঘটল সত্যিকারের আত্মপরিচয়। প্রত্যয়ান্বিত কবি একটিমাত্র কথায় উদ্‌ঘাটিত করলেন সে পরিচয়ঃ

একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় ও ভাষণে মানুষের জটিল জীবন-তত্ত্ব সুগভীর রূপ পেয়েছে—এ কথা সত্য। তাই বলে তাঁকে তত্ত্বজ্ঞানী বা শাস্ত্রজ্ঞানী বলে চিহ্নিত করলে ভুল করা হবে। জাতীয় সংকটে দেশনেতার সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মুক্তিপ্রয়াসী জাতিকে তিনি বাঞ্ছিত লক্ষ্যের দিকে চালনা করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন—এটাও ঠিক। তাই বলে রাজনীতিজ্ঞ বলে তাঁকে মনে করাও ভুল হবে। সমাজ কল্যাণের জন্যে তাঁর গঠনধর্মী কর্মের প্রসারও বড় কম ছিল না। কিন্তু সে পরিচয়ও তাঁর বড় নয়। রবীন্দ্রনাথের সব চাইতে বড় পরিচয় তাঁর অননুকরণীয় ভাষাতেই বলিঃ

আমি সেই বিচিত্রের দূত।······বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ।······যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে, সুরে গানে, নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে-রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে সংঘাতে, ভালো মন্দের দ্বন্দ্বে তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এই আমার একমাত্র পরিচয়।

সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ কবি জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর অভিজ্ঞতার আলোকে যখন আত্মপরিচয়কে এ ভাবে তুলে ধরেন তখন তাকে আমরা কবির কাব্যিক খেয়াল বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। এ আত্মপরিচয় তাঁর আত্মোপলব্ধিরই ফল। এ শুধু তাঁর বাইরের পরিচয় নয়—আত্মারই পরিচয়। এ পরিচয় তাঁর জীবনের পরীক্ষিত সত্য।

কবি অনুভব করেছেন, সৌন্দর্যের যে চিরচঞ্চল দেবতা তাঁকে জীবনের প্রথমেই সৌন্দর্যসৃষ্টির কাজে নিয়োজিত করেছিলেন তাঁরই অনতিক্রমনীয় প্রভাব বার্ধক্যেও তাঁর জীবনে ছিল সমানভাবে সক্রিয়।

জীবনের নানা পথে তিনি ভ্রমণ করেছেন, বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কিন্তু যে পথ তাঁকে নিত্যনিয়ত জীবনে আকর্ষণ করেছে সে হল সৌন্দর্যসৃষ্টির পথ। সেজন্যে সত্তর বৎসরের আয়ুঃ-সীমায় দাঁড়িয়ে কবি নিঃসংশয়ে বলতে পারেন: 'আমি চঞ্চলের লীলাসহচর'।

একটি অতি-তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যানুভূতির প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন সৌন্দর্যসৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভামুগ্ধ ভাবপ্রবণ সমালোচক সে সৃষ্টির স্থায়িত্ব সম্পর্কে যত সোৎসাহ বাক্যই প্রয়োগ করুন না কেন সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞ কবি নির্মোহ দৃষ্টিতে তার গুণগত মূল্য নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন আত্ম-পরিচয়ে। তাঁর প্রতিভা-মোহমুগ্ধ ভক্তদের লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন:

> তাঁর খেলাঘরের যদি কিছু খেলনা জুগিয়ে দিয়ে থাকি তা মহাকাল সংগ্রহ করে রাখবেন এমন আশা করিনে। ভাঙা খেলনা আবর্জনার স্তূপে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি সেই সময়টুকুর মতোই মাটির ভাঁড়ে যদি কিছু আনন্দরস জুগিয়ে থাকি সেই যথেষ্ট।......লোকালয়ে খ্যাতির যে হরির লুট ধুলোয় ধুলোয় লোটায় তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে চাইনে। মজুরির হিসেব নিয়ে চড়া গলায় তর্ক করবার বুদ্ধি যেন আমার না ঘটে।

একেই বলে সৎ-সাহিত্যিকের সাহিত্যবিবেক! সত্তর বৎসরের প্রবীণ কবি যখন দেশে বিদেশে সাহিত্যখ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে সুপ্রতিষ্ঠিত তখন নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে এ অতি-কঠোর আত্মসমালোচনা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ যে কত মহৎ ও কত বৃহৎ ছিল নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রবীণ কবির নিরপেক্ষ আত্মসমালোচনাই তার প্রমাণ। এ আত্মসমালোচনার মধ্যে আর যাই থাক বর্তমান যশোলোলুপ লেখকের কৌশলপূর্ণ বিনয় বা কপটতা নেই।

স্বকীয় ধর্মব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই বলেছেন প্রকাশ-ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলাই হল মানুষের সত্যিকারের জীবন-ধর্ম। কবি বলেন এ জীবনতত্ত্বেরই বাস্তব পরীক্ষাগার হল শান্তিনিকেতন

আশ্রম। এখানকার আইন-কানুনের কড়া বেড়াজালে তিনি কখনও আপনাকে বা আশ্রমবাসী শিক্ষার্থীদের জড়িয়ে ফেলতে চান নি।

আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সুকুমারমতি বালক বালিকাদের চিত্তে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলাই ছিল রবীন্দ্রনাথের এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য। গতানুগতিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রণালীর মোহে যাদের চিত্ত আচ্ছন্ন তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের এ অভিনব শিক্ষাপরিকল্পনা কম সমালোচনার সামগ্রী হয়নি। যতই দিন যাচ্ছে মননশীল কবি রবান্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের এ অব্যর্থতার কথা স্বাধীন ভারতে স্বীকৃতি পাচ্ছে। স্মৃতির সাহায্যে তোতাপাখীর মত মুখস্থ করে পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করা যায় এ কথা সত্য। সে কৃতিত্বের সাহায্যে উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হয়ে সামাজিক সম্মানও লাভ করা যায় এ কথাও স্বীকার্য। কিন্তু সামাজিক মর্যাদার উচ্চ শিখরে উঠেও অনেক কৃতি ব্যক্তি অনুভব করেন জীবনের বৃহত্তর প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমাদের প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার এখানেই হল ব্যর্থতা।

পরাধীন দেশে বাস করেও এ ব্যর্থতার বেদনা থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন স্বাধীনচিত্ত রবীন্দ্রনাথ। ভবিষ্যৎদ্রষ্টার দৃষ্টি দিয়ে তিনি ভারতের বন্ধনমুক্তির উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখেছিলেন। বন্ধনমুক্ত ভারতবাসীর জন্যে তিনি যে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিলেন তা ছিল উদার—পরানুকরণমুক্ত, মানুষের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক। রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির দীর্ঘ পনের বৎসর পরও সে প্রাণহীন নিয়মের দাসত্ব থেকে আমরা মুক্ত হতে পেরেছি কী—এ আত্মবীক্ষা আমাদের হওয়া উচিত। আজও আমাদের শিক্ষায় মনের সঙ্গে প্রাণের স্পর্শ লাগেনি। তাই শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর, এমনকি শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের বিরোধ উগ্রমূর্তি ধারণ করে আমাদের সমস্যাসঙ্কুল জাতীয় জীবনে নতুনতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

কৃত্রিম নাগরিক জীবনে শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্ধত অবিনয় রবীন্দ্র চিত্তে সৃষ্টি করেছিল তাই একটি প্রবল প্রতিক্রিয়া। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাকে তিনি তাই করে তুলতে চাইলেন সজীব প্রাণবন্ত। শিক্ষার্থীদের প্রাণের সঙ্গে আনন্দের সম্মিলন ঘটিয়ে শিক্ষায় নবরূপ পরিকল্পনা করলেন কবি।' সে শিক্ষা হবে প্রকৃতির অবারিত পরিবেশে। নতুন কর্মবন্ধনে জড়িয়ে পড়লেন চঞ্চলের লীলাসহচর। বহুকর্মান্বিত এ বন্ধনের মধ্যেই হল তাঁর প্রাণের অভূতপূর্ব প্রকাশ। এ বন্ধন-মুক্তির আনন্দের মধ্যেই জন্ম নিল তাঁর প্রথম শ্রেণীর বহু কবিতা, উৎকৃষ্ট সঙ্গীত, নতুন প্রকরণের নাটক। অভিনয়ের প্রয়োগ ক্ষেত্রে আনলেন নতুন কলাকৌশল। সৃষ্টি হল তাঁর হাতে নতুন ভঙ্গি'র চিত্রশিল্প। নিত্য নতুন নৃত্য পরিকল্পনায় আনন্দের হাওয়া সঞ্চারিত করে দিলেন দেশবাসীর চিত্তে।

প্রকৃতির যে নির্বাধ সৌন্দর্য, শিশুপ্রকৃতির যে নির্মল আনন্দ, সহকর্মী ও আশ্রমবাসীদের প্রাণের যে সুকুমার স্পর্শ মাটির কাছাকাছি মানুষের যে অবাধ প্রাণলীলা তাঁর অনুভূতিশীল চিত্তকে জাগিয়ে তুলেছিল নতুন নতুন সৃষ্টির আনন্দে—তাদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার বাণী নিবেদন করলেন কবি পরিশেষে তাঁর ভাবাবেগ স্পন্দিত ভাষায়ঃ

> এই ধুলো-মাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।

বিশ্বকবির সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আনন্দিত দেশবাসী রবীন্দ্র-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান করলেন ১৩৩৮ সালের ১১ই পৌষ (১৯৩১)। সে অনুষ্ঠানে পাঠ করবার উদ্দেশ্যে রচিত প্রবন্ধটি সেখানে পাঠ করা সম্ভব না হওয়ায় কবি উহা পাঠ করেন সে বৎসরেরই ১৫ই পৌষ ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক সেনেট হলে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে। এ নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে কবি নিজের যে পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করলেন তা শুধু ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে সত্য নয়—দেশকালের পটভূমিকায় তাঁর স্ব-জীবন ও সাহিত্যের সত্যমূল্য নির্ধারণেরও পরম সহায়ক।

মানুষের জীবন-বিকাশে পরিজন ও পরিবেশের অনিবার্য প্রভাবের কথা স্বীকার করে নিয়েই কবি নিজের চিত্ত-বিকাশের ক্রমটিকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন এ প্রতিভাষণে।

পৈতৃক বাসভূমিতে কবি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন সেখানে একটি যুগসন্ধির কাল চলছে: 'এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনও এসে পৌঁছয়নি।' পূর্বপুরুষের ঐশ্বর্যের দম্ভ তখন লুপ্ত। এমনকি তার স্মৃতিও প্রায় অপসৃত। তবু বেশভূষায় চালচলনে ভাষাভঙ্গীতে সে যুগের কলকাতায় ঠাকুরবাড়ীর স্বাতন্ত্র্য ছিল চিহ্নিত। যে যুগে বিদেশী ভাষার মোহে সমগ্র দেশব্যাপী চলছিল মাতৃভাষার প্রতি চরম অমর্য্যাদা ও অবহেলা সে বিষাক্ত পরিবেশে ঠাকুরবাড়ীতে 'বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।'

এরূপ জীবনপরিবেশে মাতৃভাষার প্রতি রবীন্দ্র মনে অকুণ্ঠ প্রীতি সঞ্চারিত হয়েছিল কিশোর বয়স থেকেই।

ঠাকুর বাড়ীর ধর্মীয় পরিবেশটাও ছিল উল্লেখযোগ্য। উদ্বেল

ভাবাবেগময় ধর্মাচরণের বাহুল্য ঠাকুরবাড়ী তখন বর্জন করেছে, উপনিষদের মাধ্যমে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের সঙ্গে এ বাড়ীর একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায়। এ অবস্থায় শিশু রবীন্দ্রনাথকে প্রতিদিনই আবৃত্তি করতে হয়েছে বিশুদ্ধ উচ্চারণে উপনিষদের শ্লোক। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের শুধু জীবনের উপর নয়, সাহিত্যের উপরও উপনিষদ যে কত জীবন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন কোন কোন রবীন্দ্র-গবেষক (দ্রষ্টব্য, উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস—ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত)। পারিবারিক ধর্মীয় পরিবেশের আর একটি স্বাতন্ত্র্য শিশু রবীন্দ্র-মনের উপর যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল সে হল তাঁর পিতৃদেব প্রবর্তিত শান্ত সমাহিত উপাসনা। রবীন্দ্রনাথের সার্থক কাব্য রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি'র যে সুর ধ্বনিত হয়েছে তার প্রথম প্রেরণা এসেছিল খুব সম্ভব প্রথম জীবনে পিতৃদেবের এ শান্ত সমাহিত উপাসনা দেখে।

ঠাকুর বাড়ীতে তখন দেশী বিদেশী সাহিত্য চর্চায় সাহিত্যের আবহাওয়াও জমজমাট। আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্বদেশ প্রেমের একটা উদ্দাম হাওয়া তখন প্রবাহিত হচ্ছিল ঠাকুর বাড়ীকে কেন্দ্র করে। এ হল রবীন্দ্রনাথের বালক বয়সে ঠাকুর বাড়ীর বহির্দিককার পরিবেশ। অন্তঃপুরের পরিবেশও ছিল একটু অদ্ভুত। পিতা থাকেন বৎসরের অধিককাল হিমালয়ে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের কর্তৃত্বে কাটল কবির শৈশব। প্রথানুযায়ী পড়াশোনায় মন নেই অথচ পদ্য মেলাবার দিকে ঝোঁক। রবীন্দ্র-মনের এ দিকটাকে সস্নেহে প্রশ্রয় দিয়ে তাঁর কবি-চিত্তকে বিকশিত করে তুলতে এ সময়ে যিনি সহায়তা করেন সে জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথা কবি সারাজীবনও ভুলতে পারেন নি।

শুরু হল সমসাময়িক সাহিত্য পত্রে নতুন রীতির কবিতার মাধ্যমে কবি-মনের অস্ফুট প্রকাশ। সত্তর বৎসর বয়সোত্তীর্ণ কবি

সে বাল্য রচনার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ঃ 'আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে।' সেযুগের বয়স্ক লেখকেরা এ কনিষ্ঠ লেখকের যে সমালোচনা করেছিলেন তার মধ্যে শাসন থাকলেও অসৌজন্য ছিল না। বিমুখতা থাকলেও বিদ্বেষ ছিল না। প্রবীণ বয়সে কবি তাঁর এ বিরুদ্ধবাদীদের কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন। তাঁদের সৌজন্যবোধ ও অবিদ্বেষই বালক কবির নতুন রীতির কাব্য রচনা-প্রয়াসকে সম্ভব করে তুলেছিল। পরবর্তী রবীন্দ্র-সমালোচকদের সহৃদয়তার অভাবকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে এ মন্তব্য করেছেন।

এর পরে এল রবীন্দ্র কবি-জীবনে একটি নিছক কল্পনা-প্রবণতার যুগ সে যুগও একদিন কেটে গেল। কাব্য ও জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে এল খ্যাতির প্রাচুর্য। খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীরাও মুখর হয়ে উঠলেন। অপমানে অসম্মানে ও তীব্র সমালোচনায় জর্জরিত করে তুললেন কবিকে। সে যুগের সে বিক্ষত কবি-মনের রূপ ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের বহু গদ্য পদ্য রচনায়। পরিণত বয়সে কবি বুঝতে পেরেছেন—সে দুঃসহ সমালোচনা হল তাঁর সে যুগের 'খ্যাতি পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি'। এ মনে করেও তিনি সান্ত্বনা পেয়েছেন যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর পৌরুষ ছিল সেদিন অপ্রতিহত। জীবনের পরিণতিতে এসে বন্ধুদের কাছ থেকে অযাচিত সমাদর পেয়ে কবির বিরোধবিক্ষুব্ধ দিনের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে গেল।

জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে দেশবাসীর কাছ থেকে অবারিত প্রীতির অঞ্জলি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন না। এ শ্রদ্ধার দানকে বিচার করে গ্রহণ করবার জন্যে তিনি অগ্রসর হলেন। তিনি বললেন, যে ব্যক্তির মধ্যে 'দেশ আপন ভাষাবান প্রকাশ অনুভব করে তাকে সর্বসমক্ষে নিজের বলে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ্য রচনা করতে

চায়। যেদিন তাই করে,······সেদিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম'। জয়ন্তী উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্যও হল এই। উৎসবের এ তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে দেশবাসীর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ 'আমাকে গ্রহণ করার দ্বারা দেশ যদি কোনো-ভাবে নিজেকে লাভ না করে থাকে তবে আজকের এ উৎসব অর্থহীন'।

দেশের কাছে নিজের মূল্য সম্পর্কে পরিণতবয়স্ক কবির এ উক্তিকে দর্পিত-ভাষণ মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁর পরবর্তী উক্তিগুলি লক্ষ্য করলে এ সন্দেহ অমূলক বলে মনে হবে। তিনি বলেছেন তাঁর খ্যাতির সম্বল খুব বেশী নয়। সে স্বল্প পুঁজিকে কেন্দ্র করে দেশবাসী যদি বেশী মাতামাতি করে তাহলে দেশবাসীর উৎসাহ খুব বেশী দিন উদ্দীপ্ত নাও থাকতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাসে খ্যাতি ক্ষণমুখরা; সাহিত্যরুচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতির পাত্রেরও আদর বা অনাদর ঘটে। যে দ্রুতগতির মধ্যে মানুষ এ যন্ত্র যুগে বাস করছে সে যুগে সাহিত্যের রূপ রীতি ঢং সবই পালটে যাচ্ছে। ব্যস্ততার যুগে ধীরে সুস্থে বসে কবিতার রসাস্বাদন করবার সময় কারো নেই। এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের কবিতাও যদি ভবিষ্যতে অনাদৃত হয় তাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নেই। চমৎকার ভঙ্গীতে কথাটাকে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঃ 'মানুষের প্রাণটা চিরদিনই ছন্দে বাঁধা, কিন্তু তার কালটা কলের তাড়ায় সম্প্রতি ছন্দ ভাঙা।'

সাহিত্যখ্যাতির স্থায়িত্বের প্রশ্নে কবি করলেন তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যতত্ত্বের অবতারণা। সাহিত্যকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন তিনি—চিরন্তন ও ক্ষণিক। চিরন্তন সাহিত্য আনন্দের প্রকাশে প্রীতির রসে সৌন্দর্যের রঙে সজ্জিত হয়ে ওঠে। প্রাণের গভীরে সে রস সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে সময় লাগে। অবকাশ যোগায় সে সাহিত্যের প্রাণরস। বর্তমান ব্যস্ততার যুগে মানুষের অবকাশ নেই। এ যুগ প্রয়োজনের—এ যুগ প্রীতির নয়। 'প্রয়োজনের

তাগিদ কচুরিপানার মতোই সাহিত্যধারার মধ্যেও ভুরি ভুরি ঢুকে পড়েছে'। এ পর্যায়ের সাহিত্য রসসমন্বিত হয়ে পাঠকের অন্তরে তাই চিরযুগের জন্য বাসা বাঁধতে পারে না। প্রয়োজনের তাগিদ মিটলেই সে সাহিত্যের আবেদন যায় ফুরিয়ে। সেজন্যে আধুনিক সাহিত্যে রীতির বদল ঘটছে হামেশাই। বাস্তবতার নামে স্বল্পায়ু ফ্যাশান সৃষ্টিই সে সাহিত্যের লক্ষ্য। এ সাহিত্যের মূল্য গুণগত নয় কালগত। আমাদের দেশে এ পর্যায়ের সাহিত্য গতিশীল পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণে সৃষ্ট হতে চলেছে। সেজন্যে তার উদ্ধত অহংকারের সীমা নেই। এ শ্রেণীর স্পর্ধিত লেখক আমাদের দেশের রসসমন্বিত পুরাতন রীতির সাহিত্যকে আঘাত করতেও কুণ্ঠিত হন না।

এখানেই প্রবীণ কবি রবীন্দ্রনাথের ভয়। এখানেই তাঁর সন্দেহ তাঁর রসবাদী সাহিত্য কালের ভাঙনের মুখে কতদিন টিকে থাকবে।

একালের বিচারে যে রসসমন্বিত সাহিত্যকে মূল্যহীন বলে মনে করা হচ্ছে সে সাহিত্যের তাহলে কী কোন মূল্য নেই? এ বিতর্ক-সঙ্কুল প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'তিনি বলেছেন—স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির যোগ যদি আন্তরিক হয়ে থাকে সেখানেই সৃষ্টি সত্য হয়ে উঠে এবং 'কবির সৃষ্টি যদি সত্য হয়ে থাকে সেই সত্যের গৌরব সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। দশজনে তাকে স্বীকার করেনি এমন প্রায়ই ঘটে থাকে। তাতে বাজার দরের ক্ষতি হয় কিন্তু সত্যমূল্যের কমতি হয় না'।

সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় স্ব-যুগে এ শ্রেণীর সত্যসন্ধ কবির অনাদর হয়েছে বারে বারে। কিন্তু অনাদরে উপেক্ষায় নিত্যতার সুদূরবিস্তারি আকাশে তাঁদের জ্যোতি কখনও ম্লান হয়নি।

সার্থক কালজয়ী বড় কবি সম্পর্কে নিজের ধারণাকেও ফুটিয়ে তুললেন রবীন্দ্রনাথ। কবির মতে সে কবিই যথার্থ বড় যিনি 'এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর'। সে

কবির কাব্যে সুরেরও থাকবে অসীম বৈচিত্র্য। সব সুর উদাত্ত হবার দরকার নেই। কিন্তু 'সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে'। প্রয়োজনের দাবী মেটাতে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে বর্তমান যুগে যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে সে সাহিত্যে এমন কোন স্থায়ী সম্পদ নেই যা দূরবর্তী কাল ও বহুজনের মনকে আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে আবার রুচির পরিবর্তনও ঘটতে পারে। তখন আধুনিকও যে পুরাতন হয়ে যাবে—একথাও ত অবশ্যস্বীকার্য।

আসলে আধুনিক সাহিত্যিকদের মনে একটি ক্লান্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের ধ্রুপদী ভাব ও ভাবনাকে ধারণ করবার ও ফুটিয়ে তুলবার সামর্থ্য বর্তমান কালের সাহিত্যিক হারিয়ে ফেলেছেন। সেজন্যে সাহিত্যের চিরকালের বিষয়গুলিকে আধুনিক সাহিত্যিক সেকেলে বলে মনে করছেন। এতে চিরকালীন সাহিত্যের গৌরব কমে না। বর্তমান কালেরই জীর্ণতা সূচনা করে।

প্রকৃত কবির কাজ হল আপন অন্তরের 'অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্‌বোধিত করা'। আধুনিক সাহিত্যিকের সব চাইতে বড় দুর্বলতা হল এই, আপন পরিচিত জগতে তিনি সে অনুরাগের রসকে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন না। অন্তর অনুরাগহীন বলে পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে একটি সহজ সম্পর্ক স্থাপনও তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সেজন্যে তাঁর কল্পনা রসহীন, কাব্যপ্রয়াস চেষ্টাকৃত। 'যে কল্পনা নিজের চারিদিকে আর রস পায় না, সে যে কোন চেষ্টাকৃত রচনাকেই দীর্ঘকাল সরস রাখতে পারবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা'।

বলা বাহুল্য সমকালীন আধুনিক নামধারী যে সমস্ত সাহিত্যিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে নতুন ভাব-চিন্তার মত্ত অহংকারে সাহিত্যের আকাশ মুখরিত করে তুলেছিলেন তাঁদের লক্ষ্য

করেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত উপস্থিত করেন। কবির চিরকালীন সাহিত্যাদর্শকে সমকালীন নব্যপন্থী সাহিত্যিক যতই তীব্রভাবে আক্রমণ করুন না কেন সাহিত্য-রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ভাবভাবনা ও প্রকাশরীতিও যে আজ সেকেলে বলে বিবেচিত হচ্ছে—আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি যাঁরা লক্ষ্য করেন তাঁরা এ কথা জানেন।

সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ অনন্ত কালের আহ্বান অনুভব করেছেন স্ব-জীবনে। সেজন্যে চিরকালীন সাহিত্যের দিকে কবির অন্তরের আকর্ষণ সহজাত। জীবনের প্রারম্ভেই ত্যাগের যে মহান শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন সে মহামন্ত্রই তাঁর কাব্যসাধনার মূল সূত্র। জীবনের প্রতি আসক্তি নয় অনুরাগই তাঁকে মহৎ সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। আসক্তি জীবনকে সংকীর্ণতর করে, তাতে জীবনে গ্লানি আসে ক্লান্তি আসে। সেজন্যে জীবনের প্রতি আসক্তি যে সাহিত্যের লক্ষ্য সে সাহিত্য কালের অগ্রগতির সঙ্গে জীর্ণ হতে বাধ্য। প্রবীণ কবির মতে মহৎ সাহিত্য ভোগাসক্তিবিমুক্ত। সে সাহিত্য 'ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীর কাছ থেকে'।

সত্তর বয়সোত্তীর্ণ প্রবীণ কবি একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নন যে তাঁর কাব্যসাধনায়ও বিবর্তন আছে। তাঁর বহু অপরিণত রচনা সে আসক্তি-বিমুক্ত নয়। সেজন্যে তাঁর সে যুগের রচনার মধ্যে এমন বহু জিনিষ আছে যা বাহুল্য ও বর্জণীয়। সে 'আবাল্য-অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে' তিনি যখন মহামানবের উদ্দেশে তাঁর সমস্ত 'কর্মের অর্ঘ্য ত্যাগের নৈবেদ্য' আহরণ করেছেন তখনই তাঁর বিশাল অন্তর একটি অপরিসীম তৃপ্তির আনন্দে ভরে উঠেছে। পরিণত জীবনে তাঁর বিচিত্র শিল্পসৃষ্টির অক্লান্ত উদ্যম আবর্তিত হয়েছে সে নরদেবতাকে কেন্দ্র করে যিনি 'সর্বদেশ সর্বজাতি

ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে' বিরাজ করেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্পর্ধিত অহংকারকে বর্জন করে সর্বমানবের মিলনের সাধনাকে সার্থক করে তোলাই হল তাঁর পরিণত সাহিত্য-প্রয়াসের মুখ্য লক্ষ্য।

সাহিত্য জীবনে কবি-মনের এ ক্রম-প্রসারই হল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিচারের মূল সূত্র। খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁর সাহিত্যকৃতির বিচার করতে গেলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়—একথা বারে বারে বহুস্থানে ঘোষণা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কবিকে বিচার করতে হবে কবির প্রতি অনুরাগশীল চিত্ত নিয়ে, তাঁর মনের বিকাশের ধারা অবলম্বন করে এবং তাঁর সামগ্রিক রচনার আলোকে।

কবির সৃষ্টির প্রতি সমালোচকের যদি সহানুভূতিপূর্ণ অনুরাগ না থাকে তাহলে সে সৃষ্টির প্রকৃত মর্মগ্রহণ সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'জগতে আজ পর্যন্ত অতি বড়ো সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মাননি, অনুরাগবঞ্চিত পরুষ চিত্ত নিয়ে যাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকেও বিদ্রূপ করা, তার কদর্থ করা, তার প্রতি অশোভন মুখ বিকৃতি করা, যে-কোনো মানুষ না পারে। প্রীতির প্রসন্নতাই সেই সহজ ভূমিকা যার উপরে কবির সৃষ্টি সমগ্র হয়ে, সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশমান হয়'।

সমালোচনার ধর্ম সম্পর্কেও এখানে প্রবীণ সাহিত্যকর্মীর ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সমালোচনার আদর্শ বিষয়ে আধুনিক সমালোচক হয়ত সর্বাংশে এক মত হবেন না। কিন্তু স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের প্রতি সমালোচকের প্রীতিপূর্ণ সহানুভূতি উৎকৃষ্ট সমালোচনার অন্যতম মাপকাঠি—সে সম্পর্কে দ্বিমত হবার বোধ হয় অবকাশ নেই।

এ প্রতিভাষণে সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে মৌলিক দৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে বাংলা সাহিত্যে তা চিরকালের সম্পদ।

'আশি বৎসরের আয়ুঃক্ষেত্রে' প্রবেশ উপলক্ষে কবি যে প্রবন্ধটি রচনা করেন তার মধ্যে শুধু তাঁর বহির্জীবনের পরিচয় নয়, অন্তর্জীবনের পরিচয়টিও অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে বিবৃত হয়েছে। প্রজ্ঞাদৃষ্টির সঙ্গে ভাবদৃষ্টির সম্মিলনে কবির এ আত্ম-পরিচয় একটি সুগভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে। প্রবন্ধটি ১৩৪৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসীতে' 'জন্মদিনে' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-সাধনা হল পূর্ণতার সাধনা। প্রশ্ন উঠে সে পূর্ণতা কার এবং কি উপায়ে লভ্য ? আসন্ন মৃত্যুর নিকট-সীমানায় দাঁড়িয়ে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার আলোকে সে জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন প্রজ্ঞাবান কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছেন : 'সে পূর্ণতা বস্তুর নয়, সে আত্মার। তাই তাকে জানতে হলে বস্তুগত আয়োজনকে লঘু করতে হয়'।

বস্তুজগত থেকে আত্মার রহস্যময় জগতে নির্বাধ সঞ্চরণই হল শেষ জীবনে রবীন্দ্র-মনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

আত্মার কুহেলিকাচ্ছন্ন জগতে কবির আত্মপরিচয় লাভ অবশ্য সহজে ঘটেনি। এ অভীষ্ট লাভের জন্যে নিজেকে দেখেছেন তিনি 'অন্তর্দিকের প্রবর্তনা ও বহির্দিকের অভিমুখিতা থেকে'। দীর্ঘকালের জীবন-সাধনা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তিনি সৃজনক্ষম একটি গূঢ় চেতনাশক্তিকে। তাঁর বিচিত্রধর্মী জীবনকে চালনা করেছেন কবি একটি একাগ্র লক্ষ্যের দিকে—নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে, আত্ম-প্রতিবাদের সুকঠিন পথকে গ্রহণ করে।

পশ্চাতের দিকে তাকিয়ে কবি আজ বুঝতে পারেন তাঁর জীবনের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অন্তর্দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করবার বল ও সাহস জুগিয়েছিল একটি সংস্কারমুক্ত মন—যে মন তাঁর বাল্যকালের পরিবার পরিবেশেরই সৃষ্টি। স্বীয় মুক্ত মনের জন্ম ও বিকাশে পরিবার-পরিবেশের কথা তাই বার বার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ

আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটন প্রসঙ্গে। পরিবেশের প্রভাবে জীর্ণ শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দুষ্ট প্রভাব অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর বন্ধনমুক্ত মনের সঙ্গে অবিমিশ্র যোগ সাধিত হয়েছিল বিশ্বজীবনের এবং বিশ্ব-প্রকৃতির। এ মহামিলনের যোগ তাঁর সৃষ্টিধর্মী মনে এনে দিয়েছিল এক অনির্বচনীয় আনন্দ—যে আনন্দের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে কবির বহুমুখী শিল্পকর্মে।

কিন্তু শিল্প রচনার উৎসে যে আনন্দ সে আনন্দের মূল্য বাস্তব জীবনে কতখানি? 'জীবনে প্রয়োজন আছে অন্ন বস্ত্রে বাসস্থানে, প্রয়োজন নেই আনন্দরূপে অমৃতরূপে'। নিয়মের দাসত্ব মানুষের জীবনধর্ম। কিন্তু নিয়মের জালে বদ্ধ থেকে মানুষ সে আনন্দরূপ অমৃতরূপের সন্ধান পায় না। সৃষ্টির অপার্থিব সৌন্দর্য প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের মধ্যই অনির্বচনীয় হয়ে প্রকাশ পায়। .আনন্দবাদী কবি বলেন ঃ 'বস্তুপুঞ্জকে উত্তীর্ণ হয়ে সেই মহা অবকাশ না থাকলে অনির্বচনীয়কে পেতুম কোনখানে?'

এ যুক্তির আলোকে মনে-প্রাণে কবি রবীন্দ্রনাথ এসে পড়লেন কাব্যের রসতত্ত্ব আলোচনায়। কবি বললেন, কাব্যের রস হল সে জিনিষ যা জীবনের বাস্তবতাকে স্বীকার করেও পাঠক-মনে সৃষ্টি করে একটি অব্যক্ত ভাবরসের ব্যঞ্জনা। 'অত্যন্ত কাছের সংস্রবে কাব্যকে পাইনে, কাব্য আছে রূপকে ধ্বনিকে পেরিয়ে যেখানে আছে স্রষ্টার সেই অর্ধেক যা বস্তুতে আবদ্ধ নয়।...ব্যক্তের বীণাযন্ত্র আপন বাণী পাঠায় অব্যক্তে।'

শিল্প সৃষ্টির লক্ষ্য ও সার্থকতা সম্পর্কে জীবনের শেষ লগ্নে এসে চিরদিনের বাণী উচ্চারণ করেন আজন্মস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। সে ১৯৪০ সালের কথা। উত্তরতিরিশে বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার নামে যে একটা উদ্দাম কোলাহল শুরু হয়েছিল এ সত্য ঐতিহাসিক। সাহিত্যে এ অতি উৎসাহীর দল রসবাদী কবি রবীন্দ্রনাথকেও আক্রমণ করে-ছিলেন কখনও মৃদু ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে কখনও উদ্ধত উত্তেজিত

ভাষায়। সাহিত্যে সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে গেলেন কাব্যে রসতত্ত্ব আলোচনায়—যে আলোচনার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

যে শিল্পী সৃষ্টিকে এত ভালবেসে অপরিসীম সৌন্দর্য রচনা করেছেন সমস্ত জীবন ধরে, জীবনের প্রান্তে এসে তাঁর মন ধাবিত হল সৃষ্টির অতীত অনুভবযোগ্য এক ভাবলোকের দিকে—রবীন্দ্র-মনের পরিচয় প্রসঙ্গে এও এক আশ্চর্য ঘটনা। 'বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে'—এই হল রবীন্দ্র-মনের উত্তরণের পরিচয়। বিশ্বের অতীত এক রহস্যময় সত্তার সামনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্র-মন বিস্মিত—অস্তস্তব্ধ। ইন্দ্রিয় জগতের সৌন্দর্য ও আনন্দ আর তাঁর কাম্য নয়। একটি অনির্বচনীয় জগতের অনুভব-গ্রাহ্য রূপলোকে উত্তীর্ণ হয়ে কবি যেন জীবনের সকল জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেলেন। রবীন্দ্রনাথের রহস্য সন্ধানী মনের ছায়াপাত ঘটেছে সমকালে রচিত (১৯৪০) 'নবজাতকে'র কোন কোন কবিতায়।

এ অনুভূতিগ্রাহ্য সৌন্দর্য ও আনন্দের আলোকে জীবনের কৃতকর্মের বিচার করতে বসলেন কবি। তাঁর কবি-জীবনের সব চেয়ে যে প্রিয় সব চেয়ে বৃহৎ সৃষ্টি শান্তিনিকেতন আশ্রম তারও রূপ এবং রূপক ব্যাখ্যা দিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি বললেন, শান্তিনিকেতন শুধু মানব শিক্ষার যন্ত্রশালা নয়—'কর্মরূপে সেও কাব্য'। জ্ঞানসাধনাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন তিনি এ আশ্রমে 'আনন্দের বেদীতে'। সে আনন্দ কিন্তু ভাবোদ্বেল নয়। বিজ্ঞান শাসিত যুক্তি ও প্রয়োগ-বিদ্যা সে আনন্দের ভিত্তিকে করেছিল দৃঢ় ও সুকঠিন। এ সর্বব্যাপক আদর্শ লাভের লক্ষ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তিকেই স্মরণ করি : 'যাঁকে বাদ দিয়ে বড়ো বড়ো জ্ঞানীদেরও যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না তিনি বুদ্ধিযোগের দ্বারাই মিলিত হন, মন্ত্রের যোগ নয়, যাদুমূলক অনুষ্ঠানের যোগে নয়। তাই ধী এবং আনন্দ এই দুই শক্তিকে এখানকার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করতে চিরদিন চেষ্টা করেছি।'

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায় কবির লক্ষ্য ছিল মুখ্যতঃ দ্বিমুখী। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের যোগকে তিনি এখানে যেমন অবারিত করতে চেয়েছিলেন তেমনি চেয়েছিলেন মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তরের যোগকে সহজ করে তুলতে। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন বাঁচবার জন্য প্রতিযোগিতা হল পশুর ধর্ম, আর পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা হল মানুষের ধর্ম। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগধারা যেখানে ক্ষীণ হয়ে যায় সেখানে নিয়ম এসে মানুষের জীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। সুকঠোর নিয়মের রাজত্বে কোন কিছু নির্মাণ করা হয়ত সহজ কিন্তু সৃষ্টি সম্ভব নয়। মানুষ তো যান্ত্রিক জীব নয় যে তাকে গড়েপিটে ইচ্ছামত তৈরী করা যায়। তার মধ্যে রয়েছে একটি সজীব মন যে মনের অবাধ বিকাশের জন্যে প্রয়োজন একটি উন্মুক্ত পরিবেশ। শান্তিনিকেতনে সে বহুমনের বিকাশের জন্যে কবি তাই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তেমন একটি পরিবেশ। 'ভবিষ্যতে প্রাণহীন দলীয় নিয়মজালের জটিলতা এ আশ্রমের মূল তত্ত্বকে একেবারে যাতে বিলুপ্ত করে' না দেয়—এই ছিল কবির শেষ আকাঙ্ক্ষা।

কবির এ শেষ আকাঙ্ক্ষাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার দায়িত্ব তাঁর মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী—স্বদেশবাসীর। সে গুরু দায়িত্ব আমরা যথাযথ ভাবে পালন করতে পারছি কিনা আত্মবীক্ষার সাহায্যে তা আমাদের নিরূপণ করবার দিন এসেছে।

শেষ বিদায়ের আলোকে মানুষের প্রতি তাঁর দৃষ্টির অভ্রান্ততাকেও একবার পরখ করে নিলেন কবি। জীবনের প্রারম্ভে কোন অহেতুক দৈবী শক্তির প্রেরণায় যেন তিনি সমস্ত মানব সম্পর্ককে দেখেছিলেন 'আত্মার জ্যোতিতে দীপ্তিমান'। 'প্রাত্যহিক জীবনের মলিনতা' এসে তাঁর সে সত্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করলেও তিনি আশা করেছিলেন পৃথিবী থেকে শেষ বিদায়ের পূর্বে 'একদিন নিখিল মানবকে সেই

এক আত্মার আলোকে প্রদীপ্ত রূপে প্রত্যক্ষ দেখে যেতে' পারবেন। কিন্তু স্বার্থান্ধ মানুষের নির্মম হানাহানির আঘাতে মানব সম্বন্ধের প্রতি তাঁর সে উজ্জ্বল দৃষ্টি ক্রমশঃ কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এটাই হল রবীন্দ্রমনের সব চাইতে বড় ট্র্যাজেডি—যে ট্র্যাজেডির অন্তরবিদীর্ণ সুর রূপ পেয়েছে 'সভ্যতার সংকটে' এবং জীবন-গোধূলির বেদনা ভারাক্রান্ত বহু কাব্য কবিতায়।

এত ব্যর্থতার বেদনার মধ্যেও আশাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ আশা করেছেন আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের মনে হয়তো একদিন শুভবুদ্ধি জাগ্রত হবে। প্রাণের আকর্ষণে মানুষের মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের মিলন হবে একদিন সার্থক। শান্তিনিকেতনের উদার প্রাঙ্গনে মানুষের 'বুদ্ধির সঙ্গে শুভ বুদ্ধির নিষ্কাম সাধনায় সম্মিলিত' করবার যে অক্লান্ত প্রয়াস পরিণতজীবনে তিনি করে গেছেন তা একদিন সফল হবে।

রবীন্দ্রনাথের এ শেষ আকাঙ্খার ভিতর তাঁর জীবন-ব্যাপী সাধনা যেন বাঙ্ময় বাণীরূপ পেয়েছে। এখানেই তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন সর্বকালের ও সর্বদেশের মহামানবদের সঙ্গে। ব্যর্থতায় বেদনায় সমগ্র বিশ্বব্যাপী ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কবি যে বলিষ্ঠ আশার বাণী উচ্চারণ করেছেন সে অনশ্বর বাণীই হল তাঁর বিশাল মনের ও জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

ইতিহাস জিজ্ঞাসা ও স্বদেশ-ভাবনা

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত রূপস্রষ্টা কবি। তথাপি স্বদেশ ভাবনায় তিনি যে অনন্যতার পরিচয় দিয়েছেন এ দেশে তার তুলনা খুবই কম। দু' পর্যায়ের রচনায় তাঁর স্বদেশভাবনা উদ্দীপ্ত রূপ পেয়েছে। কাব্য কবিতায় সঙ্গীতে এবং কোন কোন গদ্য প্রবন্ধে কবির স্বদেশচেতনা আবেগোচ্ছল। কিন্তু ইতিহাস জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ যে সুগভীর স্বদেশ-ভাবনায় পরিচয় দিয়েছেন তা অনেক প্রথমশ্রেণীর ঐতিহাসিকের ইতিহাস-সাফল্যকে ম্লান করে দেয়।

মননশীল রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-জিজ্ঞাসা কোন সাময়িক আবেগ-প্রসূত ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র নয়। স্বদেশপ্রেমের গভীর মর্মমূল থেকে তা ছিল স্বতঃ উৎসারিত। বঙ্গভঙ্গের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে স্বদেশ-প্রেমের যে উদ্দাম প্রবাহ সমস্ত জাতির চিত্তকে আলোড়িত করেছিল তার আগেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয় মনকে প্রত্যয়শীল ও স্বদেশাভিমুখী করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন ভারতবর্ষেরই প্রকৃত ইতিহাস-চর্চার সাহায্যে। ১৮৯৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর কাল কবি তাঁর অবিস্মণীয় শিল্পসৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে স্বদেশের সত্য ইতিহাস আবিষ্কারের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন।

কবির বয়স যখন সাঁইত্রিশ বৎসর তখন ভারতী পত্রিকায় তাঁর ইতিহাস-কৌতূহল সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় (১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে)। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তখন কোন কোন বিষয়ে বাংলার ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য উদঘাটনে ব্যাপৃত ছিলেন। সে সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চর্চার শুরু। তারপর তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনেও

তিনি ভারতেতিহাস চর্চার কথা ভোলেন নি। বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, বালক, ভারতী, ঐতিহাসিক চিত্র, ভাণ্ডার, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি সাময়িক পত্রকে তিনি সমৃদ্ধ করে তোলেন স্বীয় গবেষণালব্ধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথের ভারতেতিহাসের মৌলিক ব্যাখ্যা আচার্য যদুনাথ সরকারের মত প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি কবি কর্তৃক ১৩১৮ সালে (১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে) ওভারটুন হলে পঠিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে (My Interpretation of Indian History) ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মডার্ন্ রিভ্যু পত্রিকায় দুই সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এ অনুবাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মণীষী রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান 'রচনাটির প্রতি বৃহত্তর পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ' করা। এ প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-জিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এ রচনাটি কোন কোন মহলে যে বিতর্কের ঝড় তুলেছিল তা থামতে বেশ কিছুকাল সময় লেগেছিল। এ রচনার গঠনমূলক সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রজ্ঞাবান দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১৯ বঙ্গাব্দের প্রবাসী পত্রিকায়। সে রচনায় ভারতেতিহাসের কতগুলি নতুন ব্যাখ্যার প্রতি তিনি মণীষী ভ্রাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কোন কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করে বিষয়টি পুনরালোচনা করেন *A Vision of Indian History* নামক প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধটি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় Visva-Bharati Quarterly পত্রিকায়। বিশ্বভারতী এ প্রবন্ধটিকে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। সম্প্রতি ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের এ অমূল্য পুস্তিকাটির পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। যে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অবজ্ঞামিশ্রিত অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করেছেন তাঁদের মতামত যে মূল্যহীন—এ সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছিল যেমন এ প্রবন্ধ রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য তেমনি বর্তমান

আত্মপ্রত্যয়হীন স্বদেশবাসীর চিত্তকে স্বদেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলাও ছিল এখানে রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-জিজ্ঞাসাত্মক বাংলা প্রবন্ধগুলি শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত হয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হয়েছে 'ইতিহাস'। 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-জিজ্ঞাসা' নামকরণ করলে বোধ হয় আরো সঙ্গত হত। এ গ্রন্থখানি প্রকাশ করে রবীন্দ্র-পথিক দুজন সংকলক রবীন্দ্র-চর্চার একটি বিশিষ্ট দিককে বাধামুক্ত করেছেন। এজন্যে তাঁরা দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ।

১২৮৪ থেকে ১২৯২ বঙ্গাব্দ (১৮৭৭ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত বালক ও ভারতীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি ইতিহাস-জিজ্ঞাসার দিক থেকে খুব মূল্যবান নয়। এর কারণ এ প্রবন্ধগুলি লিখিত হয়েছিল মুখ্যত অপরিণত বালক-বালিকাদের উদ্দেশ্যে। কবির ইতিহাস-জিজ্ঞাসা সর্বপ্রথম জাগ্রত হয় ভারতী পত্রিকার আশ্রয়ে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। ১৩০৫ সনের (১৮৯৮) বৈশাখ সংখ্যার ভারতীতে তৎকালীন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' নামক নাতিদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সে প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইতিহাস-ধারণার পরিচয় দেন। ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণের উপায় হিসেবে বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মানব-মনের মিশ্রণের উপর তিনি এ প্রবন্ধে জোর দেন। তিনি মনে করেন বিজাতীয় সংস্কার নিয়ে কোন দেশের সত্য ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত-মনের উদ্যমহীনতার সুযোগ নিয়ে যে সমস্ত বিদেশী ঐতিহাসিক ভারতেতিহাসের রূপ দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের দৃষ্টি ছিল বিজাতীয় সংস্কারে মোহাচ্ছন্ন। ভারতবর্ষের মত একটা বিরাট দেশ

এবং সুপ্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংস্কারমুক্ত মন এবং 'স্বজাতীয় প্রকৃতির সৃজনকর্তৃত্ব' :

> ইতিহাসে এই প্রকার ব্যক্তিগত সংস্কারের লীলা যখন অবশ্যম্ভাবী তখন এই কথা সহজেই মনে উদয় হয়, আমরা ক্রমাগত বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা গঠিত ইতিহাস-পাঠের পীড়ন কেন সহ্য করিব? আমরা যে ইতিহাস সংকলন করিব তাহাও যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে এ আশা করি না, কিন্তু ইতিহাসের যে অংশ প্রমাণ অপেক্ষা ঐতিহাসিকের মানস-প্রকৃতির উপর বেশি নির্ভর করে সে অংশে আমাদের স্বজাতীয় প্রকৃতির সৃজনকর্তৃত্ব আমরা দেখিতে চাই।

স্বদেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনার উদ্যমে রবীন্দ্রনাথ এখানে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন তাঁর পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে। দুজন মণীষীর মনই তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল বিজাতীয় সংস্কারাপন্ন বিদেশী ঐতিহাসিকের দুষ্ট প্রভাব থেকে স্বদেশের ইতিহাসকে গ্লানিমুক্ত করার দিকে।

স্বদেশের ইতিহাস রচনার এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যখন 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক একখানি গবেষণাত্মক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ করলেন তখন রবীন্দ্রনাথের আনন্দের সীমা রইল না। ১৩০৫ ভাদ্র সংখ্যার ভারতীতে (১৮৯৮) 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে তিনি সম্পাদক অক্ষয়কুমারকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করলেন। সে প্রবন্ধে তিনি লিখলেন: 'ঐতিহাসিক চিত্র ভারত-ইতিহাসের বন্ধনমোচন-জন্য ধর্মযুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত।'

ইতিহাস রচনার লক্ষ্য বর্ণনায় তিনি যে অভিমত ব্যক্ত

করলেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রদীপ্ত স্বদেশপ্রেম সংযত ভাষায় আত্মপ্রকাশ করল :

> আসল কথা এই যে, জীবের ধর্ম যেমন বর্তমানে জীবনরক্ষা এবং ভবিষ্যতে বংশানুক্রমে আপনাকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা তেমনি বহু-সংখ্যক বিচ্ছিন্ন লোককে কোনো একটি বিশেষ মত বা ভাব বা ধারাবাহিক স্মৃতিপরম্পরা এক জীবন দিয়া এক জীব করিয়া তোলে তখন সে বহিঃশত্রুর আক্রমনে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে এবং ভবিষ্যৎ-অভিমুখে আপন ব্যক্তিত্ব, আপন সম্প্রদায়গত ঐক্যকে প্রেরণ করিবার জন্য যত্নবান হইয়া উঠে। ইতিহাস তাহার অন্যতম উপায়।

স্বদেশের শিক্ষিত-সাধারণের ইতিহাস-বিমুখতা দেখে স্বজাতিপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র যে অন্তর্বিদীর্ণ নৈরাশ্য অনুভব করেছিলেন সে যুগ তখন বিগত হয়েছে। জাতীয় মনে ধীরে ধীরে স্বদেশের ইতিহাস রচনার জন্য যে প্রবল আগ্রহ জাগ্রত হয়ে উঠেছে তা দেখে স্বদেশ-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের মন নতুন আশার আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। নবজাগ্রত এ সাজাত্যবোধকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে নাম দিলেন 'ইতিহাস-ক্ষুধা'। তিনি অনুভব করলেন জাতীয় মনে এ ইতিহাস-বুভুক্ষার উৎসে আছে কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলন। এ ইতিহাস-বুভুক্ষা জাতীয় মনে অঙ্কুর রূপে দেখা দিলেও অনুকূল পরিবেশে একদিন তা মহামহীরুহরূপে আত্মপ্রকাশ করে জাতীয় জীবনকে যে অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পৌঁছিয়ে দেবে এ সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ রইল না।

'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-জিজ্ঞাসার অঙ্কুর —যে অঙ্কুর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৃহত্তর স্বদেশ-জিজ্ঞাসা নিয়ে রবীন্দ্রমনে পল্লবিত শাখায়িত হয়ে উঠেছিল। স্বদেশ-ইতিহাসের যে ভাবরূপ মণীষী রবীন্দ্রনাথকে পরবর্তীকালে ভারতেতিহাসের

একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে সহায়তা করেছিল তার সর্বপ্রথম সূত্রাকার উপস্থাপনা দেখি এ 'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রবন্ধে :

> এখন আমরা বোম্বাই মাদ্রাজ পাঞ্জাবকে যেমন নিকটে পাইতে চাই তেমনি অতীত ভারতবর্ষকেও প্রত্যক্ষ করিতে চাহি। নিজের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া এক্ষণে আমরা দেশে এবং কালে এক রূপে এবং বিরাট রূপে আপনাকে উপলব্ধি করতে উৎসুক। এখন আমরা মোগল রাজত্বের মধ্য দিয়া, পাঠান রাজত্ব ভেদ করিয়া, সেনবংশ পালবংশ গুপ্তবংশের জটিল অরণ্যমধ্যে পথ করিয়া, পৌরাণিক কাল হইতে বৌদ্ধকাল এবং বৌদ্ধকাল হইতে বৈদিক কাল পর্যন্ত অখণ্ড আপনার সন্ধানে বাহির হইয়াছি।

মোগল-পাঠান যুগের সঙ্গে আমাদের যুগের কালের দূরত্ব খুব বেশী নয়। সে যুগের ইতিহাস রচনার উপকরণও খুব দুর্লভ নয়। সেজন্যে সে যুগের ভারতেতিহাস রচনা হয়ত ঐতিহাসিকদের নিকট খুব একটা বড় বাধা বলে বিবেচিত হবে না। কিন্তু বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে সুদীর্ঘ ইতিবৃত্ত তা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে ইতিহাসের প্রত্যক্ষ উপকরণও নেই। বেদ উপনিষদ্ পুরাণাদির মধ্য দিয়ে সে দীর্ঘকালের ইতিহাস আজ আমাদের কাছে ভাবরূপে বর্তমান। সে জটিল গহন অরণ্য থেকে প্রাচীন ভারতেতিহাসের মর্মসত্যকে আজ উদ্‌ঘাটিত করা প্রয়োজন। এ প্রয়াসে ভারতের গৌরবদীপ্তি যেমন প্রকাশিত হবে তেমনি অগৌরবের কলঙ্কও উন্মোচিত হতে পারে। অতীতের সে দীর্ঘবিসর্পিত ইতিহাসের পথ বড় দুর্গম। ইতিহাস-জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ বলেন একমাত্র জাগ্রত স্বদেশপ্রেমই জাতীয় শিক্ষিত মনকে সে দুর্গম পথে আকর্ষণ করতে পারে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস-জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথের অন্তর্স্পর্শী স্বদেশপ্রেম এখানে অতিপ্রত্যক্ষ।

ভারতেতিহাসের সঙ্গে য়ুরোপীয় ইতিহাসের পার্থক্য কোথায়,

ভারতেতিহাসের মর্মগত সত্য কি তারও প্রাথমিক আভাস দিলেন রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে। সে সত্যের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করা মানেই হল ভারতের জীবনাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হওয়া—যে আদর্শ 'সকল পরাভব ও অবমাননার উর্দ্ধে আপন উচ্চশির অম্লান রাখিতে পারিয়াছে'। হিংসা ও লোভপ্রবৃত্তির উন্মাদ উত্তেজনার লালন ও প্রসারকে যেখানে পাশ্চাত্ত্য জাতি জীবনের অন্যতম ধর্ম বলে জানে ও মানে, ভারতীয় জাতি সেখানে সুকঠোর আত্মসংযমের সঙ্গে প্রবৃত্তির দমনকেই জীবনের মহত্তম আদর্শ বলে চিরদিন মেনে নিয়েছে। এ জন্যে য়ুরোপ দেশে বিদেশে যে কোন উপায়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করে ঐশ্বর্যদম্ভে স্ফীত হয়েছে আর ভারতবর্ষ প্রবৃত্তি দমন করে শত্রুহস্তে আত্মবিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

মণীষী রবীন্দ্রনাথ মনে করেন জীবনাদর্শের এ পর্বতপ্রমাণ পার্থক্যের জন্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে য়ুরোপের ইতিহাসের একটি প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকা অবশ্যম্ভাবী। লাভ ও লোভের প্রতি ভারতবাসীর কোনদিন আসক্তি ছিল না বলে ভারতবাসী রাজ্যলোলুপ বিদেশীর নিকট বারে বারে পরাজয় বরণ করেছে এ কথা সত্য কিন্তু জীবনাসক্তিকে পরম সত্য বলে স্বীকার করায় পররাজ্যলুব্ধ য়ুরোপ বর্তমান পৃথিবীতে যে রক্তযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে চলেছে মানবসভ্যতার ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। এ অবস্থায় ভারতীয় জীবনাদর্শের তুলনায় য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে বড় মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকেরা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেছেন য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে। এবং যেহেতু তাঁরা ভারতীয় জীবনে সে আদর্শের অনুস্মৃতি দেখেননি সেহেতু ভারতীয় জীবনকে মসীবর্ণে চিত্রিত করেছেন। ভারতবাসীও বহুকাল যাবৎ বিদেশীর চোখে স্বদেশকে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। স্বার্থান্বেষী বিদেশীর দৃষ্টিতে স্বদেশ-দর্শনের অবশ্যম্ভাবী

পরিণতি হল ভারতবাসীর মনে আত্মপ্রত্যয়হীনতার সৃষ্টি। সত্যসন্ধ রবীন্দ্রনাথ 'কল্পনা ও সহানুভূতি'র সাহায্যে ভারতেতিহাসের মর্মগত সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে স্বদেশের প্রতি প্রীতিশীল দেশবাসীকে আহ্বান করলেন। তিনি বললেন বিস্মৃত ইতিহাসের পুনর্গঠনে শুধুমাত্র সংগ্রহ কার্যটা যথেষ্ট নয়, তার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ঐতিহাসিকের সৃজনী শক্তি। স্বদেশের ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য পরের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ রূপদানের ভার নিতে হবে স্বদেশবাসীকে। এতে হয়ত স্বদেশের ইতিহাস কিছুটা পক্ষপাত-দোষদুষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বিদেশী ঐতিহাসিকের পরজাতি-বিদ্বেষ ও সহানুভূতির অভাবে ভারতীয় ইতিহাস যেভাবে বিকৃত হয়ে উঠেছে তার থেকে ভারতীয় লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস একটু পক্ষপাতদুষ্ট হলেও ঢের বেশী মূল্যসমৃদ্ধ হবে।

স্বাধীনভাবে কাজ করতে গেলে ভুল দোষ ত্রুটির সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভুলের মধ্য দিয়েই মানুষ সত্যপথে উত্তীর্ণ হতে পারে। তাঁর প্রিয় স্বদেশবাসী স্বাধীনভাবে নিজ দেশের প্রকৃত ইতিহাস সংকলন কার্যে ব্রতী হয়েছেন দেখে স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ সেদিন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। নিম্নোধৃত প্রবন্ধাংশে তাঁর আনন্দ ও আত্মপ্রত্যয় একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে :

> আমাদের ইতিহাসকে আমরা পরের হাত হইতে উদ্ধার করিব, আমাদের ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখিব, সেই আনন্দের দিন আসিয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গকে লেথব্রিজ সাহেবের চটির মধ্য হইতে বাহির করিয়া ইতিহাসের উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিব; এখানে তাঁহারা নিজের চেষ্টায় সত্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি ভ্রমও সংগ্রহ করেন সেও আমাদের পক্ষে পর-লিখিত পরীক্ষা পুস্তকের মুখস্থ বিদ্যা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেয়, কারণ,

সেই স্বাধীন চেষ্টার উদ্যম আর একদিন সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবে। কিন্তু পরদত্ত চোখের ঠুলি চিরদিন বাঁধা রাস্তায় ঘুরিবার যতই উপযোগী হউক, পরীক্ষার ঘানিবৃক্ষের তৈলনিষ্কাশনকল্পে যতই প্রয়োজনীয় হউক, নূতন সত্য অর্জন ও পুরাতন ভ্রম বিবর্জনের পক্ষে অপরিহার্য।

'ঐতিহাসিক চিত্রে'র সূচনা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ রচনা করেন তা প্রকাশিত হয়েছিল জানুয়ারী ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের 'ঐতিহাসিক চিত্রে'। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-ধারণা আরও বিস্তৃতি লাভ করে। স্বদেশের ইতিহাস-রচনার উদ্যমকে তিনি সে প্রবন্ধে এই বলে অভিনন্দিত করেন ঃ

স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে, সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য—আমাদের প্রাণ…'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক একটা প্রকাণ্ড রুদ্ধ বাতায়ন রহস্যাবৃত হর্ম্যশ্রেণীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

ঐতিহাসিক সত্যের স্বরূপ-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেন তার যৌক্তিকতাও অস্বীকার করা যায় না ঃ

যাহা তথ্য-হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাসরূপে প্রচলিত,তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায়। কারণ, ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস।

শুধুমাত্র তথ্যনির্ভরতাকে যাঁরা ইতিহাস রচনায় প্রাধান্য দেন তাঁরা হয়ত এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হবেন না। ভারতবাসীর অন্তঃপ্রকৃতি য়ুরোপীয় জাতির প্রকৃতি থেকে পৃথক বলে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার প্রণালী পাশ্চাত্ত্য ইতিহাস থেকে যে পৃথক হতে বাধ্য—এ কথা রবীন্দ্রনাথ পরে আরও বিস্তৃত করে বলেন।

স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে এ সময় সব চাইতে বেশী পীড়িত করেছিল স্বদেশের প্রকৃত ইতিহাসের অভাবজনিত জাতির আত্মপরিচয়হীনতার গ্লানি। সেজন্যে উপযুক্ত উপকরণের অভাবে স্বদেশীয় ঐতিহাসিকের হাতে ভারতের ইতিহাস রচনা-প্রয়াস অসম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা জেনেও তিনি সে প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান এভাবে :

> এখনো ইহার মূলধন বেশি যোগাড় হয় নাই, ইহার কল-বলও স্বল্প হইতে পারে, ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও প্রথম কিছু মোটা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা দেশের যে গভীর দৈন্য—যে মহৎ অভাব মোচনের আশা করা যায় তাহা বিলাতের বস্তা বস্তা সূক্ষ্ম ও সুনির্মিত পণ্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে।

আত্মপ্রত্যয়হীন স্বদেশবাসীকে ইতিহাস-চর্চার মাধ্যমে আত্মপ্রত্যয়ান্বিত করবার প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথ এখানে মণীষী বঙ্কিমের সমধর্মী।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ অগ্রসর হলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের মর্মব্যাখ্যায় ভাদ্র ১৩০৯ (১৯০২) সনের বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে তিনি ইংরেজ লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তুলনা করলেন নিশীথ রাত্রির দুঃস্বপ্নের সঙ্গে। এর কারণ সে ইতিহাসে ভারতবাসীর বিচিত্র আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যমের পরিচয় নেই, অভীপ্সা ও বেদনার বাণী নেই—আছে কেবল রাজা রাজড়াদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কথা। এর ফলে 'দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যগর্বোদ্গার-কাল পর্যন্ত যে কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা, তাহা স্বদেশসম্পর্কে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র' (ভারতবর্ষের ইতিহাস)।

ভারতীয় ইতিহাসের প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন

সকল দেশের ইতিহাস সমানধর্মী হবে—এ রকম ধারণা ঐতিহাসিকের পক্ষে একটা প্রবল কুসংস্কার। দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা এরূপ কুসংস্কারছন্ন হয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। সেজন্যে ইংরেজ-রচিত ভারতের ইতিহাস ইতিহাসধর্ম বর্জিত হয়ে চরম বিকৃতি লাভ করেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধে বলেন: 'ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দপ্তর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স্ নাই সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান, এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না'।

আসলে ভারতের ইতিহাসের প্রকৃত পরিচয় নিহিত আছে ভারতবর্ষের জীবনাদর্শের মধ্যে। নানা প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, নানা পথকে এক লক্ষ্যাভিমুখী করিয়া তোলা এবং মানুষের আপাত পার্থক্যকে স্বীকার করেও মানুষের মধ্যে মিলনের নিগূঢ় যোগকে উপলব্ধি করাই হল ভারতীয় জীবনের প্রধান আদর্শ। এ ঐক্যবোধের মহান আদর্শ ভারতীয় মনকে যুগে যুগে আকর্ষণ করেছে। বলে ভারতবাসী পাশ্চাত্ত্যের মত রাষ্ট্রগৌরব লাভের জন্যে কখনও লোলুপ হয়নি। পাশ্চাত্ত্য জীবনেও যে ঐক্যের আদর্শ নেই তা নয়। কিন্তু সে ঐক্য পোলিটিক্যাল। বিরোধী পক্ষকে ছলে বলে কৌশলে পরাভূত করে স্বমতের বশীভূত করাই হল য়ুরোপীয় দেশে মিলনের ভিত্তি। সেজন্য য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতিও হল বিরোধমূলক। ভারতীয় মন যেখানে মানুষে মানুষে মিলনকে প্রধান বলে জানে য়ুরোপীয় মন সেখানে বিরোধকেই সত্য বলে মানে। পাশ্চাত্ত্য জীবনে এ বিরোধ-প্রবৃত্তি শুধুমাত্র নিজের দেশের সীমায় সীমাবদ্ধ থেকে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বকে চিরকালীন করে রাখেনি—সে দ্বন্দ্বকে

বিশ্বব্যাপী প্রসারিত করে বহু জাতির জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। এ অবস্থায় এ উভয় ভূখণ্ডের সভ্যতা-সংস্কৃতি যে পৃথক হবে তাতে সন্দেহ কী?

এখন প্রশ্ন ওঠে কোন সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হবে? যে সভ্যতা বিরোধকে সমগ্র বিশ্বে জাগ্রত করে রাখছে সে সভ্যতাকে, না যে সভ্যতা বিভিন্ন মানুষকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধতে চায় সে সভ্যতাকে?

কোন বিবেকবান ব্যক্তিকে এর উত্তর বলে দিতে হয় না; ভারতবর্ষে এ ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা শুধু সমাজব্যবস্থায় নয়—ধর্মনীতিতেও অতিপ্রত্যক্ষ। জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে একটি অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াসই হল ভারতবাসীর চিরকালীন আদর্শ। 'এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধাবিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে (ভারতবর্ষের ইতিহাস)।'

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ভারতের ইতিহাস রচনায় আমাদের ঐতিহাসিকের লক্ষ্য হওয়া উচিত ভারতবর্ষের সে চিরন্তন ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা। যে উজ্জ্বল ভাবের আলো অতীত যুগে ভারতবাসীকে জীবনের মহান পথের সন্ধান দিয়েছিল বর্তমান ঐতিহাসিক যদি ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা-প্রয়াসে সে ভাবানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন তাহলেই 'আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে'।

এভাবে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাসের মূলসূত্র নির্দেশ করলেন রবীন্দ্রনাথ। সে ইতিহাস রচনার জন্য ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর না করে তিনি নিজেও স্বদেশীয় ইতিহাসের পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এ চিন্তার ফসল ১৩১৮ সালে ৩রা চৈত্র (১৯১১) ওভারটুন হলে পঠিত

'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধটি পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯১২ সালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধ এবং ইহার আনুষঙ্গিক ইংরেজী রচনা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *A Vision of Indian History*—ভারত-ইতিহাস-জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্র-মণীষার প্রদীপ্ত স্বাক্ষর—এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

ভারতেতিহাসের বিস্মৃত অতীত যুগের মর্মসত্য নির্ধারণে মণীষী রবীন্দ্রনাথ বহুব্যাপ্ত কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কল্পনা যুক্তিকে অতিক্রম করে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশে পর্যবসিত হয়নি কোথাও। সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে লক্ষ্য করেছেন তিনি রঙ্গমঞ্চে বহু অঙ্কে অভিনীত একটি বাস্তব জীবননাট্যের মত। সে জীবননাট্যের প্রথম অঙ্কের শুরু হয়েছিল আর্য-অনার্যের একটি প্রবল সংঘাতের মধ্য দিয়ে।

এ সংঘাতের ফলে বিভিন্ন কালে ভারতাগত বিচ্ছিন্ন আর্যজাতির মনে অনার্যদের প্রতি যে বিদ্বেষবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল সে বিদ্বেষই অবশেষে তাদের সংহত হবার অবকাশ দিল। ভারতে আর্য আক্রমণের প্রথম যুগে প্রচণ্ড বিরোধ-বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়া রূপে আর্যরা যদি সংহত এবং শক্তিমান হয়ে না উঠতেন তা হলে ভারতবর্ষে আর্য উপনিবেশ যে দীর্ঘস্থায়ী হত না—এ অনুমান অহেতুক নয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিরোধের নয়—মিলনের। এরূপ অনুমানের প্রধান কারণ এই যে আর্য-অনার্য বিরোধে যে সমস্ত আর্য বীর নেতৃত্ব করেছিলেন তাঁদের কথা আমাদের প্রাচীন মহাকাব্যে সবিস্তারে সগৌরবে বর্ণিত হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ অনার্য নাগজাতির বিরুদ্ধে আর্য রাজা জন্মেজয়ের নিষ্ঠুর সর্পযজ্ঞের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। অনার্য জাতির বিরুদ্ধে এত বড় একটা অভিযানের নায়ক যিনি তাঁর জীবন ও

চারিত্র্য ভারতের পুরাণ-ইতিহাসে তেমন কোন বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করেনি।

আসলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ছিল মিলনমূলক। আর্য অনার্যের মিলন-প্রচেষ্টার মধ্যে পৌরাণিক যুগেই ভারতীয় ইতিহাস একটি মহিমান্বিত রূপ গ্রহণ করে। রামায়ণের যুগে দেখা যায় এ মিলন-প্রয়াসে সব চাইতে বেশী উদ্যমের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনজন ক্ষত্রিয় নেতা—জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। কালের বিচারে সমসাময়িক না হলেও ভাবাদর্শের দিক দিয়ে এঁরা যে অত্যন্ত নিকটবর্তী ছিলেন এঁদের লক্ষ্য বিচারেই তা প্রতীয়মান হয়। রামচন্দ্রকে জীবনের একটি বিশেষ লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করেছিলেন বিশ্বামিত্র এবং বিশ্বামিত্রের মনে মহান জীবনাদর্শ সঞ্চার করেছিলেন মহর্ষি জনক। বস্তুতপক্ষে জনক ও বিশ্বামিত্র মধ্যযুগের ইংরেজ রাজা আর্থারের মত 'আর্য-ইতিহাস-গত একটি ভাবের রূপক হইয়া উঠিয়াছিল'। এ দুজন ক্ষত্রিয় নেতা তৎকালীন ভারতীয় জীবনে একটি উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে দীর্ঘব্যাপী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন।

পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য ও অভিপ্রায়ের পার্থক্য বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন প্রাচীন ভারতের ভাবগত ইতিহাস সংকলনের দিক থেকে তার মূল্য অপরিসীম। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণপ্রক্রিয়ার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ এ সত্য প্রমাণ করেছেন, পৌরাণিক যুগে মুখ্যত রক্ষণশীলতাই ছিল যেখানে ব্রাহ্মণের জীবনধর্ম সেখানে একটি উদার উন্মুক্ত মানবিক জীবনাদর্শের অনুসন্ধানই ছিল ক্ষত্রিয়ের প্রধান জীবনপ্রয়াস। ব্রাহ্মণদের রক্ষণশীলতার মূলে ছিল ক্রিয়াকাণ্ডপ্রধান বৈদিক আর্য সংস্কৃতিকে অবিকৃত ও সম্প্রসারিত করবার চেষ্টা। অপরপক্ষে ক্ষত্রিয়মনে সচলতা ও উদারতার সঞ্চার করেছিল 'সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও মানুষিক বাধার সঙ্গে' অবিরত সংগ্রামপ্রবৃত্তি।

সে যুগের ক্ষত্রিয় 'মানবের বন্ধুর দুর্গম জীবনক্ষেত্রে নব নব ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে মানুষ' বলে প্রথামূলক বাহ্যানুষ্ঠানগত ভেদের বোধটা ক্ষত্রিয়ের মনে তেমন সুদৃঢ় হয়ে উঠতে পারেনি। আত্মরক্ষা ও উপনিবেশ বিস্তারে ব্রতী হয়ে নানা বিরোধ-বিক্ষোভের মধ্যে তাঁরা জীবনের যে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সে অভিজ্ঞতাই একদিন তাঁদের মনকে বৃহৎ সত্যবোধমূলক পরম ঐক্যের অভিমুখী করে তুলল। জীবনের বৃহত্তর সত্যবোধের প্রেরণায় সেদিনকার উদার ক্ষত্রিয় জাতি বিভিন্ন বেদকে অপরা বিদ্যা বলে, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম যাগযজ্ঞকে সবলে অস্বীকার করে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। এ কারণেই ব্রহ্মবিদ্যার অপর নাম হয়েছিল রাজবিদ্যা। প্রগতিশীল ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের বিরোধ প্রাচীন ভারতেতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

সে যুগের সমাজাদর্শের এ প্রভেদ সুস্পষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল দুইজন দেবতার মধ্যে। 'প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্যদলের দেবতা বিষ্ণু। ব্রহ্মার চারি মুখ চারি বেদ—তাহা চিরকালের মতো ধ্যানরত স্থির; আর বিষ্ণুর চারি ক্রিয়াশীল হস্ত কেবলই নব নব ক্ষেত্রে মঙ্গলকে ঘোষিত করিতেছে, শাসনকে প্রচারিত করিতেছে এবং সৌন্দর্যকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে'।

সমাজাদর্শের পার্থক্য বর্ণনায় সুপ্রাচীন যুগের দেবতা পরিকল্পনার এ প্রতীকী ব্যাখ্যাও রবীন্দ্রনাথের প্রদীপ্ত যুক্তিধর্মী মনের স্বাক্ষর বহন করছে।

বৈদিক দেবতা ভয়ের দেবতা শাসনের দেবতা। সে দেবতাকে পূজো করা চলে কিন্তু অন্তরতম দেবতারূপে ভক্তির অর্ঘ্য সাজিয়ে ভালবাসতে ভয় হয়। সেজন্যে প্রাচীন ভারতের ধর্মবিবর্তনের

ইতিহাসে ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিক রূপেই প্রেম-ভক্তি ধর্মের অভ্যুদয় হল। এ ভক্তি-ধর্মের দেবতাই হলেন বিষ্ণু।

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন যুগের ইতিহাস হল ধর্মসংঘাত ও ধর্মসমন্বয়ের ইতিহাস। প্রগতিশীল নবীন ক্ষত্রিয় সমাজের ধর্মদেবতা বিষ্ণুও সে যুগে প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন—বিষ্ণুর বক্ষে ব্রাহ্মণ ভৃগুর পদাঘাত-কাহিনীই তার প্রমাণ। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা সে ধর্মদ্বন্দ্ব-যুগের অবসানে বৈষ্ণবধর্মকে আপন বলে গ্রহণ করলেও বহুকাল পর্যন্ত এ উদার ধর্মমতের বিরোধিতা করতে দ্বিধা করেন নি।

বৈষ্ণবধর্ম ক্ষত্রিয় প্রবর্তিত—এ মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন এ ধর্মের অন্যতম গুরু এবং তিনি বৈদিক মন্ত্র ও আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এ ছাড়া ভারতীয় পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার রূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও রামচন্দ্রের আদর্শ জীবনের প্রভাবে এ ভক্তিধর্ম বহদূর ভূখণ্ডব্যাপী প্রসারলাভ করেছিল।

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র দ্বন্দ্বের কাহিনীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সংঘাতের পরিচয় আছে বলেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন। অবশ্য এ দ্বন্দ্বে অনেক ক্ষত্রিয় রাজাও ব্রাহ্মণের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন—যেমন হরিশ্চন্দ্র। আবার ক্ষত্রিয়-বিদ্বেষী ক্ষত্রিয় রাজাও ছিলেন—যেমন জরাসন্ধ। বস্তুতপক্ষে বেদবিরুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মগুরু শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তখন দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল। মহারাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করে এ দুই পরস্পর বিবদমান দলের মধ্যে ঐক্যসাধনের জন্য চেষ্টিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধ দলের মুখপাত্র শিশুপাল সে সময় শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করে যে বিষাদময় পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তা সকলেই জানেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনামুখে এ সমাজসংঘাত স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধপক্ষীয়

সেনাপতিগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি।

যে দৃষ্টির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় পুরাণের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়েছিলেন তাকে বলা চলে সমাজদৃষ্টি। এ দৃষ্টির সহায়তায় ভারতীয় মহাকাব্য দুটির ভিতর প্রাচীন সমাজবিপ্লবের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। তৎকালীন ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রাচীনপন্থীর সঙ্গে নবীনপন্থীর বিরোধের ফলেই এ সমাজবিপ্লব জেগে উঠে। রামায়ণে দেখা যায় ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ-বংশের মন্ত্রশিষ্য হয়েও রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র-নির্দিষ্ট পন্থানুসরণ করেছিলেন। ধর্মজীবনে রামচন্দ্রের এ দিক্ পরিবর্তন বৃদ্ধ রাজা দশরথের অনুমোদন লাভ করতে পারেনি বলেই রামচন্দ্রকে বনে যেতে হয়েছিল। আদর্শ-সংঘাতের দিক দিয়ে এরূপ সম্ভাবনাকেই রবীন্দ্রনাথের নিকট ঐতিহাসিক ভাবসত্য বলে মনে হয়েছিল। বৃদ্ধ রাজার স্ত্রৈনতার ফলেই রামচন্দ্রকে বনে যেতে হয়েছিল—এ কাহিনী পরবর্তী কোন কবির যোজনা বলেই ইতিহাস-জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস।

ক্ষত্রিয় রাজা রামচন্দ্র রামায়ণের যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ মীমাংসায় যে অগ্রণী হয়েছিলেন তার প্রমাণ হল দুর্ধর্ষ শত্রু পরশুরামকে নিরস্ত্র করেও তিনি তাঁকে বধ না করে ক্ষমা করেছিলেন। গুরু বিশ্বামিত্রের পরিচালনায় রামচন্দ্র তৎকালীন ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞ রাজা জনকের সান্নিধ্যে এসে তাঁর সঙ্গে পরম আত্মীয়তার সূত্রে বদ্ধ হন। রাজর্ষি জনক ছিলেন সে যুগের আর্যসভ্যতার প্রতীক। কৃষিকার্যের প্রসারের দ্বারা আর্যসভ্যতাকে সমস্ত ভারতব্যাপী বিস্তার করা ছিল তৎকালীন ক্ষত্রিয়দের প্রধান লক্ষ্য। মিথিলার রাজা জনকের কৃষিচর্চার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত আর্যসভ্যতার প্রভাব। তখন দাক্ষিনাত্যে ছিল দ্রাবিড় সভ্যতার একাধিপত্য। সংস্কৃতি-সংঘর্ষে দক্ষিণের অধিবাসীরা যে

বৈদিক আর্যদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে শিবোপাসক রাবণ কর্তৃক ইন্দ্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতার পরাজয়।

রাজর্ষি জনক একদিকে ব্রহ্মজ্ঞ আর একদিকে স্বহস্তে কৃষিকার্য করেন অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা ছিল এ ক্ষত্রিয় আর্যরাজার করায়ত্ত। এঁর সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে সম্পর্কিত হবার কিছু কাল পরই রামচন্দ্র আর্যদের কৃষিসভ্যতা ব্রহ্মবিদ্যাকে দাক্ষিণাত্যে বহন করে নিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথের মতে শিলীভূত অহল্যার পুনর্জীবনের কাহিনীও একটি রূপক। দাক্ষিণাত্যের যে ভূমি বহুকাল পাষাণের মত অনুর্বর হয়ে পড়ে ছিল রামচন্দ্র আপন কৃষিনৈপুণ্যের সাহায্যে সে ভূমিকে সজীব ও উর্বর করে তোলেন।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন রামচন্দ্রের জীবন পৌরাণিক যুগের ভারতধর্মের প্রতীক। সে উদার ধর্ম ব্রাহ্মণ-শূদ্র কাউকেও বর্জন করে নি। সকলকেই একটি মহৎ ঐক্যের সূত্রে প্রেমের স্বর্ণশৃঙ্খলে গ্রথিত করবার প্রয়াস পেয়েছিল সে মহান ধর্ম। মহাকবি বাল্মীকি সে ভারতস্বপ্নকে রূপ দিয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টিতে ঃ

> তিনি চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন। তিনি শত্রুকে ক্ষয় করিয়াছিলেন এ তাঁহার গৌরব নহে, তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি আচারের নিষেধকে, সামাজিক বিদ্বেষের বাধাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন ; তিনি আর্য-অনার্যের মধ্যে প্রীতির সেতু বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন।

এ সেতুবন্ধন সম্ভব হয়েছিল রাজনীতির সাহায্যে নয়—ভক্তিধর্মের সাহায্যে। রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে শুধু কৃষিস্থিতি মূলক সভ্যতা প্রচার করেন নি, ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদও প্রচার করেছিলেন। তাঁরই প্রভাবে দাক্ষিণাত্যের শৈবধর্ম ভক্তিধর্মে রূপান্তরিত হ'ল। পরবর্তিকালে দাক্ষিণাত্য থেকেই এক ধারায় ব্রহ্ম-বিদ্যার ভক্তিস্রোত রামানুজের মধ্য দিয়ে এবং আর এক ধারায়

অদ্বৈতজ্ঞান শঙ্করের জীবনসাধনায় প্রবলভাবে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র ভারতীয় জীবনে এক অভিনব বিস্তৃতি এনে দিয়েছিল।

আত্মরক্ষণ ও আত্মপ্রসারণ—এ দুই পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল থেকে নিজের ইতিহাসকে উদ্ভিন্ন করে তুলেছে। ভারতেতিহাসের এই-ই হল মর্মগত সত্য। ভারতবর্ষের এ দুই প্রবৃত্তি পরস্পরবিরোধী হলেও চিরদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করেনি। ব্রাহ্মণ আত্মরক্ষণ প্রবৃত্তির প্রভাবে প্রথমে আত্মসম্প্রসারণশীল ক্ষত্রিয়কে বাধা দিলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের মহৎ জীবনচেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। স্থিতি ও গতি এ দুয়ের সমন্বয়ে ভারতীয় ইতিহাস ইংরেজ জাতির ইতিহাসের মতই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

তাহলেও দেখা যায় এ আত্মসংরক্ষণ ও আত্মসম্প্রসারণের মধ্যে প্রথমোক্ত প্রবৃত্তিই ভারতেতিহাসে প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির আঘাতই হল এ আত্মরক্ষণশীলতার জয়যুক্ত হবার কারণ। 'ভারতর্ষে স্বভাবের নিয়মে আত্মরক্ষণীশক্তি আত্ম-প্রসারণী শক্তি অপেক্ষা বড়ো. হইয়া উঠিয়াছে,'—স্বদেশের ইতিহাস-স্বভাব বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এখানে স্বচ্ছ— সংস্কারমুক্ত।

মহাভারতের মধ্যে আর্য-অনার্য দেবতাকে কেন্দ্র করে ধর্মসংঘাতের বহু কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আর্য-অনার্যের রক্তের মিলনের সঙ্গে ধর্মের মিলনও যে না ঘটেছিল তা নয়। রক্তগত বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে পরবর্তিকালে কঠোর সামাজিক অনুশাসন প্রবর্তিত করেন মনু। এটা হ'ল সে যুগের সংকোচন প্রবৃত্তির পরিচায়ক। ভারতীয় মনের এ সংকোচন-প্রবৃত্তি কালক্রমে ভারতীয় জীবনকে পল্বলবদ্ধ জলাশয়ের মত স্থিতিশীল করে তুলল।

ব্রাহ্মণের স্থিতিশীল আত্মসংকোচনপ্রবৃত্তিরবিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সার্থক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ইতিহাসের যুগে ক্ষত্রিয়তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর। সংস্কারান্ধ সামাজিক নিয়মতান্ত্রিকতাকে অতিক্রম করে সংস্কারমুক্ত

ধর্মনীতির ভিত্তিতে তাঁরা ভারতব্যাপী যে আন্দোলন শুরু করেন তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিতে ভারতবাসীর দেরী হয়নি। ভারতেতিহাসের বিবর্তনের ধারায় দীর্ঘকাল পরে ক্ষত্রিয়-ধর্মাদর্শের ঔদার্য ব্রাহ্মণের সঙ্কীর্ণতার উপর জয়যুক্ত হল।

কিন্তু এ বহুব্যাপ্ত বৌদ্ধধর্মও ভারতীয় জীবনে স্থায়ী শিকড় গাড়তে সক্ষম হল না। এর কারণ নির্ণয়-প্রসঙ্গে মণীষী রবীন্দ্রনাথ যে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন ভারতবর্ষের ইতিহাস-জিজ্ঞাসায় তার মূল্য অপরিসীম। ভারতেতিহাসের ধারা অনুসরণে তিনি লক্ষ্য করেছেন পৌরাণিক যুগে আর্য-অনার্য সংঘাতের সময়ও উভয়ের মধ্যে একটি জাতিগত ঐক্য ছিল। জাতি গঠন কার্যের মহান দায়িত্ব ছিল আর্যদের হাতে। কিন্তু বৌদ্ধ প্রভাবের সময় শুধু ভারতবর্ষের ভিতরকার নয় ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও শক হুন প্রভৃতি অনার্যেরা এ দেশে এসে এমন শক্তি অর্জন করল যে তাতে ভারতীয় জীবনের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেল। যতদিন বৌদ্ধধর্মের সামর্থ্য ছিল ততদিন এ অসামঞ্জস্য খুব প্রবল আকারে দেখা দেয়নি। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের পতনের মুখে এ অসামঞ্জস্য প্রবল অসঙ্গতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে বহুকাল লালিত ভারতীয় সভ্যতার মহান গৌরবকে ধূলিসাৎ করে দিল।

এ বিনষ্টির যুগে সমগ্র ভারতবর্ষে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরাই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যশক্তি তখন আত্মআবিষ্কার এবং আত্মপ্রকাশের কার্যে মনোযোগী হলেন। পুরাতন আর্যসভ্যতার সার-সংগ্রহই হ'ল তখন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। বিচিত্র বিরুদ্ধ সম্প্রদায়কে সার্বভৌম ভারতীয় সংস্কৃতির ছত্রচ্ছয়ায় সমবেত করবার উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব লুপ্তপ্রায় বেদের সংকলন করলেন। শুধু তাই নয় প্রাচীন আর্য যুগের যে সমস্ত গৌরবময় জনশ্রুতি খণ্ড খণ্ড আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল সেগুলিও তিনি সংগ্রহ করলেন। 'শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও

চরিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্ত্তি একজায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত।'

রবীন্দ্রনাথের মতে মহাভারত হল সে যুগের আর্যজাতির ঐক্য উপলব্ধি-প্রয়াসের ফল মাত্র। এ মহাভারতের মধ্যেই আর্যদের যথার্থ ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। 'উহা ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত।' এ ইতিবৃত্ত রচনায় সংকলক আর্যজাতির জীবনের সুসঙ্গত বা পরস্পরবিরুদ্ধ কোন কিছুকেই বাদ দেন নি। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতকে আর্য-ইতিহাসের সত্যরূপ বলে বিশ্বাস করেন।

শুধুমাত্র বিরুদ্ধ প্রকৃতির সংঘাতটাই ভারতীয় ইতিহাসের চরম কথা নয়। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে বহুচিত্তের যে যোগ রবীন্দ্রনাথের মতে তাই হ'ল 'ভারত-ইতিহাসের চরমতত্ত্ব।' এ চরমতত্ত্বের ঘনীভূত রূপ হ'ল ভগবদ্ গীতা। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা এ গীতার ভিতর যত লজিকগত অসঙ্গতিই দেখুন না কেন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন এর মধ্যে "বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে'। গীতা মানুষের আত্মশক্তি উদ্বোধনের পরম সহায়ক। এ আত্মশক্তি উদ্বোধনের পথেই তো ক্রমে ক্রমে বিশ্বশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।

পাশ্চাত্ত্য ইতিহাস রচনার উপাদান মুখ্যত বস্তুগত। কিন্তু ভাবগত উপাদানকে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতেতিহাস রচনা সম্পূর্ণ হবে না। ব্যাসদেব-সমাহৃত ব্রহ্মসূত্রও তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি ভাবগত উপাদান। এ ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে ব্যাসদেব একদিকে ব্যষ্টি আর একদিকে সমষ্টির পরিচয়কে প্রত্যক্ষগোচর করে তুলেছেন। বেদান্তের মধ্যেও ভারতেতিহাসের সে ভাবগত উপাদান প্রচুরভাবে বিদ্যমান। দ্বৈত ও অদ্বৈত— এ উভয়ের উপলব্ধিতেই জীবন সম্পূর্ণতা লাভ করে। এ উভয়

লক্ষ্যের সত্য ব্যাখ্যা রূপ পেয়েছে বেদান্তে। নানা বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিকে সংযত রাখবার জন্য জীবনে অনুশাসনের প্রয়োজনও কম নয়। প্রাচীন আর্য জাতি সে অনুশাসনকেও বিধিবদ্ধ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের যুগে সে অনুশাসনগুলিও স্মৃতি গ্রন্থে সংগৃহীত হল।

পৌরাণিক যুগ বৌদ্ধ যুগ প্রভৃতি যুগবিভাগ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতেতিহাসের কালের প্রশ্নও তোলেননি। মহাভারতের যুগ এবং বৌদ্ধ যুগকে তিনি বলেছেন ভাবের যুগ এবং এ যুগগুলি ছিল প্রাচীন ভারতের বহু কালব্যাপ্ত। আর্যজাতি বহুকালের কাহিনীকে পুরাণকথার ভিতর সংগ্রহ করেছেন। সে যুগের প্রারম্ভ ও শেষ কোথায় জানবার উপায় নেই। শাক্যসিংহ থেকে গণনা শুরু করে বর্তমান ঐতিহাসিক বৌদ্ধ যুগের একটি প্রারম্ভ কাল নির্দেশ করেন বটে, কিন্তু গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও অন্য বুদ্ধ বারে বারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন—এ প্রশ্নের সম্মুখীন হলে সে গণনাও মিথ্যা হয়ে যায়। সে জন্যে পৌরাণিক ও বৌদ্ধ যুগের কাল সম্পর্কে অর্থহীন তর্কারণ্যে প্রবেশ না করে রবীন্দ্রনাথ এ দুটি যুগের নামকরণ করলেন—ভাবের যুগ।

প্রাচীন ভারতেতিহাসের ধারা অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ অনার্য সভ্যতার দানের পরিমাণ নির্ণয়েরও প্রয়াস পেয়েছেন। অনার্য দ্রাবিড়েরা আর্যদের মত তত্ত্বজ্ঞানী না হলেও কলানিপুণ ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা একটি বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়দের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্ভাবনী শক্তির সংমিশ্রণে। সভ্যতার এই যে বিচিত্র রূপ তা আর্যও নহে অনার্যও নহে—তা হিন্দু। আর্য-দ্রাবিড়ের সমন্বয়-প্রয়াসের একটি অত্যাশ্চর্য পরিণতি হল অনন্তকে সীমার মধ্যে, ভূমাকে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার মধ্যে উপলব্ধি। প্রাচীন ভারতবর্ষের বিচিত্র সৌন্দর্যসৃষ্টি এ আর্য-দ্রাবিড় সম্মেলনেরই শুভ ফল। কিন্তু আর্য সভ্যতার ভিতর

অনার্য সামগ্রীর অনধিকার প্রবেশও যে না ঘটেছিল তা নয়। এ অনুপ্রবেশ আর্য-সংস্কৃতিকে কলঙ্কিত করেছে।

এ আর্য-অনার্য সংস্কৃতি-সংমিশ্রণের ফলে দেবতা-পরিকল্পনায়ও অভিনবত্ব দেখা দিল। অনার্য দেবতা শিব বৈদিক রুদ্র নাম গ্রহণ করে আর্যদেবতার মত পূজিত হতে লাগলেন। 'এই রূপে ভারতবর্ষে সামাজিক মিলন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে রূপ গ্রহণ করিল। ব্রহ্মায় আর্যসমাজের আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্ন কাল এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল'। অনার্য দেবতা শিব আর্যদের দেবসমাজে উন্নীত হলেও অনার্য-চরিত্র থেকে একেবারে মুক্ত হলেন না। 'আর্যের দিকে তিনি যোগীশ্বর, কামকে ভস্ম করিয়া নির্বাণের আনন্দে নিমগ্ন, তাঁহার দিগ্‌বাস সন্ন্যাসীর ত্যাগের লক্ষণ; অনার্যের দিকে তিনি বীভৎস, রক্তাক্তগজাজীনধারী, গঞ্জিকা ও ভাঙ্‌-ধুতুরায় উন্মত্ত'।

আর্য-অনার্য সংস্কৃতি সংমিশ্রণ কৃষ্ণধারণায়ও পরিবর্তন নিয়ে এল। বৈষ্ণবদের হাতে মহাভারতের পৌরুষ-পাঞ্চজন্যধারী ধর্মসমন্বয়-কারী শ্রীকৃষ্ণ লীলাময় প্রেমধর্মের প্রতীকে পরিণত হলেন। অনার্য আভীর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৌন্দর্যের অলকাপুরী সৃষ্টি হল। আর্য সংস্পর্শে এসে অনার্য জাতির রূপকথা একটি গভীর আধ্যাত্মিক রূপ লাভ করল। 'এইখানে জ্ঞানের সহিত রসের, একের সহিত বিচিত্রের অন্তরতর সংযোগ ঘটিয়াছে'।

আর্য সমাজে অনার্য অনুপ্রবেশের ফলে স্ত্রীদেবতারও আবির্ভাব ঘটল। 'এই দেবীতন্ত্রের মধ্যেও একদিকে হৈমবতী উমার সুশোভনা আর্যমূর্তি, অন্যদিকে করালী কালিকার কপালমালিনী বিবসনা অনার্যমূর্তি।'

আর্যজীবনে অনার্য অনুপ্রবেশ এভাবে যখন গভীরমূল প্রসার লাভ করল তখন অনার্য শূদ্রদের প্রতি আর্যদের ক্রোধ বিদ্বেষ আকারে দেখা দিল। মনুসংহিতায় সে বিদ্বেষ একান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর

অবজ্ঞার আকারে দেখা দিয়েছিল। এ রকম সমাজ-পরিবেশে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য লাভ অত্যন্ত স্বাভাবিক। ক্ষত্রিয়দের অধ্যবসায়ের ফলে ইতিপূর্বে সমাজের ভিতর যে সম্প্রসারণ-প্রবৃত্তি দেখা গিয়েছিল ব্রাহ্মণ প্রাধান্য যুগে তার গতি ব্যাহত হয়ে সমাজ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিরোধের সময় সমাজে যে স্থিতিস্থাপকতা ছিল ক্ষত্রিয় শক্তির ক্ষয়িষ্ণুতার ফলে তা নষ্ট হয়ে গেল। অনার্য-শক্তিও ব্রাহ্মণ্য শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠল না। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ দেশের সর্বেসর্বা হয়ে উঠল।

বহিরাগত যে বীর জাতি এদেশে এসে রাজপুত নামে পরিচিত হল ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য আর্যের ন্যায় তাদের স্বীকার করে 'একটি কৃত্রিম ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করল। বুদ্ধি বা প্রকৃতিতে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ নয় বলে এরা ব্রাহ্মণদের সংকীর্ণ আত্মসংকোচন প্রয়াসের সহায়ক হয়ে জাতিবন্ধনকে আরো দৃঢ়তর করে তুলল।

মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্য শক্তির সে অপ্রতিহত প্রতাপের দিনে জাতির চিত্ত আহত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু চৈতন্য হারায়নি। চৈতন্য যে হারায়নি তার প্রমাণ মধ্যযুগের নানক কবীর প্রভৃতি সন্তগণ 'ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্য সাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন'। শুধু নানক কবীর নন, মধ্যযুগে ভারতবর্ষে পর পর আরো অনেক গুরু আবির্ভূত হয়েছেন—যাঁদের আন্তরিক প্রয়াস ছিল স্বদেশবাসীকে সমস্ত লোকাচার শাস্ত্রবিধি ও চিরাভ্যাসের সংস্কার থেকে মুক্ত করে জাতীয় চিত্তে মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করে তোলা।

ভারতেতিহাসের প্রকৃতিই ছিল সমস্ত প্রকার বাহ্যিকতার মিথ্যা আবরণ থেকে মুক্ত করে মানুষের মনে সত্য পিপাসাকে জাগিয়ে তোলা। ভারতীয় মন চিরদিনই গতিশীল। সুদূর অতীত কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় মন চিরদিনই জড়ত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আসছে। 'ভারতের উপনিষদ, ভারতের গীতা,

তাহার বিশ্বপ্রেম মূলক বৌদ্ধধর্ম, সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী, তাহার শ্রীকৃষ্ণ, তাহার শ্রীরামচন্দ্র এই মহাযুদ্ধেরই অধিনায়ক'।

দীর্ঘকালের ভারতীয় জীবনের ক্রমবর্ধমান ধারা অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, 'বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায় বলিয়া বাহুল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা'।

বহুযুগের প্রথাবদ্ধ আবর্জনার সঞ্চয় ইতিহাসের পথ-বাহিত হয়ে ভারতীয় জীবনে তামসিকতার সঞ্চার করলেও আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন ভারতবর্ষ সে তামসিকতার ভাব কাটিয়ে জ্ঞানোজ্জ্বল ও সক্রিয় জীবনচেতনায় আবার জেগে উঠবে।

আধুনিক ভারতবর্ষের অভিমুখিতাও হল স্বদেশের চিরন্তন সত্যবোধ, ঐক্যবোধ ও সামঞ্জস্যবোধকে ফিরে পাবার দিকে। ইতিহাসের গতিপথে আধুনিক ভারতবর্ষ তার বহুযুগের কুসংস্কার সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বিশ্বের উদার উন্মুক্ত ভাবধারা আত্মসাৎ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। বৃহত্তর মানব চেতনায় ভারতীয় মন একবার বিশ্বাভিমুখী হয়ে ওঠে, আবার স্বাজাত্যবোধের প্রেরণায় সে মন স্বদেশ-চিন্তায় আত্মমগ্ন হয়। স্বজাতির পরিচয়ের মধ্য দিয়ে সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির পরিচয়ের মাধ্যমে স্বজাতির সত্যরূপ উপলব্ধি যেদিন সম্পূর্ণ হবে সে দিনই ভারতবাসীর জীবনে আসবে আত্মপ্রত্যয়জনিত উদারতা—যে ঔদার্য ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসকে করেছে গৌরবোজ্জ্বল।

বৈদিক যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের ধারা ব্যাখ্যা করেও রবীন্দ্র-মনে সম্পূর্ণ তৃপ্তি এল না। তাঁর মনে হল বৈদিক ও হিন্দু যুগের অন্তর্বর্তী বৌদ্ধ যুগে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ভারতেতিহাসের বহু মূল্যবান তথ্য। সে তথ্যকে উদ্‌ঘাটিত করে স্বদেশের ইতিহাসের সত্যরূপ প্রকাশ করবার জন্যে তিনি আহ্বান করলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীকে। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ করেন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে

শান্তিনিকেতন পত্রে 'ভারত-ইতিহাস-চর্চা' নামক মূল্যবান প্রবন্ধ।

য়ুনাইটেড্ স্টেট্স অফ আমেরিকার ইতিহাসের সঙ্গে ভারতেতিহাসের তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি বলেন, আমেরিকায় বিভিন্ন সময়ে বহু জাতির একত্র সম্মিলন হলেও সে দেশে ভারতবর্ষের মতো ঐক্যের সাধনা কখনও প্রাধান্য লাভ করেনি। রাষ্ট্রশক্তিকে সংহত করবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা যে প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে মিলন সাধন করতে চেয়েছে তাকে বলা চলে একাকী-করণ। 'ইহাতে রাষ্ট্রীয় দিক হইতে সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু বৈচিত্র্যমূলক মানব সভ্যতার দিক হইতে ইহাতে ক্ষতিই ঘটে'। এর কারণ বাইরের স্বাধীনতার লোভে এ প্রক্রিয়ায় মানুষ অন্তরের স্বাধীনতাকে বলি দিতে বাধ্য হয়। এতে মানুষের বৈচিত্র্যের সাধনা ব্যাহত হয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় 'জাতিসংঘাত ও সামঞ্জস্যের প্রক্রিয়ায় বৈদিক যুগ বৌদ্ধযুগে, বৌদ্ধযুগ পৌরাণিক যুগে পরিণত' হয়েছে। 'এ সৃষ্টির উদ্যমে রাজা ও রাষ্ট্রনীতি প্রধান শক্তি নহে'। ইংরেজ-ঐতিহাসিক মনে করে মুসলমান যুগ থেকেই ভারতের প্রকৃত ইতিহাসের শুরু হয়েছে। ইংরেজ-অধিকারে সে ইতিহাস আরো জটিল হয়েছে। ভারতবাসীও তাদের দৃষ্টিতে ভারত-ইতিহাসের পুনর্গঠন করতে গিয়ে ইতিহাসের মর্মগত সত্যকেই উপেক্ষা করেছে। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস যে সমাজ ও ধর্মভিত্তিক—এ সত্য উপলব্ধি না করায় ভারতীয় ইতিহাস ইংরেজ-রচিত ইতিহাসের নকলে পর্যবসিত হচ্ছে।

স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীকে আহ্বান করলেন অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি ত্যাগ করে ভারতের সমাজ ও ধর্মভিত্তিক ইতিহাসের পুনর্গঠনের জন্য। সমাজ ও ধর্মভিত্তিক ভারতেতিহাসের পর্যালোচনায় বৌদ্ধযুগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অপরিহার্য। এর কারণ

এ যুগে ভারতাগত বিভিন্ন বিবদমান জাতি একটি উদার ধর্মের প্রভাবে মহাজীবনের স্বপ্ন দেখেছিল। পরবর্তীকালে হিন্দুযুগেও যে ঐক্যের আদর্শকে সার্থক করে তুলবার প্রয়াস হয়েছিল তারও ভিত্তিতে রয়েছে এ বৌদ্ধযুগ। সেজন্য আমাদের বর্তমান যুগকেও বুঝতে হলে ভারতেতিহাসের এ সন্ধিযুগের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ইংরেজ ঐতিহাসিক বৌদ্ধযুগের যে বিশিষ্ট দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন সে হ'ল তত্ত্বপ্রধান হীনযান সম্প্রদায়ের জীবনসাধনা। কিন্তু 'বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করেছে মহাযান সম্প্রদায়। সুদূর প্রাচ্যেও মহাযান সম্প্রদায়ের হৃদয়ভিত্তিক ধর্ম প্রচারিত হয়ে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এ ধর্মমতের মাধ্যমেই নানা জাতির ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ভারতীয় জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ভারতীয় চিত্তের প্রসার ঘটিয়েছে। মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলির সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের সাদৃশ্য আমাদের বিস্মিত করে। এ সাদৃশ্য কিছুটা বৌদ্ধধর্মের স্বরূপগত হলেও অনেকাংশে 'ভারতের অবৈদিক সমাজের সহিত মিশ্রণ-জনিত'। বৌদ্ধযুগে ভারতের বুকে নানা জাতির মিশ্রণের ফলে ইতিহাসের যে সমস্ত ঐক্যমূলক উপাদানের সৃষ্টি হল তা পরবর্তী হিন্দু ইতিহাসকেও অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাসের ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হ'লে মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধপুরাণগুলির অনুশীলন অপরিহার্য।

সভ্যতার আদি যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিচিত্র ইতিহাসের ধারাকে রবীন্দ্রনাথ প্রজ্ঞা দৃষ্টির সাহায্যে ভাব রূপ দিয়েছেন বিস্তৃত ইতিহাস জিজ্ঞাসায়। সে ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল ভারত-সভ্যতার গৌরবকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বদেশপ্রেমিক কবির প্রয়াস ছিল ঐকান্তিক। স্বদেশের বিস্মৃত অতীত ইতিহাসের পুনর্গঠনে

রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর অধ্যবসায় ও মণীষাকে একাগ্রভাবে নিয়োজিত করেছিলেন তাতে এ 'বিশ্বকর্মা' কবিকে ভারতবর্ষের গঠনধর্মী স্বদেশপ্রেমিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে কারো বোধ হয় দ্বিধা হবে না। ভারত-ইতিহাসের যুক্তি-সম্মত মৌলিক ব্যাখ্যা রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের দিক থেকে কম উল্লেখ্য নয়। যে ঐক্যমূলক মানবাদর্শের সাধনা সর্বদেশের ও সর্বকালের মহামণীষীদের মধ্যে রবীন্দ্র-জীবনকে চিহ্নিত করেছে এবং যার শিল্পসমন্বিত প্রকাশে রবীন্দ্র-সাহিত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—তারও বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন কবি ভারত-ইতিহাসের দীর্ঘপ্রসারিত ও জটিল ধারার মর্ম উদ্ঘাটনে। এ ছাড়া গতিশীলতা ও সংস্কারমুক্তির যে দুর্নিবার প্রেরণা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বিচিত্র রূপে রসে সমৃদ্ধ করেছে তারও উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের এ ইতিহাস-ব্যাখ্যায়।

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারত

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার মননশীল রূপ ফুটে উঠেছে যেমন তাঁর ইতিহাস জিজ্ঞাসায়, তেমনি তার আবেগময় প্রকাশ ঘটেছে কাব্য-কবিতায় ও গদ্য প্রবন্ধে—এ মন্তব্য পূর্ব অধ্যায়েই করা হয়েছে। যে ভাব দৃষ্টির সাহায্যে কবি তাঁর প্রিয় স্বদেশকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার পরিচয় দেওয়া হবে এ অধ্যায়ে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যচেতনার মূলে রয়েছে সুদূরপ্রসারী ও বিচিত্র কল্পনা। কিন্তু নিছক কল্পনার জাল বুনেই কবি-প্রতিভা নিঃশেষিত হয়নি। কালিদাস ও কীটসের মতো তীব্র সৌন্দর্যানুভূতি তাঁর কবি-কল্পনাকে করেছে সমৃদ্ধ, শেলীর মতো সর্ববন্ধনমুক্ত জীবনের উপলব্ধি তাঁর কাব্যে সঞ্চার করেছে প্রচণ্ড আবেগ, দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনের রূপ অনুসন্ধানে তাঁর কাব্য হয়েছে তাৎপর্যময়। চিরন্তনী প্রকৃতির সঙ্গে একত্মতা অনুভবে তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন কালিদাস ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে। প্রেমের সূক্ষ্ম রহস্য বিশ্লেষণে তিনি ব্রাউনিঙের সমধর্মী। আবার শিশুমনের রহস্য-জগতেও তিনি বিচরণ করেছেন পাশ্চত্ত্য নাট্যকার মেতারলিঙ্ক ও বেরির মত। রবীন্দ্র-মনের এ বিপুল প্রসার তাঁর সৃষ্টিতে এনে দিয়েছে বৈচিত্র, কিন্তু বৈচিত্র্যই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। রবীন্দ্র সাহিত্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে অন্তঃস্তব্ধ ভাবগভীরতা এবং জগৎ ও জীবনের প্রতি ঋষি-জনোচিত প্রজ্ঞাদৃষ্টি। সে প্রসারিত জীবন-দৃষ্টির সাহায্যে কবি অবিচ্ছিন্ন সেতু রচনা করেছেন জীবন ও মৃত্যু, স্বর্গ ও মর্ত্য এবং বর্তমান ও অতীতের মধ্যে। প্রাচীন ভারতের বিচিত্র জীবনধারা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কখনও ফিরে আসেন বর্তমান ভারতের কর্মচঞ্চল

জীবন-প্রবাহের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি কল্পনার পাখায় ভর করে ফিরে যান প্রাচীন ভারতের সুগভীর শান্ত ও মৌনমহিমায় স্তব্ধ ভাবজীবনে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে বর্ণিত সে ভারত কর্মে উত্তেজনাহীন, ধর্ম উপলব্ধিতে প্রশান্ত, শ্রী ও সমৃদ্ধিতে জ্যোৎস্না-স্নাত শারদপ্রকৃতির মতই মাধুর্যময়। সে স্বপ্নের ভারত রবীন্দ্র-সাহিত্যে কী গৌরবদীপ্তি নিয়ে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছিল তা এখানে আমাদের আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে উপলব্ধি করেছিলেন দেশকালের অন্তহীনতায় পরিব্যাপ্ত একটি সক্রিয় সত্তা রূপে। দেশকেও দেখেছেন কবি একটি সুবিস্তৃত কালের সুবিশাল পটভূমিকায়। অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে দেশ অগ্রসর হয়ে চলেছে ভবিষ্যতেব দিকে। প্রাচীন কালে ভারত যখন স্বাধীন ছিল তখন ভারতবাসীও ছিল অখণ্ড জীবন-দৃষ্টির অধিকারী। কবির সমকালীন পরাধীন ভারত হারিয়ে ফেলেছে সে অখণ্ড জীবনবোধ যার ফলে ভারতের বর্তমান জীবন শতসহস্র তুচ্ছতার আঘাতে ধূল্যবলুণ্ঠীত। একটি মহান্ জীবনাদর্শ থেকে বর্তমান ভারতবাসীর এ মর্মান্তিক স্খলন রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সচেতন কবিচিত্তে জাগিয়েছে দুঃসহ বেদনাবোধ। তাই তিনি বার বার পরমশক্তিমান বিশ্বপিতার নিকট প্রার্থনা করেছেন—বর্তমান অধঃপতিত ভারতকে প্রাচীন ভারতের অখণ্ড জীবন বোধে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। কবির সমগ্র 'নৈবেদ্য' কাব্য আধুনিক মোহাচ্ছন্ন ভারতকে প্রাচীন ভারতের সে সম্পূর্ণ জীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রবল প্রায়াসের স্বাক্ষর।

নানা লৌকিক সংস্কারে অন্ধ মানুষের জন্যে কবির এ মুক্তিস্বপ্ন বর্তমান যুগে নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী ইংরেজ কবি শেলীও সংকীর্ণ জীবন-পল্বলে আবদ্ধ মানুষের মধ্যে বন্ধনমুক্ত ভাব-জগতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিপ্লবী কবির সে জগৎ-চেতনা গগনস্পর্শী কল্পনায় সমৃদ্ধ হলেও সাধারণ মানুষের কাছে তা একটা নির্বিশেষ ভাবসত্য বলেই মনে হয়। আবার টেনিসনের কাব্যে

স্বদেশের রূপ এত বাস্তব ও এত সংকীর্ণ যে, তাতে মহৎকাব্যের সীমাতিরিক্ত প্রসার ও বেদনা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে স্বদেশ-চিত্র কবির অখণ্ড জীবনচেতনা ও বেদনায় স্পন্দমান। সে সামগ্রিক জীবনবোধকে কাব্যোচিত উৎকর্ষ দান করেছে বাস্তব জীবনের বর্ণ বৈচিত্র্য, আবার মাহাত্ম্য দান করেছে অপরূপ জীবনের সৌন্দর্য।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ভারতবর্ষ প্রাচীন কালে মহাজীবনের অধিকারী হয়েছিল ত্যাগ ও বীর্যের সাধনার সাহায্যে; জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা ও গ্লানির ঊর্ধ্বে ছিল সে ভারতবর্ষের অবস্থান। প্রাচীন ভারতবর্ষের সে শাশ্বত জাবনবোধ যুগে যুগে উদ্বোধিত করেছে ভারতবাসীকে একটি জীবনের পিপাসায়। সে মৃত্যুঞ্জয় জীবনের পরিচয় ভোগাকাঙ্ক্ষাহীন ইতিহাস বিশ্রুত রাজার জীবনে আর ঋষির তপোবনে। বর্তমান ভারতের খণ্ডিত জীবনরূপ তাই অনন্ত জীবনের অভিলাষী কবিচিত্তকে ব্যাকুল করে তুলেছে সে মুক্ত জীবনের জন্যে। তারই ব্যঞ্জনা ঃ

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র
অশোকমন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র
দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব,
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।

পরিপূর্ণতার আদর্শই ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনার পরম কাম্য বস্তু। সেজন্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে কবি জীবনের একমাত্র

মুক্তিপথ বলে ভাবতে পারেন নি। বর্তমান যুগের শ্রীঅরবিন্দের জীবনে কবি দেখেছিলেন বাস্তবতা ও আদর্শের এক অপূর্ব সম্মিলন। এর কারণ স্বদেশের পরাধীনতার অসহ্য বেদনা যেমন করেছিল তাঁর বন্ধন-অসহিষ্ণু মনকে বিপ্লবী তেমনি মানবাত্মার পূর্ণ স্ফূর্তির পথ আবিষ্কারের জন্যে তিনি বরণ করেছিলেন নিঃসঙ্গ-কঠোর তপোব্রত জীবন। ভাব ও কর্মের এ দুর্লভ সমন্বয়ই রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ অন্তরকে সবলে আকর্ষণ করেছিল শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড জীবন-সাধনার দিকে। এ মুক্তিসাধককে নমস্কার জানাতে গিয়ে কবি বলেছেন:

আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন।
সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার
চেয়েছ দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।

এ পরিপূর্ণতার আদর্শে প্রত্যয়ী কবি তাই প্রাচীন ভারতে যে স্থির জীবন-মূল্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তা প্রধানতঃ ভোগস্পৃহাহীন ধর্মবোধ ও ত্যাগের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আজ এ সভ্যতাগর্বিত বিংশ শতাব্দীতে শুধুমাত্র সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষমতালোভী জাতির জীবনে নেমে এসেছে বিদ্বেষের কালো ছায়া। অথচ পরিপূর্ণ মানবতার উপাসক প্রাচীন ভারত বিশ্বের আর্য-অনার্য সমস্ত জাতিকে সস্নেহ আহ্বান জানিয়েছিল একটি মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন নিয়ে। অতীত ভারতের এ বিশ্বমৈত্রী-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ যুগের কবি রবীন্দ্রনাথও সমস্ত বিশ্ববাসীকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পুণ্যভূমি ভারততীর্থে। কবি-কল্পনায় ভারতলক্ষ্মীর রূপ-পরিকল্পনাও সংকীর্ণ দেশকালের সীমারেখার বহু উর্ধ্বে—ভারত-জননী শুধু ভারতবাসীর বন্দিতা মাতা নন, তিনি বিশ্বেরও জননী।

ভারতবর্ষের এ গৌরবদীপ্ত মূর্তি-কল্পনায় কবি যদি শুধুমাত্র ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হতেন তাহলে ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধিৎসার কাছে তার বিশেষ কোন মূল্য থাকত না। কিন্তু ইতিহাস-পাঠক-মাত্রই জানেন সুদূর অতীতে প্রাচীন ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর বহু জাতিকে সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রথম আলো দেখিয়েছিল। কবির অনুভূতিতে বিশ্বদেবতা তাই দেখা দিয়েছেন তাঁর স্বদেশের প্রিয়মূর্তিতে ঃ

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে ?
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।

বিশ্বসভ্যতার পথ প্রদর্শক এ প্রাচীন ভারত সাময়িকভাবে আজ অধঃপতিত হলেও কবি ঐতিহ্যগৌরবমণ্ডিত এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হারাননি। যে মঙ্গল-সাধনা ও সত্যোপাসনা প্রাচীন ভারতকে করেছিল বিশ্ববাসীর কাছে বরেণ্য ভাবীকালের সে ভারত বিরোধ-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর মধ্যে আবার এনে দেবে শান্তির অভয়বাণী ঃ

নয়ন মুদিয়া ভাবীকাল পানে
চাহিনু শুনিনু নিমেষে—
তব মঙ্গল বিজয় শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে।

শুধু ইতিহাসের বহু ঘটনা সমাকীর্ণ জগতে নয়, সাহিত্যের ভাবঘন রস-জগতেও কবি অনুসন্ধান করেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের বিচিত্র রূপ। বেদ-উপনিষদের মধ্য দিয়ে যে প্রাচীন ভারতকে দেখা যায় সে ভারত জ্ঞানে ও সাধনায় বৃহৎ। আর ক্লাসিক সাহিত্যে যে ভারতের পরিচয় পাওয়া যায় সে ভারত সৌন্দর্য ও মাধুর্যে আনন্দঘন। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' ও 'মেঘদূত' কাব্যে সে সৌন্দর্য জগৎ চিত্রিত

হয়েছে বিচিত্র বর্ণালিম্পনের সাহায্যে। হিংসা-দ্বেষহীন, শান্তি প্রীতি ও শ্রী পরিপূর্ণ জীবন-পরিকল্পনায় ক্লাসিক কবির কল্পনাতিশয্য যে ছিল না তা জোর করে বলা চলে না। কিন্তু সে শান্ত ছন্দে প্রবহমাণ জীবন প্রবাহের প্রতি শান্ত রসের কবি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল সহজাত ও দুর্নিবার। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক অতীত-প্রীতির ভিতর আধুনিক সমাজবাদী সমালোচক পলায়নী মনোবৃত্তির আবিষ্কার করবেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ অতীত জীবন-প্রীতির মধ্যেই নিহিত আছে—রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের একটি অভ্রান্ত সংকেত। কোন সময়ে হাল্‌কা হাসির বুদ্‌বুদের মধ্য দিয়ে, আবার কোন সময় মেঘমন্দ্র-শব্দিত ছন্দ ও গম্ভীর শব্দ-বিন্যাসের মধ্যে কবি তাঁর সে ধ্যানের ভারতকে মূর্ত করে তুলেছেন বহু কাব্যকবিতায়।

সুগভীর ঐতিহ্যপ্রীতিকে কেন্দ্র করে এ ধরনের রসসমৃদ্ধ কবিতা বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল। সুবিজ্ঞ রবীন্দ্রসমালোচক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন : Longfellow-র Divina Commedia বা Keats-এর Ode to the Grecian Urn-এর মত বিখ্যাত রোমান্টিক কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথের এ শ্রেণীর কাব্যের রসের দীপ্তি বা কল্পনার সমগ্রতা নেই।

'মানসী'র অন্তর্গত 'মেঘদূত' কবিতার ভিতর কবি জীবন্ত করে তুলেছেন মন্দাক্রান্তা ছন্দে প্রবাহিত কালিদাসের প্রাচীন ভারতকে, আর 'কল্পনা'র 'স্বপ্ন' কবিতায় প্রাচীন উজ্জয়িনীতে কবির মানস অভিসার অপরূপ কাব্য-সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু উভয় কবিতাতেই দেখি বর্তমানের বাস্তব আঘাতে কবির স্বপ্ন-কল্পনা হয়েছে খণ্ডিত। এ স্বপ্নভঙ্গের বেদনা একটা মর্মান্তিক আর্তনাদের মধ্য দিয়ে লাভ করেছে করুণ পরিসমাপ্তি। কবি-অন্তরের এ বেদনার হাহাকার পাঠকের সংবেদনশীল অন্তরেও ফেলে বেদনার দীর্ঘ ছায়া।

রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেমানুভূতিকেও বিস্তৃতি দিয়েছে প্রাচীন ভারতীয়

কাব্যপুরাণ-বর্ণিত চিরন্তন প্রেমকাহিনী। প্রথম যুগের কাব্য-কবিতায় কবি সে সুপ্রাচীন প্রেম-কাহিনীকে সবিস্তার রূপ দিয়ে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছেন। প্রেমকাব্য-রচনার শেষ পর্যায়ে সে বিস্মৃত অতীতের প্রেমানুভূতিকে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে রূপান্তরিত করেছেন কবি শুধুমাত্র সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার সাহায্যে। 'মহুয়া' কাব্যের 'সাগরিকা' কবিতা থেকে শুধু একটিমাত্র উদাহরণ দেব। সংশয়ের স্তরোত্তীর্ণ বালিসুন্দরী নবাগত ভারত-পুরুষের দিকে যখন অনুরাগের দৃষ্টিতে চাইল, সে দৃষ্টিকে তুলনা করেছেন কবি, ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি'র সঙ্গে। এ অবস্থায় এর চাইতে চমৎকার ইঙ্গিতময় অনুরাগের বর্ণনা বোধ হয় আর হতে পারত না। শুধু এ কবিতায় নয় শেষ পর্যায়ের আরও বহু প্রেম-কবিতায় কবি প্রেমানুভূতিকে মাধুর্য ও ও গভীরতা দান করেছেন প্রাচীন ভারতের আরও বহু প্রেম-চিত্রের প্রেক্ষাপটে।

প্রাচীন ভারতের সঙ্গে জাগরণোন্মুখ নবীন ভারতের পরিচয়-সাধনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথেব 'স্বদেশ' নামক গ্রন্থে। দেশে তখন জাতীয়তাবোধের উন্মত্ত বন্যা প্রবাহিত হয়েছে। নেতারা 'পোলিটিক্যাল এজিটেশন' করে অত্যাচারী বিদেশী শাসকের কাছ থেকে স্বাধীনতা আদায় করতে ব্যস্ত। কিন্তু দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন শুধুমাত্র উদ্দীপনা উত্তেজনা ও আন্দোলনের সাহায্যে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না। প্রকৃত জাতীয় মুক্তির জন্যে চাই—প্রথমে উত্তেজনাহীন গভীর স্বদেশ-চিন্তা ও গঠনমূলক কাজ। ঐতিহ্যভ্রষ্ট জাতির পক্ষে নতুন জাতীয় জীবনের সৌধ নির্মাণ করবার চেষ্টা শূন্যে ফুলের ফসল ফলাবার ইচ্ছার মতই অর্থহীন। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত হয়েও শেষ পর্যন্ত সে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন। জীবনের এ পথ পরিবর্তন কোন ভীরুতার ফলে নয়, বরং নতুন ভাবান্দোলনের সাহায্যে জাতীয় চিত্তে নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার প্রেরণাকে

বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে। জাতীয় জীবনের শক্তি ও বলের উৎস খুঁজে পেলেন তিনি প্রাচীন ভারতের স্থির জীবনাদর্শের মধ্যে। সে ভারত জ্ঞানে কর্মে ও চিন্তায় মহান, বীর্যে ক্ষমায় প্রেমে তেজোদীপ্ত, ভোগে সংযমে ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ জীবন-চেতনার আশ্রয়স্থল। সে ভারতের পরিচয় তুলে ধরলেন তিনি 'স্বদেশ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'নূতন ও পুরাতন', 'নববর্ষ,' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা,' 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধে। স্বদেশ-চেতনার একটি নতুন রূপ দেখা গেল এ সমস্ত প্রবন্ধে। শক্তিমান প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্য দিয়ে তিনি দেখালেন—কী ধর্মপ্রেরণায়, কী সমাজ চিন্তায়, কী রাষ্ট্রচিন্তায়—প্রাচীন ভারত আধুনিক য়ুরোপ থেকে কোন অংশেই হীন ছিলনা, বরং সে সুদূর অতীতে ভারতীয় সংস্কৃতি আলো বিকীর্ণ করেছে সমস্ত পৃথিবীতে।

বর্তমান য়ুরোপ কর্মসফলতাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে অনুভব করেছে। তাই অবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রয়াসেই তার আনন্দ। স্রষ্টার মহিমা সম্পর্কে য়ুরোপের কৌতূহল সীমাবদ্ধ। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন ভারতবর্ষ তদানীন্তন পৃথিবীর চাঞ্চল্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। সেজন্য বহিঃসংঘাতহীন অচঞ্চল চিত্তে অন্তর্জগতের গভীর রহস্য অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছিল। ভারতের এ আন্তর সাধনার পরিচয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ

> জগৎ যেমন অসীম, মানবের আত্মাও তেমনি অসীম, যাঁরা সেই অনাবিষ্কৃত অন্তর্দেশের পথ অনুসন্ধান করেছিলেন তাঁরা যে নতুন কোন সত্য, নতুন আনন্দ লাভ করেননি, তাহা নিতান্ত অবিশ্বাসীর কথা।

> ভারতবর্ষ সুখ চায়নি, সন্তোষ চেয়েছিল ; তাহা পেয়েওছে, এবং সর্বতোভাবে সর্বত্র তার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছে।

সূক্ষ্ম অন্তর্জগতের অনুসন্ধানী প্রাচীন ভারতীয় মন জীবনবিমুখ ছিল—পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাবিলাসীর এ আধুনিক বিশ্বাস যে শুধু অশ্রদ্ধেয়

নয়, অসত্য ও মহাভারতের জীবন-পরিচয় বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ তা প্রমান করেছেন :

> এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজ-বিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। সে সমাজে একদিকে লোভ, হিংসা, ভয়, দ্বেষ, অসংযত অহংকার—অন্যদিকে বিনয়, বীরত্ব, আত্মবিসর্জন, উদার মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্য-চরিত্রকে সর্বদা জাগ্রত করে, মথিত করে রেখেছিল।...সেই বিপ্লব-সংক্ষুব্ধ বিচিত্র মনোবৃত্তির সংঘাত দ্বারা সর্বদা-জাগ্রত শক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢ়োরস্ক, শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নত মস্তকে বিহার ক'রত।

উদার শান্তি ও অচঞ্চল স্থৈর্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় জীবনের সকল শক্তির মুলে। 'নববর্ষে' কবি নবীন ভারতকে প্রাচীন ভারতের সেই অন্তস্তব্ধ বলিষ্ঠ জীবন-চেতনার বাণী উপলব্ধি করবার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছেন সবল ভাষায় :

> যাহা আমাদের সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা বলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী, তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলিতেছে।...এই সঙ্গী-হীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ তাহা উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের বিপুল বিলাস সামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে—তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না ; করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃসন্দেহে তাহার পদধুলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।

ভারতায় মুক্তি ও য়ুরোপের freedom-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> এই যে কর্মের বাসনা, জনসংঘের সংঘাত ও জিগীষার উত্তেজনা হইতে মুক্তি—ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে ভয়হীন,

শোকহীন, মৃত্যুহীন, পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ যাকে 'ফ্রীডম্' বলে সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ; সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু; তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর—তাহা পরের প্রতি অন্ধ; তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে।···এই দানবীয় 'ফ্রীডম্' কোন কালে ভারতবর্ষের তপস্যার চরম বিষয় ছিল না।···এই 'ফ্রীডমের' চেয়ে উন্নততর—বিশালতর যে মহত্ত্ব—যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় আমরা সমাজের মধ্যে আবাহন করিয়া আনি—অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্ন চরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড় বড় রাজমুকুট পবিত্র হইবে।

গৌরবদীপ্ত প্রাচীন ভারতের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে কবি প্রত্যয়ান্বিত হলেন নবীন ভারতের ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে। উপলব্ধি করলেন তিনি এত প্রাচীন ও মৃত্যুঞ্জয় জীবনাদর্শের অধিকারী যে দেশ, সে দেশের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় সুনিশ্চিত। ১৩০৯ সালের নববর্ষে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শান্তিনিকেতনে তিনি যে অভয়বাণী প্রচার করলেন, অন্ততঃ রাজনৈতিক মুক্তির দিক দিয়ে উত্তরকালে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে ঃ

জয় হইবে, ভারতবর্ষের জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক্, তাহারই জয় হইবে।

প্রাচীন ভারত-চিন্তা রবীন্দ্রনাথের সুদূর-প্রসারী ও রোমান্টিক ভাব-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত ক'রে শুধুমাত্র তাঁর কাব্যকেই সমৃদ্ধ করেনি, দেশের মননশীল চিন্তাকেও জাগ্রত করেছে একটি বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের অভিমুখে।

যন্ত্রসভ্যতা ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-মনের মননশীল ভাবনার এক রূপ প্রকাশ পেয়েছে স্বদেশের ইতিহাস জিজ্ঞাসায়। এ রূপে রবীন্দ্র-মন মুখ্যত স্বদেশ মুখী। রবীন্দ্র-মনের বিকাশ ধারায় স্বদেশ ভাবনা কত ফলপ্রসূ হয়েছিল তার অনতিবিস্তার পরিচয় দেওয়া হয়েচে পূর্ব অধ্যায়ে। এ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের যুগ-সচেতন মন আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার স্বরূপ উদ্ঘাটনে কিরূপে বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হবে।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে সর্বপ্রথম বেগবান করেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাশীল দার্শনিকদের অভিনব জীবনজিজ্ঞাসা। এ শতাব্দীতে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকেরাও নিত্য নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সাহায্যে এই আবিস্ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেখা যায় পাশ্চাত্ত্য দেশের শিল্প বিপ্লবে। এক দিকে লক, হিউম, বার্কলে, প্রভৃতি মনীষী মানব জীবনের মুল্যবোধ সম্পর্কে অচিন্তিতপূর্ব প্রশ্ন তুলে সমকালীন চিন্তাজগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন, আর এক দিকে যন্ত্রের সাহায্যে ব্যাপকভাবে জীবনের নিত্য ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদন পূর্বযুগের সমাজ কাঠামোর রূপান্তর ঘটিয়ে আধুনিক যুগসম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছে। ভাব ও বস্তুজগতের এই বিপ্লবধর্ম প্রসঙ্গে একটি জিনিষ উল্লেখ্য। মানুষের মনে চিন্তার প্রভাব অনুভূত হয় ধীর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সে চিন্তার ফলাফল ক্রমশঃ অভিব্যক্তি লাভ করে সাহিত্যে শিল্পে দার্শনিক রচনায় ও বিজ্ঞান ভাবনায়। কিন্তু বস্তুজগতে বিপ্লব ধর্মের প্রভাব অনুভূত হতে দেরী হয় না। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের

ভাববিপ্লবী দার্শনিক সমাজ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে নতুন প্রশ্ন তুলেছিলেন, নবতর চিন্তার আলোকে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সে প্রশ্নাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমে তীক্ষ্ণতর হয়েছে। কিন্তু ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে যন্ত্রের সাহায্যে জীবনের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন সমকালীন ইংলণ্ডের সমাজ-ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এনেছিল তা ছিল সম্পূর্ণ অভাবিত। জীবনের ক্ষেত্রে যন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে বহু শতাব্দীর মৌন যবনিকা অকস্মাৎ অপসারিত হল। মন্দাক্রান্তা তালে পল্লীর কৃষিনির্ভর জীবনের শান্ত প্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠল নতুন জীবিকার্জনের তাড়নায়।

ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ বৎসরই সার্থকভাবে যন্ত্রের সাহায্যে সে দেশে সুতো এবং উল উৎপন্ন হল। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় স্বল্প সময়ে জীবনের পক্ষে অপরিহার্য বস্তু উৎপাদন সেদিন সমাজ-মানসের উপর কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল আজ সমৃদ্ধ যন্ত্রযুগে বসে তা অনুমান করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। তবে সে যুগের ইংলণ্ডের জাতীয় ইতিহাস আলোচনা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে, এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্র ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনে এনে দিয়েছিল একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলের শিল্প নগরীগুলিতে এই সময় থেকে যে অবিশ্রাম কর্মের বাঁশী বেজে উঠল সে বাঁশীর সুরে সাড়া দিতে ছুটল দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি কর্মনির্ভর পল্লীবাসীরা। এই যন্ত্রোৎপাদিত বৃহৎ পণ্যসম্ভারকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্যে তৈরী হল নতুন নতুন রাস্তা ও খাল। কৃষিকর্মেও পূর্বতন পদ্ধতির স্থলে যন্ত্রের ব্যবহার হল অবাধ। তাতে কৃষিসম্ভারের প্রাচুর্যও অবশ্য বাড়ল। কিন্তু কৃষকদের কোন লাভ হল না। লাভ হল শুধু তাদের যারা ছিল যন্ত্রের মালিক। এভাবে কি শিল্পজগতে কি কৃষিজগতে যারা শ্রম দিয়ে জীবনের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনকে দিল শতগুণে বাড়িয়ে তারা হল ফললাভে বঞ্চিত। অপর পক্ষে যারা

হল যন্ত্রের মালিক তারা ক্রমে ক্রমে আর্থিক সম্পদে ফেঁপে ফুলে যেন রূপকথার অতিকায় দানবে পরিণত হল।

যন্ত্র ব্যবহারের ফলে এ ধনবৈষম্য সমাজের মধ্যে শ্রেণী বিভাগকেও ত্বরান্বিত করে তুলল। সমাজের চেহারাও দ্রুত পালটাতে শুরু করল। যে পল্লীবাসীর গভীর অনুরক্তি ছিল জীবনের প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি সে অনুরাগের ভিত্তিও ক্রমশঃ শিথিল হয়ে উঠল। জীবনকে স্বচ্ছল ও সমৃদ্ধ করে তোলবার জন্যে নতুন কর্মচঞ্চল জীবনের মোহ তাদের পেয়ে বসল। শুধু ইংলণ্ডের নয়, সমস্ত য়ুরোপের অধিবাসীদের উপর এই নবীন জীবনাদর্শের প্রভাব বিস্তৃত হতে দেরী হল না। তবে এ অভিনব জীবনাদর্শকে সর্বপ্রথম গ্রহন করেছিল য়ুরোপের মধ্যে ইংলণ্ড। এর কারণ সে যুগের অধিকাংশ যান্ত্রিক আবিষ্কার ছিল ইংরেজের। এ ছাড়া বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানের জন্যে বৈদেশিক আক্রমনের কোন ভয় ছিল না বলেই সে যুগের ইংরেজেরা এ অভিনব জীবনচেতনার পথে নির্বাধভাবে অগ্রসর হতে পেরেছিল।

জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহারের ফল হল ধনস্ফীতি। জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য দ্রুত ধনসম্পদ বৃদ্ধির একটি শুভ দিক আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর যে একটা ভয়ঙ্কর অশুভজনক পরিণতি আছে তা অনেক সময় লোকের চোখে পড়ে না। যান্ত্রিক উপায়ে পণ্য-উৎপাদনের ফলে য়ুরোপের শিল্পাঞ্চলগুলিতে ধনের সঞ্চয় স্তুপীকৃত হয়ে উঠল বটে, কিন্তু এ সমস্ত অঞ্চলে শ্রমিক সমাজের মধ্যে যে দুঃসহ দারিদ্র্যের গ্লানি দেখা গেল তা কিন্তু তাদের পরিত্যক্ত পল্লীজীবনে এত উৎকটভাবে দেখা যায় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এ যুগে ইংলণ্ডের শিল্পাঞ্চলগুলিতে শ্রমিকেরা যে অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে সে দেশের দরিদ্র জনসাধারণও তেমন অবস্থায় পড়েনি।

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী য়ুরোপে নিত্য নতুন যন্ত্র

আবিষ্কার ও যন্ত্র প্রসারের যুগ। এই যুগে সমাজের এক অংশ অপরিমিত ধনসঞ্চয় এবং আর এক অংশে অপরিসীম রিক্ততা মনুষ্যত্বের গৌরবকে সমভাবেই ক্ষুণ্ণ করেছে। যন্ত্রের মালিকদের ভাণ্ডারে উত্তরোত্তর ধনবৃদ্ধি তাদের লোভ ও ভোগ প্রবৃত্তিকে তীব্রতর করে তুলল। আস্তে আস্তে বেশী পুঁজি খাটিয়ে তারা কলকারখানার সংখ্যা বাড়িয়ে তুলল। এ সমস্ত কলকারখানায় কাজ করবার জন্যে অধিকতর সংখ্যক শ্রমিকেরও প্রয়োজন অনুভূত হল। তখন স্ত্রী পুরুষ বালক-বালিকা নির্বিশেষে সবাইকে কারখানার কাজে নিযুক্ত করা হল। প্রচুর পরিমানে পণ্য উৎপাদন করে, শ্রমিকদের ঠকিয়ে, মুনাফার অধিকাংশ ভাগ নিজেরা অধিকার করে সোনার পাহাড় বানিয়ে তোলবার নেশা তখন তাদের পেয়ে বসেছে। সে নেশার ঘোরে তারা শ্রমিকদের খাটিয়ে নিতে লাগল নির্দিষ্ট সময় থেকে অধিক কাল যাবৎ। শ্রমিকদের মনে করতে লাগল তারা মেশিন—তারাও যে সজীব মানুষ, তাদেরও যে ক্লান্তি আছে, অবসাদ আছে, এ কথা গেল তারা ভুলে। শ্রমিকদের কাজে কখনও শিথিলতা এলে বা কোন সময় স্বতন্ত্র ইচ্ছার পরিচয় দিতে গেলে তারা মালিকদের নিকট পেতে লাগল রক্তচক্ষুর ভর্ৎসনা, আর কঠোর শাস্তি। এ ভাবে ব্যক্তির স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব অস্বীকৃত হল, পুঁজিবাদী শ্রেণীর ধনকুবেরদের কাছে—যন্ত্রই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠল। এ যন্ত্রদানবের অনির্বাণ ক্ষুধা নিবৃত্তি করবার জন্যে নিত্য নিয়ত নিযুক্ত হতে লাগল পুঁজিহীন অসংখ্য অসহায় শ্রমিক। যন্ত্রের দাপটে মনুষ্যত্বের এই চরম লাঞ্ছনা দেখে জনৈক চিন্তাশীল মনীষী সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন: Man becomes but a cogwheel in the great machine. At the altar of this machine, human victims are sacrificed. Men, women and children and value of spirit are given the go-by.…

মানবতার লাঞ্ছনা যখন চরমে উঠল তখন দেশের মধ্যে আরম্ভ হল

সমাজ-বিপ্লব। পুঁজিহীন শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকল তাদের স্বাধিকার লাভের অভিপ্রায়ে, আর পুঁজিবাদী মালিকেরাও এক জোট হতে লাগল তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে। পুঁজিবাদী ধনিক ও পুঁজিহীন শ্রমিকদের দ্বন্দ্ব আবিল করে তুলল য়ুরোপের আকাশ বাতাস,—শুধু য়ুরোপের নয়, সমস্ত পশ্চিম আকাশে পুঞ্জীভূত হল মানুষে মানুষে দ্বন্দের এই কাল মেঘ। বিংশ শতাব্দীতে যন্ত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সে অশান্তির কাল ছায়া পূর্ব-দিগন্তকেও আচ্ছন্ন করল।

মানুষের সম্পর্কে আসার পূর্ব পর্যন্ত যন্ত্রমাত্রই জড়, গতিহীন, শক্তিহীন। প্রাণহীন যন্ত্রকে গতিশীল ও বুভুক্ষু দানবে পরিণত করেছে আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষ। নিজেদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার নিত্যনতুন চাহিদা মেটাবার জন্য বুদ্ধিজীবী মানুষ পুঁজিহীন শ্রমিকদের কাজে লাগাচ্ছে, পুঁজিহীন শ্রমিকেরা অক্লান্ত ও বিরামহীন শ্রমের সাহায্যে যন্ত্রদানবকে সচল করে রাখছে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, শ্রমিকচালিত এই যন্ত্রই সচল ও সবল হয়ে তাদের জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। এ যেন এক রহস্যময় মাকড়সার জাল। এ মোহময় জালে জড়িত হবার জন্য বিত্তহীন মানুষ অন্ধ আবেগে ছুটে চলেছে। একথা সে জানেনা যে এই জটিল জালে জড়িয়ে পড়লে বেরিয়ে আসবার উপায় নেই জীবনের উদার মুক্তির পথে।

বুদ্ধিজীবী মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিস্পর্শে যে যন্ত্র একদিন য়ুরোপীয় সমাজে আবির্ভূত হয়েছিল ভগবানের আশীর্বাদ রূপে, সে যন্ত্রই পরবর্তীকালে উদ্যত হল সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সুখ শান্তি বিনাশে। মুখ্যতঃ শিল্পাঞ্চলগুলিতে মনুষ্যত্বের যে অবমাননা নিত্য সংঘটিত হচ্ছিল, জীবনের সে অপচয়ের গ্লানি ভাবিয়ে তুলল য়ুরোপের চিন্তাশীল মনীষী ও অনুভূতিশীল লেখকদের। ঊনবিংশ

শতাব্দীর উদারনৈতিক রাজনীতিবিদেরা মানবতার এই লাঞ্ছনা নিবারণের জন্য সক্রিয় আন্দোলন শুরু করলেন এবং সহৃদয় ও মননশীল মানবদরদী শিল্পীরা তাঁদের শিল্পরচনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন অসহায় শ্রমিকদের এই দুঃসহ অবস্থাকে। মানবসচেতন নেতৃবৃন্দের শ্রমিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হল 'ফ্যাক্টরী আইন' প্রণয়ন, আর সহৃদয় কথাশিল্পী অনুভূতিশীল ও মননশীল প্রাবন্ধিকদের মানবতাপ্রীতি প্রকাশ পেল বাস্তবতানির্ভর নতুন সাহিত্যে। যন্ত্রদানব মানুষের স্বাভাবিক পরিবেশ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে ধ্বংস করে স্রষ্টার সৃষ্টিকে কি ভাবে পঙ্কিল করে তুলছে তার আবেগময় রূপ দিলেন মনস্বী রাসকিন তাঁর মননশীল প্রবন্ধে। তাঁর লেখক জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি নিযুক্ত করেছিলেন আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে এ কৃত্রিম সভ্যতার দোষত্রুটি প্রদর্শনে তাঁর লেখনী ছিল অক্লান্ত। অসহায় মানুষের প্রতি বুদ্ধিজীবী মানুষের প্রবল পীড়ন দেখে প্রকৃতিপ্রেমিক কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ দুঃসহ অন্তরাবেগের তাড়নায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—What man has made of man! মনুষ্যত্বের প্রতি এই অবমাননাই জাগ্রত করেছিল ইংলণ্ডের রাজকবি Masefield-এর সবল লেখনীকে। তাই তাঁর কবিধর্মের মূল কথাই ছিল—Not the Prince for me, but the common man শুধুমাত্র পুর্ণবয়স্ক শ্রমিক নয়, অপরিণত বয়স্ক কিশোর পর্যন্ত এ কৃত্রিম সভ্যতার কবলিত হয়ে কী গ্লানিময় জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল, তার বাস্তব চিত্র হল চার্লস ডিকেন্সের 'ডেভিড্‌ কপারফিল্ড'। মানবতার প্রতি এই লাঞ্ছনার বেদনা ক্রমশঃ স্পর্শ করল সাগরপারের আমেরিকার কবি-শিল্পীকেও। সেজন্য দেখতে পাই সে ভুখণ্ডের সাম্যবাদী কবি হুইটম্যানের কাব্যে নির্যাতিতদের প্রতি কবি-অন্তরের বেদনার নীরব ভাষা মুখর হয়ে উঠেছে। ফরাসী দেশের মানবপ্রেমিক মনীষী রম্যা রঁলা য়ুরোপের বস্তুপূজার উন্মত্ত-

রূপ দেখে বিক্ষুব্ধ হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন সহর থেকে দূরে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে। মানুষের প্রতি মানুষের এই নির্মম অত্যাচার, মানবতার প্রতি নিষ্ঠুর অবহেলা ক্রমশঃ জাগিয়ে তুলল জগতের অন্যান্য ভূখণ্ডের মনীষী-মন ও শিল্পী-চিত্তকে।

১৯১২ সালে য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ এবং ১৯১৬ সালে জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্রপূর্ণ জীবনে দুটি অর্থপূর্ণ অধ্যায়। এই দু বারে শিল্পোন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে ও প্রাচ্যের একটি প্রগতিশীল দেশে ভ্রমণের ফলে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে যা জমা হল তা এই প্রাচ্য শিল্পী-মনীষীকে নতুন প্রবর্তনা দিল ব্যক্তিত্ববোধ, সাজাত্যবোধ ও মনুষ্যত্ববোধ সম্পর্কে নতুন করে ভাববার জন্যে। যান্ত্রিকতার প্রসার মানুষের উদার মানসিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশে কি ভাবে বাধার সৃষ্টি করেছে তার আবেগময় রূপ দিলেন কবি বহু কাব্যকবিতায়, শিল্পরূপ দিলেন কোন কোন প্রতীকী নাটকে আর মননশীল রূপ দিলেন কয়েকটি ইংরেজী প্রবন্ধে। মানবপ্রেমিক ও প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশীলতার স্বাক্ষরে এ যুগের কাব্য-নাটক ও প্রবন্ধ সমৃদ্ধ।

সূক্ষ্ম ভাবসচেতন ও সৌন্দর্য বিলাসী কবির মানস-দিগন্তে এই আকস্মিক বিবর্তনরেখা যে কোন রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সবল ও সচল রূপের শুভ পরিণতি সম্পর্কে কবিমনে আশ্বাস ছিল এতদিন অফুরন্ত সে সভ্যতার অন্তর্নিহিত দৈন্য, উৎকট ও বীভৎস রূপ দেখে কবি অন্তর বেদনায় আর্তনাদ করে উঠল সর্বপ্রথম 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তাবোধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বিদ্যুৎদীপ্ত ভাষায় কবি এই গ্রন্থে 'যুগান্তর' নামে যে কবিতাটি লেখেন তার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন তিনি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত *Nationalism* নামক প্রবন্ধ পুস্তকে। ব্যক্তিত্ব-বিকাশ বিরোধী জাতিপ্রেম-অন্ধ পাশ্চাত্ত্য সভ্যনামধারী মানুষের হাতে পৌঁছিয়ে দেবার

জন্যেই যে তিনি এই অনুবাদটি করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রকাশভঙ্গীতে বাংলা মূলের মত অনুবাদের সাবলীলতাও লক্ষণীয়ঃ

1

The last sun of the Century sets amidst the blood-red clouds of the West and the wirlwind of hatred.
The naked passion of self-love of Nations, in its drunken delirium of greed, is dancing to the clash of steel and the howling verses of vengeance.

2

The hungry self of the Nation shall burst in a violence of fury from its own shameless feeding.
For it has made the world its food,
And licking it, crunching it and swallowing it in big morsels,
It swells and swells
Till in the midst of its unholy feast descends the sudden shaft of heaven piercing its heart of grossness.

আবার সভ্যনামিক যে সমস্ত হিংস্র পশুধর্মী মানুষ ভগবানের দেওয়া আলো বাতাসকে পঙ্কিল করে তুলেছে যান্ত্রিক-সভ্যতার বিষবাষ্পে, তাদের বিরুদ্ধে ভাবাবেগপ্লুত কণ্ঠে কবি অভিযোগ জানিয়েছেন ভগবানের দরবারেঃ (পৌষ, ১৩৩৮, ইং ১৯৩১)

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

এ যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে দুর্নিবার লাভের স্পৃহায় বুদ্ধিজীবী মানুষ বিত্তহীন শ্রমিকদের বঞ্চিত করে যে অপরিমিত ধনের মালিক হয়েছে তার অনিবার্য পরিণতি দেখেছেন ক্রান্তদর্শী কবি ভবিষ্যতের নিশ্চিত সমাজ বিপ্লবের মধ্যে ঃ

দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল
ভূমিকম্পের রোল,
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
লাগিল ভীষণ দোল।
বিদীর্ণ হল ধন-ভাণ্ডার তল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহার
কালনাগিনীর দল।
দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা।

যে আকাশে ছিল একদিন দেবতার আসন পাতা সে আকাশও আজ কলঙ্কিত হয়েছে যন্ত্রযানের আবির্ভাবে, মানুষের প্রতি মানুষের ঈর্ষা আর হিংসা আজ পরিব্যাপ্ত হয়েছে আকাশলোকে, শূন্যের বুক থেকে মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়াচ্ছে আজ মনুষ্যসৃষ্ট যন্ত্র। শঙ্কাতুর কবি তাই ভাবাবেগে বলেন ঃ

যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে—
অশান্তি আজ উদ্যত বাজ
কোথাও না বাধা মানে ;
ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা।

যন্ত্রযুগের প্রমত্ত সভ্যতার ভিতর কবি অনুভব করেছেন বিধ্বংসী ঝঞ্ঝার গতিবেগ, যে প্রবল গতি স্রোতে আজ মানুষের ধর্মনীতি,

ন্যায়নীতি ও বহুযুগের সযত্নরচিত উন্নত সংস্কৃতির চিহ্নগুলি ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছে ঃ

বিশ্ব জুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে
অন্ধবেগে ঝঞ্ঝাবায়ু হুংকারিয়া আসে
ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া
ধর্ম আজ সংশয়েতে নত,
যুগযুগের তাপসদের সাধনধন যত
দানব-পদ দলনে হল গুঁড়া।

আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে মোহভঙ্গের পর শুধু এ সমস্ত কবিতাংশে নয়, আরো কোন কোন কবিতায় এবং সাময়িক পত্রেও এ ব্যক্তিত্ববিরোধী সভ্যতার অশুভময় পরিণতিকে ধিক্কৃত করেছেন কবি। অবশ্য এ সমস্ত কাব্যিক প্রকাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেগময় —এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

কিন্তু ১৯১২ ও ১৯১৬ সালে য়ুরোপ আমেরিকা ও জাপান ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তার নির্মোহ ও মননসমৃদ্ধ প্রকাশ ঘটে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পার্সন্যালিটি ও ন্যাশানালিজম্ নামক প্রবন্ধ গ্রন্থদ্বয়ে। এ দুই গ্রন্থের মননশীল প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বরূপ ও সমষ্টিসত্তার পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রয়াস পেয়েছেন। ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির বিরোধের মূল তত্ত্বটিকে স্বীকার করে নিয়েই কবি ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন পার্সন্যালিটি ও ইনডিভিডুয়ালিটি সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। ইনডিভিডুয়ালিটি বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সংকীর্ণ অহংবোধ দ্বারা প্রণোদিত। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিকাশ নেশনতন্ত্রে। সেজন্যে পাশ্চাত্যের আধুনিক ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদও স্বার্থান্বেষী—ব্যক্তিকে অভিভূত করে সমষ্টিবাদের প্রচণ্ডতায় প্রকাশিত। অপরপক্ষে পার্সন্যালিটির অভিব্যক্তি ঘটে মানুষের স্বার্থহীন ত্যাগের মধ্যে। এই

পার্সন্যালিটির বিকাশে মানুষের আত্মবোধ সম্পূর্ণ হয়। এই মহৎ আত্মবোধের পরিণতি বিশ্ববোধে। "এই আত্মবোধ বা বিশ্ববোধের বিপরীত বা এন্টিথিসিস হইতেছে নেশন-বোধ বা ন্যাশনালিজম—যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বা ইনডিভিডুয়ালিজম নেশনরূপে বৃহদায়তন দানবমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া জগতকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আত্মার বিকাশে মানবের মহত্ব ও দেহের প্রসারে তাহার বৃহত্ত্বতা বা স্থূলত্ব প্রকাশিত হয়।"

য়ুরোপ ভ্রমনের সময় মননশীল রবীন্দ্রনাথ দেখলেন জীবনের স্থূলতার উপাসক সে দেশবাসী আত্মার বিকাশ সাধনাকে উপেক্ষ করে ব্যক্তি ও জাতির সুখ সমৃদ্ধিকে বাড়িয়ে তোলবার নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সে দেশের মানুষের জীবন আবর্তিত হচ্ছে একটা কৃত্রিম সভ্যতার (রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে সভ্যতা বলে স্বীকার না করে অভিহিত করেছেন পাশ্চাত্ত্য কালচার বা সংস্কৃতি বলে) লৌহ যবনিকার অন্তরালে। যে প্রকৃত সভ্যতার প্রভাবে মানুষের মনে আসে মানবতার ধারণা সম্পর্কে উদার বিস্তৃতি, বিকাশিত হয়ে উঠে মানুষের অন্তরে ন্যায়নীতি ও ধর্মনীতি—সে সমস্ত মহৎ অনুভূতি পাশ্চাত্ত্য জবীন থেকে নিঃশেযে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এ কৃত্রিম ও স্থূল সভ্যতার অশুভ স্পর্শে। এ ভোগলোলুপ স্বার্থপর সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার সাধনায় একাগ্র হবার জন্যে তিনি আহ্বান করলেন তাই আধুনিক সভ্যনামধারী মোহমুক্ত মানুষকে। এ ধরণের সভ্য মানুষ আজ শুধু য়ুরোপে ব্যাপ্ত নয়, ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সে সমস্ত অংশেও যেখানে যান্ত্রিকতার প্রসার হয়েছে অব্যাহত। সীমাবদ্ধ জীবনদৃষ্টির অধিকারী এ ধরণের সভ্য মানুষকে রবীন্দ্রনাথ অভিহিত করেছেন political and the commercial man বলে। ভারতবাসী চিরদিনই আত্মার সাধনায় তৎপর। সে জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে উপদেশ দিয়েছেন। Complete man হবার জন্যে। তাঁর মননসমৃদ্ধ

'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থে তিনি ভারতবাসীকে উপদেশ দিয়েছেন নিম্নোক্ত সবল ভাষায় :

> We have felt its iron grip at the root of our life, and for the sake of humanity we must stand up and give warning to all, that this nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age, and eating into its moral vitality.

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনাকে ত্যাগ করে স্থূলতাধর্মী পাশ্চাত্ত্য যন্ত্রসভ্যতার কবলিত হলে ভারতবাসীর অবস্থাও হবে রবীন্দ্রনাথের মতে :

> Dressing our skeleton with another man's skin giving rise to external feuds between the skin and the bones at every moment.

ব্যক্তিত্ববোধ যান্ত্রিকতা সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে মননশীল চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের পার্সন্যালিটি ও ন্যাশানালিজম গ্রন্থে সে একই চিন্তার শিল্পরূপ দেখতে পাই 'মুক্তধারা' (১৯২২) ও 'রক্তকরবী' (১৯২৪) নাটকে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যধারায় এ দুইখানি নাটক স্বতন্ত্র চিন্তার প্রকাশে দীপ্যমান। প্রকৃতিপ্রেমিক কবির সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে আধুনিক জাগ্রত মনের জীবনচিন্তার সমন্বয়ে বিশেষ মূল্যসমৃদ্ধ হয়েছে এ নাটক দুইখানি। ১৯১২ ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের য়ুরোপ-আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতা স্পর্শকাতর কবিমনের উপর যে বেদনার ছায়া ফেলেছিল সে বেদনাই প্রবর্তনা এনে দিল এই বেদনাসুন্দর জীবনচিত্র অঙ্কনে। কবির দ্বন্দ্বহীন প্রকৃতিসম্ভোগে এবার এল প্রকৃত দ্বন্দ্ব। এ দুই নাটকে কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব-উদ্ভূত যে সুগভীর সৌন্দর্যপ্রীতি ও নিসর্গপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে তা প্রায় তুলনারহিত।

প্রকৃতির দেওয়া আলো-বাতাস-জলের উপর মানুষের সমান অধিকার। প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া মানুষ বাঁচতেও পারে না। কিন্তু বুদ্ধিজীবী মানুষ নিজের স্বার্থান্ধ অধিকারের সীমা বাড়াবার জন্য দুর্বলকে বঞ্চিত করেছে স্বভাব দত্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে। বুদ্ধিজীবীর এ প্রবঞ্চনা প্রবৃত্তিকে আরো তীব্র করেছে মনুষ্য-সৃষ্ট যন্ত্র। যন্ত্রশক্তির সহায়তায় বুদ্ধিজীবী মানুষ আজ স্পর্ধিত। যে স্পর্ধার বিকাশ সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধে—সে উৎকট জাতীয়তার প্রকাশ দেখেছিলেন কবি পাশ্চাত্ত্য দেশ ভ্রমণের সময়। আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষ যন্ত্রশক্তি ও সংঘশক্তির সাহায্যে প্রতিবেশী দুর্বল মানুষকে বঞ্চিত ও পীড়িত করে নিজের অধিকার বিস্তারে যে কিরূপ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তারই শিল্পরূপ মুক্তধারা নাটক।

মুক্তধারায় শুধুমাত্র মানবতার লাঞ্ছনার চিত্র নেই। তাই যদি থাকত তা হলে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এ জীবনচিত্র সামঞ্জস্যহীন হত। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার কবল থেকে মুক্তির ইঙ্গিতও তিনি নির্দেশ করেছেন এ সংকেতধর্মী নাটকে। প্রথমতঃ, জগতের নিপীড়িত জনসাধারণ যন্ত্রজীবীর ক্ষমতাদম্ভকে প্রতিহত করতে পারে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এখানে সনাতন ভারতীয় জীবনাদর্শ সচেতন ভাবে স্বীকৃত। দ্বিতীয়তঃ যে যন্ত্র মানুষের প্রাণকে আঘাত করেছে মানুষ সে অফুরন্ত প্রাণশক্তি দিয়েই যন্ত্রকে আঘাত করতে পারে। তা হলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জন-সাধারণের সহজ অধিকার হবে অব্যাহত। যন্ত্রসভ্যতার নিপীড়ন থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে উভয় পন্থাই যে আদর্শায়িত রূপ পেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবনচিন্তায় আদর্শ-অভিমুখিতা রবীন্দ্রমনের একটা বিশেষ ধর্ম। অতএব রবীন্দ্র-জীবনাদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পরবর্তী সংকেতধর্মী নাটক রক্তকরবীতে যান্ত্রিক সভ্যতার নিপীড়নের চিত্র আরও উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। মনীষীর মনীষার সঙ্গে এ

নাটকে গভীরভাবে যুক্ত হয়েছে সৌন্দর্যস্রষ্টা শিল্পীর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি। এ নাটকের প্রথম নামকরণ 'যক্ষপুরী'র ভিতর সংকেতধর্ম প্রবল নয়। পরবর্তীকালে কবি তাই সার্থকভাবে নাটকটির নাম দেন রক্তকরবী। এ নাটকের পটভূমিকা শুধু পাশ্চাত্ত্য শিল্পকেন্দ্র নয়, ভারতবর্ষের শিল্পকেন্দ্র সমূহের বীভৎস রূপও কবিমনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছে জীবনের অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্রাঙ্কনে। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা শ্রমজীবী মানুষের সমস্ত প্রাণরস নিঃশেষে নিংড়ে নিয়ে কি করে তাদের ব্যক্তিপরিচয়হীন করে তুলেছে, মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধকে ভুলিয়ে দিয়ে কেমন করে তাদের পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে—নিষ্কম্প হস্তে তার নিখুঁত ছবি এঁকেছেন মানবপ্রেমিক কবি। কিন্তু শুধুমাত্র জীবনের গ্লানির চিত্র এঁকেই কবির শিল্পপ্রয়াস সমাপ্ত হয়নি। জীবনের এই পঙ্কিল জীবন-প্রবাহের ঊর্ধ্বে যে এক অনুভূতিগ্রাহ্য সৌন্দর্যলোক আছে—সেদিকেও তিনি উন্মুখ করে তুলেছেন পাঠকের চিত্তকে এ নাটকে। পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকৃত সাধনা মুক্ত প্রাণচ্ছন্দের সাধনা—পার্সনালিটি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তিত্ব বিকাশকে বলেছেন Complete man। অবারিত বিশ্বের সৌন্দর্যস্পর্শই এনে দিতে পারে লোভ হিংসা দম্ভ ও পরপীড়ন প্রবৃত্তির মধ্যে সত্যিকারের জীবনমুক্তির ইঙ্গিত।

১৩৩২ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে স্বীয় অননুকরণীয় ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিশ্লেষণ করেছিলেন এ সংকেতধর্মী নাটকের ভাববস্তু। আধুনিক সভ্যজগতের মানুষকে তিনি বিভক্ত করেছেন দুই শ্রেণীতে : এক কর্ষণজীবী, দুই আকর্ষণজীবী। আকর্ষণজীবী মানুষ দানবীয় লোভের মোহে নিত্য নিয়ত কৃষিজীবী মানুষকে আকর্ষণ করছে শিল্পকেন্দ্রের দিকে। এর অনিবার্য ফল হল মানুষের জীবন ধারণের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র কৃষিপল্লীর উৎসাদন। দস্যু রত্নাকরের জীবনকাহিনীর মধ্যে দেখতে পেলেন কবি আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার জটিল সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত :

> রত্নাকর রাস্তায় ছিলেন দস্যু, তারপরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল।··· এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন, তখান আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল।

রামায়ণের রাম-রাবণ কাহিনীর মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন আধুনিক যন্ত্রযুগের বাস্তব ছবি :

> রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধ্ুর্য; পল্লবের মর্মর; আর একটিতে শান বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গ ধ্বনি।

সেজন্য এ যুগের মনীষী রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন, আধুনিক সমাজ ও সভ্যতাকে যান্ত্রিকতার বিষবাষ্প হতে বাঁচাতে হলে চাই প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নিবিড় স্পর্শ। সে সজীব স্পর্শের অভাবে নিপীড়িত শোষিত অগণিত জনসাধারণের চিত্ত আজ ক্ষুব্ধ। অসন্তোষের ধূমাগ্নির মধ্যে সভ্যতার জ্যোতির্ময় আলো আজ প্রায় নির্বাপিত। বর্তমান বিশ্বে সভ্যতাকে তার স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রয়োজন উৎপীড়িত ও উৎপীড়ক এ উভয় শ্রেণীর চিত্তে সহৃদয় মানবিক স্পর্শ। রক্তকরবী নাটকের নন্দিনী সেরূপ 'একটি মানবীয় ছবি। চারিদিকে পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।······মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়, মাটির উপর তলে যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।'

আধুনিক যন্ত্র যুগের সমস্যা সমাধানে কবি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এখানে আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন সর্বযুগের মানবতাবাদী মনীষীদের সঙ্গে।

রবীন্দ্র-মন ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা

রবীন্দ্র-মনের অসামান্য ব্যাপ্তি বিধানে প্রাচ্য জীবনাদর্শ ও সভ্যতার প্রভাব যেমন অপরিসীম তেমনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবও কম নয়। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্র-মনের বিকাশকে বিচিত্রধর্মী করেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মিশ্র এবং প্রাণবন্ত আদর্শ। জীবন ব্যাপী উপনিষদ্ বৌদ্ধ-দর্শন ও মধ্যযুগের সন্তদের সংস্কারমুক্ত এবং ভাবধর্মী জীবন প্রেরণাকে প্রাধান্য দিলেও যখনি রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সচল প্রবল বৃহৎ গতিবেগের সম্মুখীন হয়েছেন তখনি তাঁর গ্রহণশীল মন তাকে সাগ্রহে বরণ করে নিতে দ্বিধা করেনি। আবার পাশ্চাত্ত্য জীবনের প্রচণ্ড গতিবেগ যখন দানবীয় শক্তিতে মনুষ্যত্বকে পদদলিত করতে উদ্যত হয়েছে তখনি ভারতীয় ঐক্য-সাধনার মহৎ পূজারী রবীন্দ্রনাথ তীব্র ভাষায় সে অশুভ প্রয়াসকে ধিক্কৃত করেছেন। মননশীল রবীন্দ্রনাথের মতে জীবনের গতিবেগ যেমন সভ্যতাকে বিচিত্রধর্মী করে তেমনি স্থিতিশীল জীবন-চিন্তা মানব সভ্যতায় এনে দেয় অচঞ্চল গভীরতা। সত্যের অখণ্ড মূর্তি নিহিত থাকে সে গভীর জীবন-চিন্তার মধ্যে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিচিত্র প্রবাহের স্পর্শ যেমন রবীন্দ্র-মনের স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে সে মনকে করে তুলেছিল বিচিত্রধর্মী তেমনি প্রাচ্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত সত্যবোধ সে মনে এনে দিয়েছিল ভাবগভীরতা। এ সুগভীর সত্যবোধের প্রভাবেই এ যুগের অন্যতম মনীষী রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মর্মস্থলে অবাধে বিচরণ করেও সে সভ্যতার দ্বারা অভিভূত হননি। বরং আপাত-উজ্জ্বল এ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অভ্যন্তরে যে গোপন কলঙ্করেখা বিদ্যমান আছে সবল কণ্ঠে জগৎ সমক্ষে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তৎপর হয়েছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে স্বীকার করেও মানবাদর্শের দিক থেকে তার দোষ-দুর্বলতা প্রদর্শনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মননশীলতাই শুধু দীপ্যমান হয়ে উঠেনি—তাঁর মানবদরদী সুবিশাল হৃদয়ের পরিচয়ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা-প্রভাবিত বিশ্বের নির্যাতিত অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে বঞ্চিতদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল সহজাত। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথের ভারতপ্রেমকে সংকীর্ণ জাতীয়তা-প্রসূত দেশপ্রেম বলে আখ্যায়িত করা চলে না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল 'জাতীয়তা'র ভিতর তিনি যে প্রচণ্ড মানবতাবিরোধী অহংকারের উগ্র প্রকাশ লক্ষ্য করেছিলেন সে স্বার্থান্ধ জাতিপ্রেমই রবীন্দ্র-চিত্তকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি প্রবলভাবে বিমুখ করে তুলেছিল। উত্তর জীবনে এ বিমুখতাই রবীন্দ্র-মনকে প্রবৃত্ত করেছিল ভারত-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ রেখার অনুসন্ধানে। জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই একদিকে যেমন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার স্বার্থপরায়ণ রূপকে ধিক্কৃত করেছেন আর একদিকে তেমনি ভারতীয় সভ্যতার উদার রূপকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্র-মনের এ মোহভঙ্গ একদিনে সংগঠিত হয়নি। জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়ায় এ মোহভঙ্গ ঘটেছে বলে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী দানবীয় রূপ অত্যন্ত নগ্নভাবে জগতের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছিল। আঠারো বছরের তরুণ যুবক রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়ে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন একাশি বছরের অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পাশ্চাত্ত্য জীবনের যে:সৌন্দর্য-চঞ্চল রূপ একদিন তরুণ কবির দৃষ্টিকে করেছিল মোহাচ্ছন্ন সে রূপের অভ্যন্তরে যে বিদ্বেষের তীক্ষ্ণ বিষদন্ত লুকিয়ে থাকতে পারে তা সেদিন ছিল তাঁর ধারণারও অতীত। জীবনের প্রান্তসীমায় এসে সে 'দস্তুর

সভ্যতা'র হিংস্র-কুটিল রূপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মোহ-মুক্ত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তা তাঁকে সর্বযুগের সত্যদ্রষ্টা বিবেকবান মনীষীদের মধ্যে একটি অগ্রগণ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে নিশ্চয়ই।

রবীন্দ্র মনের বিকাশ রেখা অনুসরণ করতে গেলে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সর্বব্যাপক রূপ সম্পর্কে কবির স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক। সে ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। এ-জাতীয় গ্রন্থের সীমাবদ্ধ পরিসরে সে ইতিহাসের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। স্বল্প কথায় সে পরিচয়কে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হচ্ছে এ অধ্যায়ে।

ইংলণ্ডের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তরুণ মনের (ইংলণ্ড প্রবাসী রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র আঠারো) নব-পরিচয়ের স্বাক্ষর রয়েছে ১২৮৬ সালের বৈশাখ থেকে ১২৮৭ সালের শ্রাবণ পর্যন্ত ভারতী-পত্রিকায় ক্রম-প্রকাশিত পত্রগুচ্ছের মধ্যে। ১২৮৮ সালে 'য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের' এ পত্রগুচ্ছ 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'—এ নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কাব্যে একটি আশ্চর্য লাইন লিখেছিলেন: 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।' ইংলণ্ডের প্রাণচাঞ্চল্যপূর্ণ জীবনযাত্রাও তেমনি তরুণ রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে হঠাৎ আলোর ঝলকানি নিয়ে আবির্ভূত হয়ে তাঁর চিত্তে এনে দিয়েছিল একটি সানন্দ প্রফুল্লতা। ব্রাইটনে বৌদির স্নেহচ্ছায়ায় বাসকালে নাচ-গান পার্টির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে আনন্দময় দিনগুলি কেটেছিল তার মধ্যে ইংলণ্ডের সঙ্গে পরিচয়ের কোন নিবিড়তা বা গভীরতা ছিল না। এ যুগে রবীন্দ্র-মন ছিল সফরীর চঞ্চল ছন্দে নৃত্যরত।

এর পর অবশ্য লণ্ডনের য়ুনিভারসিটি কলেজে স্বল্পকাল

পাঠাভ্যাস-কালে অধ্যাপক হেনরি মর্লির সংস্পর্শে এসে ইংরেজী সাহিত্যের রসসম্ভোগের সঙ্গে রবীন্দ্র-মনের সংযোগ ঘটল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিশিষ্ট সম্পদের সঙ্গে এ নব-পরিচয় রবীন্দ্র-মনকে ক্রমশঃ আকর্ষণ করেছে। বস্তুতপক্ষে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্র-মনের উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল সে দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিক-সম্পর্ক।

এ যুগে পাশ্চাত্ত্য সংস্পার্শ রবীন্দ্র-মনে যে ভাবাবেগের সৃষ্টি করেছে সে হল মুখ্যত নতুনত্বের প্রতি একটি প্রবল মোহ। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্তর্লোকে প্রবেশ করবার অভিজ্ঞতা বা সামর্থ্য অপরিণত-বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ তখনও অর্জন করেন নি। সেজন্য সে দেশের এক শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতা-প্রীতিই হোক কিংবা ইংলণ্ডীয় সমাজের স্ত্রী-স্বাধীনতাই হোক—যা তিনি দেখছেন সবই তাঁর ভাল লাগছে। সব চাইতে মুগ্ধ করেছে তরুণ কবিকে সে দেশের স্ত্রী-স্বাধীনতা। ভারতীর পৃষ্ঠায় পাশ্চাত্ত্য স্ত্রী-স্বাধীনতার গুণগান করতে গিয়ে ভারতীয় সমাজে স্ত্রী জাতির মর্যাদার প্রশ্ন নিয়ে প্রগল্‌ভ উক্তি করতেও তিনি দ্বিধা করছেন না:

> মেয়ে পুরুষে একত্রে মিলে আমোদ প্রমোদ করাই তো স্বাভাবিক!··· মানুষে মানুষে আমোদ প্রমোদে মেশামেশি করাকে একটা মহাপাতক সমাজ বিরুদ্ধ, রোমাঞ্চকর ব্যাপার করে তোলা শুধু অস্বাভাবিক নয়, তা অসামাজিক, সুতরাং এক হিসেবে অসভ্য।··· একদল বুদ্ধিমান বিবেচনা-শক্তিবিশিষ্ট জীবকে কত শত শতাব্দী হতে নির্দয় লোকাচারের শাসন পীড়ন দমন বন্ধন করে করে পোষা জন্তুর চেয়ে নির্জীব বশীভূত সংকুচিত সংকীর্ণমন করে তোলা হয়েছে, সে একবার কল্পনা করে দেখতে গেলে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। কোন একজন মানুষের 'পরে এ রকম সম্পূর্ণ একাধিপত্য করা—একজন বুদ্ধি ও হৃদয় বিশিষ্ট মানুষকে জন্তুর মতো, এমন-কি, তার চেয়ে অধম একটা ব্যবহার্য জড় পদার্থের মতো সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রয়োজনের জিনিষ করে তোলা ···এ সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও

পাপ নয়ঃ সমাজের অর্ধেক মানুষকে পশু করে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে প্রচার করো তা হলে তাঁর নামের অপমান করা হয়।…

স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথের এ সমস্ত প্রগল্‌ভ উক্তির যোগ্য প্রত্যুত্তর দেন তৎকালীন ভারতী সম্পাদক প্রজ্ঞাবান দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্রষ্টব্য, ভারতী. ১১৮৬ অগ্রহায়ণ)। রবীন্দ্রনাথের উক্তির তুলনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের মন্তব্য ছিল নির্মোহ যুক্তিপূর্ণঃ

ইংলন্‌ডে গেলেই বঙ্গীয় ইউরোপ-যাত্রীদের চর্মচক্ষে কী-যে এক বিস্ময়জনক ছবি পড়ে, তাহাতে করিয়া তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়; ইংলন্‌ডের জলবায়ু স্বতন্ত্র, ইংলন্‌ডের পুরাবৃত্ত স্বতন্ত্র, ইংলন্‌ডের জনসমাজের রুচি স্বতন্ত্র—ইংলন্‌ডীয়প্রাকৃতির উপর ইংলন্‌ডের সমাজ প্রতিষ্ঠিত—ইউরোপ-যাত্রী বঙ্গ যুবকদের এ জ্ঞানটি সহসা বিলুপ্ত হইযা যায়।… ইংলন্‌ডের আর-আর স্বাধীনতার সঙ্গে ইংলন্‌ডোচিত স্ত্রী-স্বাধীনতা ইংলন্‌ডেই শোভা পায়; তেমনি যদি আমাদের দেশোচিত স্ত্রী-স্বাধীনতা নৈসর্গিক শোভায় সমুত্থিত হয় তবেই ভালো।… অন্তপুর একটা কারাগার, অন্তঃপুরবাসিনীরা একটা বোবা জানোয়ার, পিতামাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা দাসত্ব, এ-সকল ইংরাজি বাঁধি বোল ইংরাজের মুখেই শোভা পায়—বিশেষতঃ সেই-সব মানোয়ারীই বলো আর জানোয়ারই বলো তাঁহাদের মুখে যাঁহারা নারিকেলের ছোবড়া ভক্ষণ করিয়া তাহার অবশিষ্ট অংশকে আঁঠি মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন।… একজন বাঙালীকে যদি শিখাইতে হয় যে অন্তপুর গৃহিনিদিগের কারাগার নহে, কিন্তু তাঁহাদের সাধের নিকেতন—পিতামাতার প্রতি পুত্রের নম্র ব্যবহার ভক্তি ও ভালোবাসার নিদর্শন, তাহার মধ্যে কঠোরতা কিছুমাত্র নাই—স্ত্রীলোকেরা যে যে-সে পুরুষের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ করে না সে কেবল এই জন্য যে, তাহাদের পবিত্র গার্হস্থ্যভাব আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক যত্নের ধন—এই সকল যৎপরোনাস্তি দুরূহ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব যদি বাঙালীকে শিক্ষা দিতে হয় তবে নতুন একটা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি না করিলে আর চলে না।

শুধুমাত্র ভারতীর উক্ত সংখ্যায় নয় পরবর্তী আরো কোন কোন সংখ্যায় য়ুরোপীয় সংস্কার আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কার-সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধ আরো বেশ কিছুকাল চলতে থাকে। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' সে মসীযুদ্ধের সরস বিবরণ একত্র সংগৃহীত হয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার দৃষ্টিভঙ্গী দ্বিজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় কত অগভীর ছিল দুই অসমবয়স্ক ভ্রাতার মনোভাবের পার্থক্য থেকে তা সহজেই বোঝা যায়। এ মসীযুদ্ধের সরস বিবরণ পড়ে পাঠকের মনে একটি জিনিষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে যে—সুগভীর সাজাত্যবোধের প্রেরণায় দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন তীক্ষ্ণ যুক্তি তর্কের বর্মে আবৃত হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির দেশ-কালোপযোগী প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লাগা' রবীন্দ্রনাথ তখন সগর্বে য়ুরোপীয় সমাজ-সংস্কৃতির গুণপনা ব্যাখ্যায় আনন্দিত। 'আমাদের পরিবারে পরকে আপন করে নিতে হয়, কেন না আপনার সকলে পর'—ভারতীর উদ্দেশে লিখিত নবম পত্রের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ যখন এ হঠকারিতা পূর্ণ উক্তি করেন তখন বোধ হয় স্থিতধী দ্বিজেন্দ্রনাথেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। ভারতীর সম্পাদকীয় মন্তব্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ এ উক্তির সমালোচনায় লিখেছিলেন: 'বিলাত থেকে ফিরে এলে অধিকাংশেরই এরূপ দশা ঘটে।'

রবীন্দ্রনাথ উত্তর জীবনে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'র সাহিত্যিক মূল্যের স্বীকৃতি দিলেও ঐতিহাসিক মূল্যের স্বীকৃতি দেননি। কিন্তু আমাদের মনে হয় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্র-মনের ক্রমবিকাশের ধারায় এ পত্রগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। সুদীর্ঘ পঞ্চান্ন বৎসর পরে এ গ্রন্থখানিকে কাট ছাট করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন (১৯৩৬)। এ গ্রন্থখানি প্রিয়বন্ধু চারুচন্দ্র দত্তকে উৎসর্গ করতে গিয়ে কবি লেখেন:

হরিণ-বালকের প্রথম শিঙ উঠলে তার যে চাল হয় সেই

উগ্র চাল প্রথম কৈশোরের। বালক আপন বাল্যসীমা পেরোবার সময় সীমা লঙ্ঘন করতে চায় লাফ দিয়ে!......এই সময়েই যাত্রা করেছি বিলেতে। চিঠি যেগুলো লিখেছিলুম তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে খাঁটি স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে। বাঙালির ছেলে প্রথম বিলেতে গেলে তার ভাল লাগবার অনেক কারণ ঘটে। সেটা স্বাভাবিক, সেটা ভালোই। কিন্তু কোমর বেঁধে বাহাদুরি করবার প্রবৃত্তিতে পেয়ে বসলে উল্‌টো মূর্তি ধরতে হয়!...সেটা যে চিত্ত দৈন্যের লজ্জাকর লক্ষণ এবং অর্বাচীন মূঢ়তার শোচনীয় প্রমাণ, সেটা বোঝবার বয়স তখনও হয়নি।

সাহিত্যে সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর থেকে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র উপর লেখকের ধিক্কার জন্মালেও আরও একটি দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এ বইখানির মূল্য স্বীকার করেছেন। প্রথম বারে কবির এ ইংলণ্ড-বাস ঠিক বুড়ি-ছোওয়া গোছের ব্যাপার ছিল না। ইংলণ্ডীয় পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলে সে দেশের সমাজের ভদ্র ও বিলাসিনী রূপের যে নিবিড় পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন পরবর্তী ভ্রমণগুলিতে তা সম্ভব হয়নি। অন্ধ অনুকরণপ্রিয় ইঙ্গবঙ্গ সমাজের হাস্যকর জীবন-পরিচিতির মধ্যেও রবীন্দ্র-মনের এ সময়কার প্রবৃত্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বারো বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ তখন পূর্ণ যুবক, বয়স উনত্রিশ। প্রথম বারের য়ুরোপ-যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষালাভ—এবার নিছক ভ্রমণ। প্রথম যৌবনের অহংকৃত স্পর্ধা কবি-মন থেকে হয়েছে তখন অন্তর্হিত। স্বদেশ চিন্তা ও সাজাত্যবোধের প্রাথমিক বিকাশে রবীন্দ্র-মন হয়ে উঠেছে মননশীল। এবার বিলাত যাত্রায় সাজাত্যবোধের অভ্রান্ত লক্ষণ হিসাবে দেখা যায় বিলাতি পোষাক-পরিচ্ছদ বর্জন করে তিনি স্বদেশীয় পোষাককে গ্রহণ করেছেন। এ পোশাকে ইংলণ্ডে গেলে কোন কোন মহলে হাসি ঠাট্টার কারণ হতে পারেন

এ কথা জেনেও তিনি সাজাত্যভিমান বর্জন করতে পারেননি। এবার য়ুরোপ যাত্রার ও য়ুরোপ প্রবাসের যে নোটগুলি তিনি রাখেন 'ইউরোপ যাত্রীর ডায়ারি' নামে দুখণ্ডে তা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৯১ ও ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড প্রবাস ছিল স্বল্পস্থায়ী। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর তিনি দেশের টানে য়ুরোপ থেকে প্রত্যাবৃত্ত হন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্র-মনে যে জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয় তা তিনি একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করে পাঠ করেন চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ একটি অধিবেশনে (১৬ই বৈশাখ, ১২৯৮॥১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ)। এ প্রবন্ধটি য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারীর ভূমিকা হিসাবে পরে গ্রন্থবদ্ধ হয়।

যে মুগ্ধ দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ বারো বৎসর আগে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে দেখেছিলেন দ্বিতীয়বার বিলাত ভ্রমণের ফলে তাঁর সে মোহাচ্ছন্ন অবস্থা অনেকটা কেটে গেছে। জাহাজেই হোক বিলিতি সমাজেই হোক রবীন্দ্র-জীবনে এ সময় এক একটা ঘটনা আসছে আর বিচারশীল দৃষ্টি ও অনুভাবনার সাহায্যে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করবার দুরূহ প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন। জাহাজে রোগক্লান্ত অবস্থায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে রবীন্দ্র-মনে নতুন প্রশ্ন জাগ্রত হয়েছে। খুঁটিয়ে দেখে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন পাশ্চাত্ত্য জীবনের লক্ষ্য সুখ আর প্রাচ্য জীবনের লক্ষ্য সন্তোষ। সুখ দুর্বলের দ্বারা লভ্য হতে পারে না—কারণ 'সুখ বলসাধ্য, সুখ দুঃখসাধ্য।......য়ুরোপ মনুষ্যের নব নব অভাব সৃষ্টি করে সেইটাকে মোচন করাকে সুখ বলে, আমরা মনুষ্যের ক্ষুধা তৃষ্ণা চিরসঙ্গী আজন্ম-অভাবগুলিকেও খোরাক-বন্ধ ও অন্যান্য কৌশল-দ্বারা হ্রাস করে বসে থাকাকেই সন্তোষ বলি।'

পরিণত চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য-জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সন্তোষকে সুখের উপরে স্থান দিয়েছেন। এ যুগে রবীন্দ্র-মনে সে প্রত্যয় তখনও জন্মায়নি। ভারতীয় সন্তোষ-প্রবৃত্তির প্রতি

রবীন্দ্র-মনে এখনও একটা করুণামিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব। ইংরেজের কর্মচঞ্চল জীবনে সুখ সন্ধানের মধ্যে যে একটি প্রবল উত্তেজনা আছে তার কাছে ভারতীয় জীবনের নিবৃত্তিমূলক সন্তোষ সন্ধান অত্যন্ত নিষ্প্রভ মনে হয়েছে রবীন্দ্র-মনের কাছে।

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে যৌবনের মোহাঞ্জন তখনও সতেজ। সেজন্য স্যাভয় থিয়েটারে গীতিনাট্য অভিনয় দেখে তাঁর মনে হচ্ছে—'যেন হঠাৎ এক সময়ে একটা উন্মাদকর যৌবনের বাতাসে পৃথিবী জুড়ে সুন্দর নরনারীর একটা উলট-পালট ঢেউ উঠেছে—তাতে আলোক এবং বর্ণচ্ছটা, সংগীত এবং উৎফুল্ল নয়নের উজ্জ্বল হাসি সহস্র ভঙ্গীতে চারিদিকে ঠিকরে পড়ছে।' লণ্ডনের রাস্তায় 'নবনীর মত সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা এবং দীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট নির্মল নীল নেত্র' দেখে প্রবাসী রবীন্দ্রনাথের পথকষ্ট দূর হয়ে যায়। সগর্বে এ কথা প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধা করেন না 'ঈফেল স্তম্ভের চতুর্থ চূড়াও আমার তেমন আশ্চর্য বোধ হয় না, একখানি সুন্দর মুখের সুমিষ্ট হাসি যেমন লাগে।' কিন্তু কনককেশিনী নীলাব্জ-নয়না কোন পান্থ-সুন্দরী যখন তাঁর গাত্রবর্ণের দিকে লক্ষ্য করে বিদ্রূপের হাসি হাসে তখন তার হৃদয়হীন বর্বরতা কবির কাছে অসহ্য বোধ হয়। মনে হয় এ বর্ণ-বিদ্বেষ য়ুরোপীয় সমাজের মজ্জাগত প্রবৃত্তি।

সাহিত্যের মাধ্যমে যে য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় ঘটে সে হল 'আইডিয়াল' য়ুরোপ। য়ুরোপে কিছুকাল বাস করে সে দেশীয় সমাজের অন্তর্লোকে প্রবেশ না করলে সে দেশের প্রকৃত রূপের সঙ্গে পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। স্বল্প সময়ের জন্য য়ুরোপ প্রবাসে মানুষ দেখে তার গতি কোলাহল ও সমারোহের দিকটা—যা মানুষের মনকে শ্রান্ত করে। এবারকার স্বল্পকালস্থায়ী ইংলণ্ড প্রবাসে সে দেশের প্রচণ্ড গতিবেগ রবীন্দ্রনাথের মনকেও শ্রান্ত করে তুলেছিল। সেজন্য ১৮৯০ সনের ৯ই অক্টোবর তিনি দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন।

এবারকার স্বল্পকাল ইংলণ্ড-প্রবাসে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির যে আর একটি দিক রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল সে হল সে দেশীয় সঙ্গীত। সে সঙ্গীতের সুরকে এ দেশীয় সুরের সঙ্গে মিশিয়ে নিজের রচিত সঙ্গীতে তিনি যে বৈচিত্র্য আনেন তা সকলেই জানেন।

জাহাজে দেশে ফিরবার সময় অহংকৃত গোরা দম্পতির ভারতবর্ষ-বিদ্বেষ রবীন্দ্রনাথের সাজাত্যবোধকে গভীর ভাবে আহত করল। অপমানিত জাতের লোক হয়ে ইংরেজের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বা তাদের সঙ্গে হেসে কথা কইতেও তাঁর ঘৃণা বোধ হতে লাগল। শাসক জাতির দর্পিত মনোভাবের প্রতি রবীন্দ্র-মনের এ বিরূপ মনোভাব ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হয়ে পরবর্তীকালে তাঁর বহু গদ্য পদ্য রচনায় শক্তি এনে দিয়েছে।

১৮৯০ সনের ২২শে আগষ্ট ভারতবর্ষ থেকে যাত্রা করে সে বৎসরেরই ৩রা নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরেন। এবার মাত্র দু মাসের কয়েকটি দিন বেশী তিনি ভারতবর্ষের বাইরে ছিলেন। কিন্তু এ স্বল্প প্রবাস রবীন্দ্র-মনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সম্পর্কে যে মননশীল ভাবনা জাগ্রত করল রবীন্দ্র-জীবনে ছিল তা অভূতপূর্ব। বলা বাহুল্য এ ভাবনার উৎসে ছিল এবারকার পাশ্চাত্ত্য জীবন-স্পর্শ।

য়ুরোপ থেকে ফিরবার পর উত্তরবঙ্গে জমিদারী পরিদর্শনের অবকাশ মুহূর্তে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্র-মনে যে জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়েছিল ১৬ই বৈশাখ ১২৯৮ (১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ) তারিখে সে চিন্তাধারাকে তিনি উপস্থিত করেন চৈতন্য লাইব্রেরীর একটি বিশেষ অধিবেশনে—কলকাতার জ্ঞানী-গুণীদের সামনে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশ বৎসর।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এখানে ঐতিহাসিক ও যুক্তিবাদী। বৃহত্তর জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ শান্ত জীবন যাত্রার সাহায্যে একটি সুষ্ঠু জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিল। ঐতিহাসিক বিবর্তনের অনিবার্য পরিণামের

ফলে সে স্থিতিশাল ভারতবর্ষ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রচণ্ড গতিশীলতার সম্মুখীন হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় ভারতবর্ষ কোন জীবনাদর্শকে গ্রহণ করবে—এ প্রশ্ন রবীন্দ্র-মনকে আলোড়িত করেছে। স্থিতিশীল জীবনাদর্শকে ভারতীয় জীবনে অক্ষুন্ন রাখার মানেই হল বর্তমান জীবনদ্বন্দ্বে নিশ্চিত পরাজয়কে বরণ করা। কিন্তু য়ুরোপীয় জীবনের গতিশীল আদর্শ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে যেরূপ সংঘাত-মুখর করে তুলছে তাতে সে আদর্শ গ্রহণ করতেও ভয় হয়।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জীবনের প্রবল গতিবেগ আমাদের জীবনের ভিত্তিকে পর্যন্ত যেভাবে সজোরে আন্দোলিত করেছে তাতে সে ভাব -বিপ্লবকে অস্বীকার করে আধ্যাত্মিক আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখা মূর্খতা। জাবনের গতিবেগ নবীনতারই ধর্ম। পাশ্চাত্ত্য জীবনের সে ধর্মকে অস্বীকার করা মানেই হল প্রাচীন সংস্কারের অনুগত হয়ে জড় জীবন যাপন করা। এতে আধুনিক গতিশীল বিশ্বসমাজে জাতি হিসেবে ভারতবাসীর অস্তিত্ব রক্ষাও কঠিন হবে।

আসলে আধুনিক ভারতবাসী মুখে প্রাচীনত্বের যতই বড়াই এবং য়ুরোপের নবীনত্বের যতই নিন্দা করুক না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতি পদে তারা পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু অনুকরণের সাহায্যে কোন জাতি বড় হতে পারে না। মনের সমস্ত দ্বিধা ও নিশ্চেষ্টতাকে পরিহার করে ভারতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সবল সচল নবীন রূপকে জীবনে অনুভব করবার এবং স্বচ্ছন্দে বরণ করে নেবার সময় উপস্থিত হয়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছেন। আধুনিক জগৎব্যাপারের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে না পারলে বিশ্বসমাজে ভারতবাসীর বিলুপ্তি যে অসম্ভাবী সেকথাও অননুকরণীয় ভঙ্গীতে দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি রবীন্দ্রনাথ ঃ

এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে সেইখান

হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ, তুমিই কেবল একলা থামবে, আর কেউ থামবে না। জগৎ প্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি চলতে না পারো তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার উপরে এসে আঘাত করবে—একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে কিংবা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও—পৃথিবীর এই প্রকার নিয়ম।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ যখন জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল তখন হয়তো বা ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক বিলাসিতার অবকাশ ছিল। কর্ম-চঞ্চল পাশ্চাত্ত্যের নিকট-সম্পর্কে এসে ভারতবাসী এখনও যদি সে বিলাসিতাকে জীবনে প্রাধান্য দেয় তাহলে জাতি হিসেবে আধুনিক জগতে প্রতিষ্ঠালাভ কখনও সম্ভব হবেনা। সুতরাং ভারতবাসীর—

বোঝা উচিত এখন আমরা যে সংসারের মধ্যে সহসা এসে পড়েছি এখানে প্রাণ এবং মান রক্ষা করতে হলে সর্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার বিচার নিয়ে খুঁত খুঁত করে, বসনের অগ্রভাগটি তুলে ধরে, নাসিকার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত করে, একান্ত সন্তর্পণে পৃথিবীতে চলে বেড়ালে চলবে না—যেন এই বিশাল বিশ্ব-সংসার একটা পঙ্ককুণ্ড, শ্রাবন মাসের কাঁচা রাস্তা, আর্যগণের চরণ-কমলতলের অযোগ্য। এখন যদি প্রতিষ্ঠা চাও তো চিত্তের উদার প্রসারতা, সর্বাঙ্গীন নিরাময় সুস্থভাব, শরীর ও বুদ্ধির বলিষ্ঠতা, জ্ঞানের বিস্তার এবং বিশ্রামহীন তৎপরতা চাই।

যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে নিষ্ক্রিয় মনে করে এক শ্রেণীর দেশবাসী আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় তন্দ্রাচ্ছন্ন তাদের সে সভ্যতা-স্বপ্নও যে কাল্পনিক—মহাভারতীয় জীবন ধারার মননশীল বিশ্লেষণের সাহায্যে তা সপ্রমাণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বললেন আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ছিল জীবনের সর্বস্তর-স্পর্শী বলিষ্ঠ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর। যখন আমরা আর্যামির বড়াই করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার বিচার নিয়ে

সঙ্কুচিত জীবন যাপন করি তখন আমরা সে বলিষ্ঠ জীবনবোধের কথা ভুলে যাই ঃ

> এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজবিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। সে সমাজে একদিকে লোভ হিংসা ভয় দ্বেষ অসংযত অহংকার, অন্যদিকে বিনয় বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদার মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্য চরিত্রকে সর্বদা মথিত করে জাগ্রত করে রেখেছিল।...তখনকার সমাজ ভালোয়-মন্দয় আলোকে-অন্ধকারে জীবন লক্ষণাক্রান্ত ছিল; মানব সমাজ চিহ্নিত বিভক্ত সংযত সমাহিত কারুকার্যের মতো ছিল না, এবং সেই বিপ্লব-সংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানব বৃত্তির সংঘাত-দ্বারা সর্বদা জাগ্রত শক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নত মস্তকে বিহার করত।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রবল গতিবেগ ও বলিষ্ঠতার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে মহাভারতের নতুন ব্যাখ্যা সংযোজিত করলেন। মহাভারতের বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ জীবনের গতি যে একটি শান্ত সৌম্য বৈরাগ্যের দিকে—এ সত্যকে তিনি সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন। আসলে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বীর্যবান বলিষ্ঠতার দিকটাই এ সময় রবীন্দ্র-মনকে আকর্ষণ করেছিল বেশী। সেজন্যই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এ অভিনব ব্যাখ্যা-প্রয়াস।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বলিষ্ঠতার দিকটি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করলেও সে সভ্যতার ত্রুটির দিকটিও এ সময় থেকে রবীন্দ্র-মনে ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়ে উঠছে—এটাই সৌভাগ্যের বিষয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তুলনামূলক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ এ সময় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দোষ-দুর্বলতার কারণও বিশ্লেষণ করেন। এ আলোচনায় তিনি বলেন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা যতই বেগবান ও বলিষ্ঠ হোক—সে সভ্যতা স্বার্থান্ধ। সে সভ্যতা মুষ্টিমেয় লোকের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য মনুষ্য

সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে নির্মম ভাবে পেষণ করছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার এ স্বার্থপর রূপ সম্পর্কে রবীন্দ্র-মনে এ যুগে যে চিন্তা বীজাকারে উপস্থিত হয়েছে পরবর্তীকালে 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থে তার পূর্ণ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়।

ইতিপূর্বেকার বিলাত যাত্রায় পাশ্চাত্ত্য স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে তরুণ রবীন্দ্রনাথ যে সোৎসাহ মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন তাও ক্রমে ক্রমে ক্ষীয়মান হয়ে এলো কবি-মনে। এবার কবির মনে হল, যে স্ত্রী-স্বাধীনতা নারী-মনের সহযোগিতার ভাবকে বিনষ্ট করে নারীকে জীবনের ক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিনী করে তোলে সে স্বাধীনতা কখনও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না। 'ভালোবাসাহীন বন্ধনহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক।' স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে কবির বক্তব্য, স্ত্রী যদি শিক্ষিত সংস্কৃত হয়ে স্বামীর পার্শ্ব-বর্তিনী হয় তবেই সমাজসাম্য রক্ষিত হবে। তা নাহলে মনের দিক থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও একটি প্রবল জাতিভেদের সৃষ্টি হবে। স্বামীর সহমর্মিনী হওয়া চাই, আবার স্বামীর পার্শ্ববর্তিনী হওয়াও অবশ্য কর্তব্য—এ মনোভাবের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য সমাজদর্শের সঙ্গে প্রতীচ্য সমাজাদর্শের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন ঘটাতে চাইলেন।

১১ই জৈষ্ঠ ১৩১৯ (১৯১২ মে ২৪) তারিখে রবীন্দ্রনাথ যখন তৃতীয়বার সপরিবারে বিলাত যাত্রা করলেন তখন তাঁর বয়স বাহান্ন। স্বদেশে তখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত কবি, মণীষী লেখক এবং জীবনচিন্তা-শীল ভাবুক বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। পূর্বেকার মত শুধুমাত্র খেয়ালের বশে এবার তিনি য়ুরোপ যাত্রা করেননি—পাশ্চাত্ত্য জীবন মন সংস্কৃতি সভ্যতার সঙ্গে একটি সুগভীর পরিচয় স্থাপনই হল এ যাত্রার প্রধান লক্ষ্য। এবার ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রবাসকালে কবি যে মননশীল প্রবন্ধগুলি রচনা করেন ১৩১৯ সালের ভারতী, প্রবাসী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সেগুলি মুদ্রিত হয় এবং ভাদ্র ১৩৪৬ (ইংরেজী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) 'পথের সঞ্চয়' নামে গ্রন্থবদ্ধ হয়। এ

প্রবন্ধগুলিতে দেখা যায় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিণত মনের পরিচয় নিবিড়তর হয়েছে এবং সে পরিচয়ের আলোকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার রূপ কবি-মনে উজ্জ্বল রেখাপাত করেছে।

যে শ্রদ্ধাশীল চিত্ত নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেবার বিলাত যাত্রা করেন তার অভ্রান্ত পরিচয় আছে পথের সঞ্চয়ের অন্তর্গত 'যাত্রার পূর্বপত্রে'। শান্তিনিকেতনের আশ্রম বালকদের নিকট তিনি তাঁর এ বিলাত যাত্রাকে তুলনা করেন তীর্থ যাত্রার সঙ্গে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা শুধুমাত্র বস্তুগত, তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কোন প্রকার প্রকাশ নেই বলে যারা মনে করেন তাদের সে মত যে কত ভ্রান্ত টাইটানিক দুর্ঘটনার সময় দুর্বলকে রক্ষার জন্য কোন কোন ইংরেজের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা তিনি সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছেন:

> আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোন যোগ নাই? এটা কি ধর্মবলেরই একটা লক্ষণ নহে? আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জনসঙ্গ বর্জন করিয়া শুচি হইয়া থাকে এবং নাম জপ করে, আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মানুষকে বীর্য দান করে না?
>
> যুরোপে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, জ্ঞানের জন্য, প্রেমের জন্য, হৃদয়ের স্বাধীন আবেগে, সেই দুঃখকে, সেই মৃত্যুকে আমরা প্রতিদিনই বরণ করিতে দেখিয়াছি।

ব্যক্তিগত জীবনে মানবতার সাধনায় যে সমস্ত দুঃখব্রতী য়ুরোপীয় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সেদিন দুজনের নাম উল্লেখ করেন রবীন্দ্রনাথ: সুইডিস হ্যামারগ্রেন এবং আইরিশ মার্গারেট নোবেল (ভগিণী নিবেদিতা)। কিন্তু এঁরা যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী য়ুরোপীর সমাজের ব্যতিক্রম সেকথা সেদিন রবীন্দ্রনাথের মনে আসেনি। রবীন্দ্র-মনের উপর পাশ্চাত্ত্যের মহত্ত্বের দিক তখনও উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করছে।

সে সভ্যতার স্বার্থান্ধ হিংস্র কুটিল প্রবৃত্তি সমস্ত বিশ্বব্যাপী যে মানবতার চরম লাঞ্ছনা ঘটিয়েছে সেদিকে রবীন্দ্র-মন তখনও আকৃষ্ট হয়নি। বরং দুর্বল জাতির প্রতি য়ুরোপীয় সবল জাতির অত্যাচারকে তিনি ব্যতিক্রম বলেই মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, সে দেশে গ্যায়-ধর্মের যেমন ব্যাভিচার দেখা গিয়েছে তেমনি তার বিরুদ্ধে ধিক্কার এবং ভর্ৎসনার বাণীও উত্থিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় পাশ্চাত্ত্য দেশে জাতীয় স্বার্থে আঘাত লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই মানবতার বাণী ক্ষীণকণ্ঠ হয়ে যায়। বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে কবি যখন য়ুরোপের এ প্রবৃত্তির পরিচয় পেয়েছেন তখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি তাঁর পর্বত-প্রমাণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভিত্তি প্রবলভাবে নড়ে উঠেছে। সে প্রসঙ্গ পরে আলোচ্য।

এবারে রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য হল সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা। সমুদ্র-যাত্রায় জাহাজে বসেই য়ুরোপীয় জাতীয় জীবনের বৃহৎ শক্তি অনুভব করলেন চিন্তাশীল কবি। বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাভূত করে যন্ত্র আবিষ্কারের সাহায্যে য়ুরোপীয় সমাজ অতলান্ত সমুদ্রের মধ্যে অগণ্য যাত্রীর যে নিরাপত্তা বিধান ও আনন্দের আয়োজন করেছে তার ভিতর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সমুচ্চ সচল বৃহৎ রূপ প্রত্যক্ষ করলেন রবীন্দ্রনাথ। খেলা ও কাজকর্মে পাশ্চাত্ত্য জাতির সমান নিয়মনিষ্ঠা দেখে কবির মনে হয়েছে এ নিয়মনিষ্ঠাই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দৃঢ় বুনিয়াদ।

একুশ বৎসর পরে আবার লণ্ডনে এসে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন সে দেশের জীবনের গতিবেগ প্রবলভাবে বেড়ে গেছে। সে গতিবেগ শুধু জীবনের নয়—সভ্যতারও। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, মননের ক্ষেত্রে, সৃষ্টির জগতে য়ুরোপীয় সমাজের অভাবনীয় অগ্রগতি কবির বিস্মিত শ্রদ্ধা অর্জন করল। এবার ইংলণ্ডে জ্ঞানী-গুণী সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্র-মনের অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপিত হল। অধিকাংশ স্থলে সে পরিচয় স্থাপনে মধ্যস্থতা করলেন সুবিখ্যাত শিল্পী ও মনীষী রোটেনস্টাইন। রোটেনস্টাইনের

পল্লীভবনে উপস্থিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের লেখা গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ পড়তে দিলেন। কবির প্রতিভামুগ্ধ রোটেনস্টাইন তার কয়েকটি টাইপ-কপি পাঠালেন ব্রাড্‌লে, স্টপফোর্ড ব্রুক ও বাটলার য়েট্‌সের কাছে। এঁরা সকলেই রবীন্দ্রকাব্যে নতুন সুরের সন্ধান পাচ্ছেন বলে কবির কাব্য প্রতিভাকে অভিনন্দিত করলেন। ইণ্ডিয়া সোসাইটির পক্ষ থেকে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ *Song Offerings* ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়ে পাশ্চাত্ত্য হৃদয় জয় করল। সমকালীন জগতের শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার স্বীকৃতি রূপে সুইডিস একাডেমি থেকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পেলেন তিনি নোবল প্রাইজ। সমস্ত পাশ্চাত্ত্য জগতে একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ও বিপক্ষে নিন্দা ও প্রশংসার ঝড় বয়ে গেল।

কিন্তু এবারকার পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের সময় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পুরস্কার পাওয়াটাই রবীন্দ্র-মনের ক্রমবিকাশের ধারায় সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। উল্লেখ্য ঘটনা হল সে দেশের জ্ঞানী-গুণী সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়। বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল, এইচ. জি. ওয়েলস, অধ্যাপক লোয়েস ডিকিন্‌সন, ব্রাড্‌লে, স্টপফোর্ড ব্রুক, আইরিশ কবি বাটলার য়েটস্, ইংরেজ কবি মেসফিল্ড্, আরনেস্ট রীহ্‌স, মিস মে সিনক্লেয়ার, নেভিন্‌সন্, রটলস্টন্, এভেলিন আন্‌-ডারহিল, রবার্ট ট্রেভেলিন, ফক্‌স-ষ্ট্রাংওয়েস, তরুণ কবি এজরা পাউণ্ড, মানবপ্রেমিক সি. এফ্. এনড্রুস্, ডক্টর ও মিসেস হেরিংহাম, টমাস আর্নল্ড, রজার ফ্রাই, ডক্টর এফ. টমাস, রোলস্টন, হ্যাভেল প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় কবি-ভাবুক-শিল্পী-মনীষীদের সঙ্গে শুধু পরিচয় নয়—ভাববিনিময়ের ফলে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি আরো শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠলেন। ইংলণ্ডের যে সাহিত্য শিল্প এবং মনীষা যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই রবীন্দ্র-মনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল তার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতে সে শ্রদ্ধা যে আরো বৃদ্ধি পাবে সে তো খুবই স্বাভাবিক।

ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ট্রোকাডেরো হোটেলের সান্ধ্য-

সভায় ইংলণ্ডের জ্ঞানী-গুণীদের সম্বর্ধনার উত্তরে কবি যে মন্তব্য করেন তার ভিতর রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মিলন-স্বপ্নই সুস্পষ্ট ভাষা পেয়েছে :

আমি একটি শিক্ষালাভ করিয়াছি—এবং সহস্র মাইল পথ সেই শিক্ষা লাভের জন্য আমার আসা সার্থক—যে, যদিও আমাদের আচার ব্যবহার সমস্তই পৃথক তথাপি ভিতরে ভিতরে আমাদের হৃদয় এক।...প্রাচী প্রাচী এবং প্রতীচী ও প্রতীচী সন্দেহ নাই এবং ঈশ্বর না করুন যে ইহার অন্যথা হয়—তথাপি এই উভয়ই মিলিতে পারে। —না—সখ্যে, শান্তিতে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিচয়ে ইহারা একদিন মিলিবেই। ইহাদের ভিতরে প্রভেদ আছে বলিয়াই ইহাদের মিলন আরও সফল মিলন হইবে—কারণ সত্যকারের প্রভেদ কখনও বিলুপ্ত হইবার নয়—তাহা ইহাদের উভয়কে বিশ্বমানবের সাধারণ বেদিকার সম্মুখে এক পবিত্র বিবাহবন্ধনে মিলিত করিবার দিকেই লইয়া চলিবে।

মোটের উপর যে শ্রদ্ধাশীল মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এবার য়ুরোপ যাত্রা করেন সে মনের আলোকে পাশ্চাত্ত্য জীবন মন সভ্যতা-সংস্কৃতি—সব কিছুকেই একটু আদর্শায়িত দৃষ্টিতে দেখেছেন কবি। রবীন্দ্র-মনের এ মিলন-স্বপ্ন পরবর্তীকালে ব্যর্থতার মরুপ্রান্তরে মরীচিকার মত কিরূপে মিলিয়ে গিয়েছিল—তা আমরা পরে দেখব।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে অক্টোবর ইংলণ্ড থেকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রভূমি আমেরিকায় পৌঁছে দীর্ঘ ছয় মাস কাল সে দেশের বিভিন্ন সহরে কবি ভারতের মর্মবাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এ সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে রচেষ্টারে (Rochester, New York) উদার-ধর্মমতিদের সম্মিলন সভায় প্রদত্ত *Racc Conflict* বা জাতি-সংঘাতের উপর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত বক্তৃতাটি বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে খুবই উল্লেখযোগ্য। উল্লেখযোগ্য এজন্য যে পাশ্চাত্ত্য জাতি-সংঘাতের মধ্যেও কবি আদর্শায়িত দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে দেখতে পেয়েছেন বিবদমান জাতি-সমূহের মধ্যে ভবিষ্যৎ মিলনের মহান স্বপ্ন :

আজ যে সুসভ্য মানুষের সম্মুখে এই জাতি সংঘাতের সমস্যা উপস্থাপিত

হইয়াছে, ইহাতে আমাদের আনন্দিত ও উৎসাহিত হইবার কথা। বিশ্বমানবের চেতনার মধ্যে মানুষ যে নবজন্ম লাভ করিয়াছে, ইহাই এ যুগের সকলের চেয়ে গর্ব করিবার বিষয়...মনুষ্যত্বের মহা আহ্বান যখন সমুচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত, তখন মনুষ্যত্বের উচ্চতর প্রকৃতি কি তাহাতে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে !

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মিলনাত্মক প্রবৃত্তি সম্পর্কে কবির মহত্তর জীবন-স্বপ্ন বেশীদিন স্থায়ী হল না। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দেশে ফিরবার সাতমাস পরেই য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের রণদামামা বেজে উঠল (১৯১৪)। পাশ্চাত্ত্যের জাতিসমূহের মধ্যে এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সে দেশের সভ্যতার প্রতি কবির আবল্য-লালিত শ্রদ্ধাকে দিল ধূলিসাৎ করে। মহাযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বিজড়িত হয়েছিল। ১৯১৪ সনের ৪ঠা আগষ্ট থেকে ইংলণ্ডও সে মহাসংগ্রামে অংশ গ্রহণ করায় সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও বিশ্বসমরে জড়িয়ে পড়ল। মনুষ্যত্বের অবলোপকারী এ যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কবি অনুভব করলেন পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের মধ্যে তীব্র সাজাত্যবোধ এবং তার অনুষঙ্গী পরজাতি বিদ্বেষই হল এ ধ্বংসযজ্ঞের মূলে। ১৩১১ সনের শ্রাবণ মাসে (১৯১৪) শান্তিনিকেতনে সাপ্তাহিক উপাসনায় কবি এ জাতি সংগ্রামের কারণ বিশ্লেষণ করলেন ঃ

অনেকদিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। এক-এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠবার জন্য চেষ্টা করছে। বর্মে-চর্মে অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশী শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে...কিন্তু কোন রাজনৈতিক কৌশলে কি এর প্রতিরোধ হতে পারে। এ যে মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে ; সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ জাপানে এলেন। জাপানের জাতীয়তাবাদ ও উগ্র সাম্রাজ্যলিপ্সা তখন চরমে উঠেছে। কোরিয়ার উপর বর্বর অত্যাচারে নবগঠিত চীন রিপাবলিককে পদানত করবার চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যে জাপান তখন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। শিল্প সাহিত্য সৌন্দর্যানুভূতির লীলাভূমি হিসেবে কবি যে জাপানকে জানতেন সে জাপানে এবং পররাজ্যলোলুপ এ জাপানে অনেক পার্থক্য। প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল দেশ জাপানের নৈতিক অধোগতি রবীন্দ্র-মনকে ক্ষুব্ধ করল। পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে জাপান যে আধ্যাত্মিক সম্পদকে বিসর্জন দিতে বসেছে সে সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চাইলেন কবি জাপানবাসীদের *The Spirit of Japan* এবং *The Nation*-বিষয়ক বক্তৃতায়। পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তাবাদে অন্ধ জাপানী মননশীল মহলে এ সমস্ত আদর্শবাদী বক্তৃতার তীব্র প্রতিক্রিয়া হল। সুবিখ্যাত জাপানী কবি য়োন নোগুচি বললেন, রবীন্দ্রনাথ সমকালীন জাপানের সমস্যা বিষয়ে জাপানীদের সচেতন করে তুললেও সম্ভাব্য বিদেশী আক্রমণের মুখে সে সমস্যা সমাধানের প্রতি কোন সার্থক ইঙ্গিত দিতে পারেননি। জাপানীদের জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানের ভার গ্রহণ করতে হবে তাদের নিজেদেরই। এখানে একথা স্মর্তব্য প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান ইংরেজ-ফরাসী-ইতালী-রুশ প্রভৃতি মিত্রশক্তির পক্ষ নিয়ে চীন থেকে জার্মানদের বিতাড়িত করে সিঙ্‌টাঙ্‌ অধিকার করেছিল।

তিন মাস জাপানে অবস্থান করে কবি এলেন আমেরিকায়। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা-প্রভাবিত জাপানে নেশনতন্ত্রের নগ্ন প্রকাশ দেখে রবীন্দ্র-মন বিষিয়ে উঠেছিল ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে। আমেরিকার সিয়াটল সহরে উপস্থিত হয়ে একদল উৎসাহী শ্রোতার সামনে তিনি বক্তৃতা করলেন *Cult of Nationalism* সম্পর্কে। য়ুরোপে তখন জাতিতে জাতিতে আত্মঘাতী সংগ্রাম চলছে পুরাদমে। সে অবস্থায় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রভূমি আমেরিকায় বসে রবীন্দ্রনাথ

তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন পাশ্চাত্ত্য জাতি-সমূহের উপাস্য নেশনতন্ত্রকে। আমেরিকার নগর থেকে নগরান্তরে কবি অনলবর্ষী ভাষায় পাশ্চাত্ত্য সাজাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে চললেন। এ সমস্ত বক্তৃতায় একদিকে যেমন সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদকে কঠোর ভাষায় ধিক্কৃত করা হয়েছে তেমনি বন্ধনমুক্ত সর্বমানবের মিলনের জয়ধ্বনিও উচ্চারিত হয়েছে। প্রিয় শান্তিনিকেতনকে বিশ্বের সকল জাতির মিলন-ভূমিতে পরিণত করবার ইচ্ছাও জাগ্রত হয়েছে কবির মনে এ সময়ে। লস্ এঞ্জেল্স থেকে ১৯১৬ সনের ১১ই অক্টোবর একখানি চিঠিতে কবি এ সময় লিখেছেন ঃ

> ঐখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব-চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আস্ছে ; ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মিলন-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে...সর্বমানবের জয়ধ্বজা ঐখানেই রোপণ হবে। পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানের নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ।

জাপানের মত আমেরিকায়ও রবীন্দ্রনাথের নেশনতন্ত্র-বিরোধী মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। য়ুরোপেও সৃষ্টি হল প্রবল প্রতিক্রিয়া। কবির ন্যাশনালিজম্-বিরোধী বক্তৃতাগুলি *Nationalism* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। এ প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নগ্নরূপকে যেরূপ মননশীলতার সাহায্যে উদ্ঘাটিত করেন তাতে জগৎ সমক্ষে সে সভ্যতার মুখোস খুলে গেল। ফরাসী ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর নেশনতন্ত্রের চাপে নিষ্পিষ্ট ফরাসী সৈন্যদের মধ্যে এ গ্রন্থ আশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ করল। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'কবির ন্যাশনালিজম-বিরোধী বক্তৃতাগুলি লইয়া জাপানে আমেরিকায় ও য়ুরোপে যেরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল, বোধ হয় তাঁহার আর কোনো গ্রন্থ সম্বন্ধে তাহা হয় নাই।' (দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৭)। কবির ইচ্ছা ছিল মহাযুদ্ধের প্রচণ্ডতা একটু

প্রশমিত হলে ইংলণ্ডে গিয়ে স্বার্থান্ধ জাতীয়তার বিরুদ্ধে তাঁর নব-উদ্ভাবিত মানবতার বাণী প্রচার করে দেশে ফিরবেন। কিন্তু যুদ্ধের গতি অপরিবর্তিত থাকায় ইংলণ্ডে যাওয়া হয়ে উঠল না। কবি আমেরিকা থেকে জাপান হয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্র-মনের নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গের প্রথম স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়েছে ন্যাশনালিজম গ্রন্থে—এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তীব্র সাজাত্যবোধের উন্মত্ত উন্মাদনা স্বদেশী যুগের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কম অনুভব করেননি। সে অনুপ্রেরণার উৎসে ছিল বন্ধন-পীড়িত নির্যাতিত স্বদেশবাসীকে স্বাধিকার-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা। কিন্তু য়ুরোপীয় নেশনতন্ত্রের প্রকৃতিই যে আলাদা। এ নব-বিধানের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিমনের স্বাভাবিক বিকাশকে খর্ব করে, ব্যক্তিচিত্তকে যান্ত্রিক-ভাবে স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত করে জগতে দুর্বল জাতির স্বাধীনতা অপহরণ করা। সংঘশক্তিবদ্ধ পররাজ্যলোলুপ সংকীর্ণ জাতীয়তার উপাসক পাশ্চাত্ত্য জাতিকে কবি অভিহিত করলেন *Commercial and mechanical man* বলে। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত বণিকধর্মী পাশ্চাত্ত্য জাতির দুষ্টপ্রভাবে সে দেশের মহান জীবনাদর্শ আজ ভূলুণ্ঠিত। পরস্পরকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসই হল তাদের রাষ্ট্রনীতির মূলে। পূর্বেকার পাশ্চাত্ত্য-ভ্রমণের সময় সে দেশের সাহিত্য শিল্পচেতনা এবং মহত্তর জীবনবোধের ভিতর কবি যে স্বাধীন ও সৌন্দর্যসচেতন আত্মার পরিচয় লাভ করেছিলেন আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের মধ্যে সে আত্মার নিঃশেষ অবলুপ্তি দেখে কবি ব্যথিত হলেন। হৃদয়কে উপবাসী রেখে বুদ্ধির আত্যন্তিক চর্চাই যে পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহকে একটা সর্বনাশা ধ্বংসের পথে আকর্ষণ করছে সে সম্পর্কে কবির সন্দেহ রইল না। সভ্যতার অন্তরঙ্গ লক্ষণ হল পারস্পরিক সহযোগিতার যোগে সৃজনের প্রেরণা। যে জাতি সহযোগিতার উদার প্রেরণাকে অস্বীকার করে মানুষের মধ্যে বিভেদকে চিরজাগ্রত রাখতে চায় সে জাতি যত ঐহিক সম্পদের অধিকারী হোক

না কেন তাকে সভ্য বলা চলে না। পাশ্চাত্ত্য জগৎ নেশন-তন্ত্রের অনুবর্তী হয়ে মানুষের সে বিচ্ছেদ-প্রবৃত্তিকেই উত্তেজিত করে তুলেছে। প্রাচ্যের জাপানও সে অশুভ প্রভাবের বশবর্তী হয়ে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটাতে দ্বিধা করছে না। যে ঐক্যানুভূতি ছিল ভারতবর্ষের চির-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সে ভারতবর্ষও পাশ্চাত্ত্যের রাষ্ট্রনীতির অনুকরণে ব্যাপৃত। এ অবস্থায় জাতি-সংস্কারমুক্ত রবীন্দ্র-মন যে আধুনিক সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে পাশ্চাত্ত্য কালচার থেকে পৃথক করে দেখার ফলে সে সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্র-মনে বিশ্বাসের ক্ষীণ সূত্রটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিল। সে বিশ্বাসের সূত্র আকস্মিকভাবে ছিন্ন হয়ে গেল যুদ্ধের পর ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড দেখে। ইংরেজ সরকার রবীন্দ্রনাথের অসামান্য সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিরূপে কবিকে নাইট্‌হুড দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে। সমস্ত ভারত-বর্ষের মধ্যে ইংরেজ প্রদত্ত এ বিরল সম্মান রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কোন সাহিত্যিক লাভ করেন নি। পাঞ্জাবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সমর্থন-পুষ্ট ডায়রী এবং ওডায়রী বর্বরতার খবর শুনে সে সম্মান কবির কাছে মনে হতে লাগল বিরাট গুরুভারের মত। যে নিরস্ত্র জনতাকে ইংরেজের প্রতিনিধি গুলি করে বোমা বর্ষণ করে পশুর মত হত্যা করতে পারে, এমনকি এদেশের অবলা নারীজাতির উপরও যে সভ্যতাস্পর্ধিত দেশের লোক নির্দ্বিধায় অমানুষোচিত নির্মম অত্যাচার চালাতে পারে *Law and order*-এর নামে—সে দেশের প্রদত্ত সম্মান কবির নিকট মনে হতে লাগল পরম পরিহাসের বস্তু। ইংরেজের সুকঠোর আইন ও শৃঙ্খলার ষ্টীম রোলারের চাপে সেদিন সমস্ত দেশের কণ্ঠ যখন রুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ তখন তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় ইংরেজের দেওয়া সম্মান ফিরিয়ে দিতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করেননি। সে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখের কথা। পাঞ্জাবে অসহায় দেশবাসীর অকথ্য নির্যাতনের

প্রতিবাদে রাজপ্রদত্ত উপাধি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে তৎকালীন বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রখানি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সম্পর্কে কবির স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাসে একখানি অমূল্য দলিলরূপে বিবেচিত হবার যোগ্য। তার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

6, Dwarkanath Tagore Lane,
Calcutta, May 30, 1919.

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helpness-ness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of Civilized Governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly. efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification......... The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen, who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask your excellency to relieve me of my title of knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the king at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

Yours faithfully,
Rabindranath Tagore

স্বজাতির প্রতি লাঞ্ছনার প্রতিবাদে রাজদত্ত উপাধি বর্জন করায় ক্ষমতাদৃপ্ত ব্রিটিশ সরকার সেদিন খুবই অপমানিত বোধ করেছিলেন। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। যে পরিমাণ সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে তারা রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছিলেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ততোধিক তীব্রতার সঙ্গে এবার তারা সমালোচনা করলেন রবীন্দ্রনাথের কাজকে।

ব্রিটিশ Law and Order-এর যান্ত্রিক নৈর্ব্যক্তিকতার প্রতি রবীন্দ্র মনের বিশ্বাস বহুদিন থেকেই ক্ষীয়মান হয়ে আসছিল। পাঞ্জাবে সে শাসনযন্ত্রের মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ সে বিশ্বাসের ভিত্তিকে একেবারে শিথিল করে দিল। ব্রিটিশ সরকারে উপর আস্থা হারালেও ব্রিটিশ জাতির সুবিচারের উপব রবীন্দ্র-মনের নির্ভরতা তখনও প্রবল। নির্যাতিত দেশবাসীর জন্য ব্রিটিশ জাতির দরবারে সুবিচারের আশায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ আবার এলেন লণ্ডনে। লণ্ডনে উপস্থিত হয়ে তৎকালীন সেক্রেটারি অফ স্টেটকে তিনি জানালেন পাঞ্জাবে নিরস্ত্র জনতার উপর কাপুরুষোচিত বর্বরতা মানবধর্ম বিরোধী—ইংলণ্ডের জনসাধারণ যদি এ সত্যটুকুকে অন্তত স্বীকৃতি দেয় তাহলেও নির্যাতিত ভারতীয় চিত্ত কথঞ্চিৎ শান্তি পেতে পারে। টোরি পার্টির বিশিষ্ট নেতা ভাইকাউন্ট সেসিলকেও তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত করালেন। অক্সফোর্ডের মনীষী অধ্যাপক গিলবার্ট মারেকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন ব্রিটিশ চিন্তাবিদদের প্রভাবিত করে পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সরকারের মানবতা বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিবৃতি প্রচার করেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সকল প্রচেষ্টাই বিফল হল। পাঞ্জাবের হাঙ্গামা নিয়ে হান্টার কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, হাউস অফ লর্ডস-এ তার উপর যে বিতর্ক হল সে বিতর্কের অবসানে দেখা গেল ব্রিটিশ জাতি রায় দিয়েছেন জেনারেল ডায়ারকে সমর্থন করে। ব্রিটিশ জাতির ন্যায় ধর্মের উপর এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-মনে বিশ্বাসের যে শেষ

ভিত্তিটুকু ছিল তাও এ অযৌক্তিক বিচার দেখে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার মনোভাব সবল ভাষা পেয়েছে লণ্ডন থেকে সি. এফ. এনড্রুসকে লিখিত একখানি পত্রে। তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল :

London, July 22nd, 1920

The result of the Dyer debetes in both Houses of Parliament makes painfully evident the attitude of mind of the ruling classes of this country towards India. It shows that no outrage, however monstrous, committed against us by agents of their Government, can arouse feelings of indignation in the hearts of those from whom our governors are chosen.

The unashamed condonation of brutality expressed in their speeches and echoed in their newspapers is ugly in its frightfulness. The feeling of humiliation about our position under the Anglo-Indian domination had been growing stronger every day for the last fifty years or more, but the one consolation we had was our faith in the love of justice in the English people, whose soul had not been poisoned by the fatal dose of power which could only be available in a Dependency where the manhood of the entire population had been crushed down into helplessness.

Yet the poison has gone further than we expected, and it has attacked the vital organs of the British nation. I feel that our appeal to their higher nature will meet with less and less response every day......

['Letters to a Friend'—Edited by C. F. Andrews, Allen and Unwin, London, 1928]

ব্রিটিশ জাতির ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ নির্মম স্বপ্ন-ভঙ্গ রবীন্দ্র-মনকে সবলে আকর্ষণ করল স্বজাতিকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করবার মহত্তর প্রেরণায়। ১৯২০ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর প্যারী থেকে এনড্রুসকে লিখিত একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার মনোভাব সুস্পষ্ট ভাষা পেয়েছে :

> Let us forget the Punjab affairs—but never forget that we shall go on deserving such humiliation over and over again until we set our house in order. Do not mind the waves of the sea, but mind the leaks in your vessel.

অতঃপর বহু প্রবন্ধ ও মননশীল রচনায় ভারতবাসীকে আত্মশক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে অক্লান্ত লেখনী চালনা করেছিলেন সে খবর রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠকদের জানা। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে আমাদের আলোচ্য নয়।

১৯২০ সনে য়ুরোপ ভ্রমণের পর ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ আবার গেলেন পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণে। এবার দক্ষিণ আমেরিকায় ও য়ুরোপ যাত্রার নোটগুলি প্রকাশিত হল 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' নামে। এ ডায়ারিতে কবি-হৃদয়ের কথা বেশী প্রকাশিত হলেও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিপুণ বিশ্লেষণও প্রকাশ পেয়েছে। ক্রাকোভিয়া জাহাজ থেকে ১৯২৫ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কবি য়ুরোপীয় জীবনের অগ্রসরতা বা প্রোগ্রেসের ধর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখছেন :

> য়ুরোপে সেই মানুষ-ব্যক্তিটি দিনে দিনে বহু দূরে পড়ে গেল ; কল গেল এগিয়ে ; তাকেই সেখানকার লোকে বলে অগ্রসরতা, প্রোগ্রেস্।

য়ুরোপীয় পলিটিক্স্-এর তীক্ষ্ণ সমালোচনাও ভাষা পেয়েছে এ ডায়ারিতে :

> য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির, যুদ্ধনীতির, বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়দৌড় চলছে জলে স্থলে আকাশে, সেখানে বাহ্য প্রয়োজনের গরজ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠল, তাই মনুষ্যত্বের ডাক শুনে কেউ সবুর করতে পারছে না। বীভৎস সর্বভুক্ পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্স্ নিয়ত ব্যস্ত। তার গাঁটকাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বকালে যুদ্ধবিগ্রহের পদ্ধতিতে ধর্মবুদ্ধি যেখানে মাঝে মাঝে মাথা খাড়া করে রেখেছিল, ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা হার্ডল রেস খেলে চলেছে। সবুর সয়না যে,...........

একই জাহাজ থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত ডায়ারিতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার গতি সম্পর্কে সত্যদ্রষ্টা মনীষীর ধারণা হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ :

> আজ মুনাফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ময় সত্য রাহুগ্রস্ত। এইজন্যই মানুষের প্রতি কঠিন ব্যবহার করা, তাকে বঞ্চনা করা এত সহজ হল। তাই পাশ্চাত্ত্যে পলিটিক্স্ই মানুষের সকল চেষ্টার সর্বোচ্চ চূড়া দখল করে বসেছে। অর্থাৎ, মানুষের ফুলে-ওঠা পকেটের তলায় মানুষের চুপসে-যাওয়া হৃদয় পড়েছে চাপা। সর্বভুক্ পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনোদিন এমন কুৎসিৎ আকারে দেখা দেয়নি।

১৯২৬ সনে ইতালিতে গিয়ে মুসোলিনীর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম-ক্ষমতায় মুগ্ধ হলেও বার্লিনে বসে যখন তিনি ফ্যাসিবাদের স্বরূপ অবগত হলেন তখন 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান'-এ ফাসিস্ত ইতালির ব্যক্তি স্বাধীনতা দমন-প্রয়াসকে আক্রমণ করে প্রবন্ধ লিখতে রবীন্দ্রনাথ এক মুহূর্তও দ্বিধা করেন নি। এ ফ্যাসিজম-বিরোধিতার জন্য মুসোলিনীর ভ্রাতা পরিচালিত *Popolo d' Italia* পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করেন।

১৯২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কয়েক বৎসর স্বদেশে ও সুদূর প্রাচ্যে কাটিয়ে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ আবার

এলেন য়ুরোপে। সমস্ত ভারতব্যাপী তখন চলেছে একদিকে মহাত্মা-গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন আর একদিকে আশু-রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির জন্য সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ঢাকায় হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা, শোলাপুরে দাঙ্গা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় সেখানে মার্শাল ল জারি ও তিনজন বিশিষ্ট বংশীয় যুবকের ফাঁসি—দেশের এ সমস্ত ঘটনা লণ্ডনপ্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে চঞ্চল করল। সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোককে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করায় এবং আইন ও শৃঙ্খলার নামে বর্বরোচিত অত্যাচার ও প্রজাহত্যাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় ব্রিটিশ রাজনীতির বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-মনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ভাষা পায় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার সংবাদ-প্রতিনিধির নিকট বক্তব্যে। সে বক্তব্যে তিনি বলেন, শোলাপুরে অনুষ্ঠিত অত্যাচারকে যদিও আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ বলে গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে তথাপি একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে অত্যাচারীরা নিজেদের আচরণের দ্বারা মানবতার আইনকে নিজেরাই লঙ্ঘন করেছে। কবির মতে মানবতার আইনই অন্যান্য সকল আইন থেকে শ্রেষ্ঠ।

সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী পাশ্চাত্ত্য মনকে মানব-ধর্মের উদার আদর্শের দিকে আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে সে বৎসরের ১৯শে মে তারিখে রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ডের ম্যানচেষ্টার কলেজে সে দেশের জ্ঞানী-গুণীদের সামনে ব্যাখ্যা করলেন *Religion of Man* বা মানুষের ধর্ম। রবীন্দ্র-মনের এ সুগভীর ধর্মবোধের পরিচয় দেওয়া হবে পরবর্তী আর একটি অধ্যায়ে।

মানবতাবিরোধী সাম্রাজ্যবাদের দুষ্ট প্রভাব শুধু যে ইংরেজ জাতিকে ভারতবর্ষে নিষ্ঠুর দমন কার্যে নিয়োজিত করেছিল তা নয়—সুদূর প্রাচ্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত জাপানকেও প্ররোচিত করেছিল দুর্বল চীনের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে। সে অত্যাচার যখন

উত্তরোত্তর বেড়ে চলল মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ তীব্র ভাষায় তারও প্রতিবাদ না করে পারেননি। ১৯৩৮ সালে শান্তিনিকেতন থেকে চীনের নেতা চিয়াং-কাই-শেককে তিনি অধ্যক্ষ তান-য়ুনসান-এর মারফতে যে পত্র পাঠান সে পত্রে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের উদ্দেশে রবীন্দ্র-মনের ধিক্কার জীবন্ত ভাষা পেয়েছে :

> Your neighbouring nation (Japan) which is largely indebted to you for the gift of your cultural wealth and therefore should naturally cultivate your comradeship for its own ultimate benefit, has suddenly developed a virulent infection of imperialistic rapacity imported from the West and turned the great chance of building the bulwork of a noble destiny in the East into a dismal disaster,

এ পত্র যখন প্রাচ্য এশিয়ার কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তখন বিখ্যাত জাপানী কবি য়োন নোগুচি একখানি খোলা পত্রে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর ভ্রান্তি দেখিয়ে যুদ্ধের জন্য দোষী করেন চিয়াং-কে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি একথাও জানান '*Asia for Asia*' —এ মহৎ নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েই জাপান প্রতিবেশী চীনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। সমস্ত এশিয়ার মধ্যে কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই হল জাপানের লক্ষ্য।

এ পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ নোগুচিকে লেখেন—*Asia for Asia*-বুলি জাপানে রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু নয়। জাপান এশিয়ায় যে কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছে তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হবে নির্যাতিত মানুষের কঙ্কাল-স্তম্ভের উপর। জাপান যদি চীনের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বদ্ধ না হয় তাহলে এশিয়ার মানুষের নবজন্ম কখনও সম্ভব হবে না। পত্রশেষে রবীন্দ্রনাথ জাপানের জন্যে

সাফল্য কামনা না করে কামনা করলেন অনুতাপ—যা দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর জাপানী-জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ রক্তশোষী সাম্রাজ্যবাদের ভীষণ-কুটিল রূপ এমনকি তার কালো ছায়াও যেখানে দেখেছেন তার বিরুদ্ধে আন্তরিক ভৎর্সনা বাণী উচ্চারণ করেছেন। সংকীর্ণ জাতীয়তার সম্প্রসারিত রূপই হল সাম্রাজ্যবাদ। সভ্যনামধারী পাশ্চাত্ত্য জাতি স্বদেশের সম্পদ বৃদ্ধির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় পৃথিবীর কত নিরীহ জাতিকে পদানত করেছে, কত দুর্বল জাতিকে নিশ্চিহ্ন করেছে, বন্ধনভীরু কত জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চতর শক্তির আঘাতে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে—সে কথা ভেবে পরপারের ক্লান্ত অভিযাত্রী রবীন্দ্র-মন দুঃসহ বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। জীবনের প্রারম্ভে যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভিতর রবীন্দ্র-মন আবিষ্কার করেছিল অনন্ত সম্ভাবনা, অপরিমেয় শক্তি—সে সভ্যতার ধ্বংসশীল রূপ দেখে পরিণত রবীন্দ্র-মনে সৃষ্টি হল প্রবলতম নৈরাশ্য। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বেদনাময় পবিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্র-মনের বিমর্ষ ভাব ও ভাবনা জীবন্ত ভাষা পেয়েছে কবির শেষ জন্ম দিনে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত 'সভ্যতার সংকট' নামক অন্তিম অভিভাষণে।

সে ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখের কথা (১৪ এপ্রিল, ১৯৪১)। দীর্ঘ আশিটি বৎসর পশ্চাতে ফেলে রবীন্দ্রনাথ তখন একাশি বৎসরে পা দিয়েছেন। শরীর জীর্ণ কিন্তু মন তখনও সতেজ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে সমস্ত বিজিত জাতি পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারেনি দীর্ঘকাল প্রস্তুতির পর তারা আবার রণতাণ্ডবে মেতে উঠেছে। বিদ্বেষের বিষবাষ্পে সমস্ত পৃথিবীর আকাশ ধূমায়িত। য়ুরোপে ও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে যোদ্ধৃজাতির রণহুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। মানুষের এতদিনকার সঞ্চিত সভ্যতা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলোয় লুণ্ঠিত হবার উপক্রম হল। যে জাতির স্বার্থোদ্ধত অবিচারের ফলে মানব সভ্যতা চরম সংকটের অভিমুখী হতে চলেছে তার উদ্দেশে

উত্থিত হল মৃত্যুপথযাত্রী প্রজ্ঞাবান কবির কণ্ঠে প্রবল ধিক্কারের বাণী।

অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করে এ সভ্যতা-সংকটের কারণ নির্ণয়ের প্রয়াস পেলেন মননশীল রবীন্দ্রনাথ। অষ্টাদশ শতাব্দীর উন্নত মানবাদর্শের পতাকা বহন করে এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে যে ইংরেজ জাতি একদিন মার্জিত সাহিত্য ও উদার মানবিকতার বাণীর সাহায্যে সমগ্র বিশ্বের চিত্তকে স্পর্শ করেছিল—সে ইংরেজের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর ইংরেজের ব্যবধান দুস্তর। জীবনের প্রথম ভাগে সৌন্দর্যবাদী ও মানবতাবাদী যে ইংরেজের সভ্যতা-রূপকে রবীন্দ্র-মন সাগ্রহে বরণ করে নিতে উৎকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে সে সভ্যতার বিকৃত রূপ দেখে রবীন্দ্র-মনে ঘৃণা পুঞ্জিত হয়ে উঠল। যে ইংরেজের আগমনে প্রাচ্য ভারতবর্ষ একদিন উৎফুল্ল হয়ে ইংরেজকে দিয়েছিল শক্তি সামর্থ্য ও অফুরন্ত সম্পদ সে ইংরেজই প্রতিদানে ভারতবাসীকে দিল অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, আইন ও শৃঙ্খলার নামে নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষের বিষফল। ইংরেজের প্রতিদানকে আর যাই বলা যাক সভ্যতা বলা চলে না। যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ সমগ্র পৃথিবীতে শক্তিমান জাতিরূপে পরিচিত হয়েছে সে শক্তিচর্চাকে ভারতবাসীর মধ্যে জাগ্রত করে তুলতে সে ইংরেজই হয়েছে পরম কুণ্ঠিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে একাগ্র সাধনায় নব জাগ্রত ইংলণ্ড সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল সে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানসাধনাকে ভারতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রসারিত করে দেবার কোন চেষ্টাই সভ্য নামধারী ইংরেজ কখনও করেনি। ভারতবাসী যদি জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে শক্তিমান হয়ে উঠে তাহলে ভারতবর্ষে যে ইংরেজ-কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী হয় না। তাই ভারতবর্ষে বিদ্যাবিস্তারে ইংরেজের এ কার্পণ্য। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষে এই যে দারিদ্র্যের হাহাকার, ব্যথিতের ক্রন্দন, নিপীড়িতের আর্তনাদ, ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের প্রলয়ঙ্কর বিভীষিকা—এ সমস্তই

সভ্যতাস্পর্ধী ইংরেজেরই সৃষ্টি। এ অবস্থায় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ধ্বজাবাহী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রতি মৃত্যুপথযাত্রী রবীন্দ্রনাথের ধিক্কার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করেছে। ১৩৪৮ সনের শেষ জন্মদিনের ভাষণকে কবি যে সত্যবাণীর সাহায্যে সমাপ্ত করেছেন তার মধ্যে কবির ভবিষ্যৎ দৃষ্টিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে কবি উপলব্ধি করেছেন জগতের নির্যাতিত মানব-সমাজকে মুক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত করবার জন্যে ভবিষ্যতে মহা-মানবের আবির্ভাব হবে পশ্চিম মহাসাগরের ওপারে নয় পূর্বদিগন্তে:

> ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহণ করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ঠ সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ!

মৃত্যুর মাত্র দুই মাস পূর্বেও অসুস্থ শরীরে মিস্ রাথবোন-এর ভারতবর্ষের প্রতি আক্রমণাত্মক খোলা চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে তেজোদ্দীপ্ত উত্তর দেন (৫ই জুন ১৯৪১) তার মধ্যেও কবি পরম বিচক্ষণতার সঙ্গে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অন্তঃসারশূন্যতা উদ্ঘটিত করেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার স্বরূপ উদঘাটনে এ পত্র লিপি ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করলেও এ পত্রখানিতে রবীন্দ্র-মনের

স্বপ্নভঙ্গজনিত অন্তস্পর্শী বেদনা নেই। সভ্যতার সংকট বিষয়ক ভাষণের মধ্যে রবীন্দ্র-মনের যে অপরিসীম আশাভঙ্গের বাণী ভাষা পেয়েছে তাকে একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে একটি বিরাট সাম্রাজ্যপতনের সঙ্গে।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্র-মনের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস রবীন্দ্র-জীবন ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। বস্তুতপক্ষে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্র-মনের এ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া একদিকে রবীন্দ্র-মনকে যেমন সংকীর্ণ জাতীয়তার উর্ধ্বে উঠতে সহায়তা করেছে তেমনি আর এক দিকে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কাব্য নাটক উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্যে এনে দিয়েছে অভূতপূর্ব শক্তি ও সামর্থ্য। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়।

রবীন্দ্র-মন ও বিশ্বমানবতা ঃ বিশ্বভারতী

রবীন্দ্র-মনের সীমাহীন ব্যাপ্তির পরিচয় নিহিত রয়েছে বিশ্বমানবতাবোধে। সর্বমানবের মধ্যে ঐক্য উপলব্ধির দুটি মুখ্য দিক আছে—আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক। বিশ্বব্যাপী মানুষ মাত্রই এক বিশ্বপিতার সন্তান—এ উদার চেতনার অধিকারী হলে মানুষের মনে কোন ভেদবুদ্ধি থাকে না। পৃথিবীর সকল দেশের বিচিত্র ধর্মমত ও পথাবলম্বী মানুষকে তখন মানুষ এক পরম ঐক্যসূত্রে বিধৃত দেখে। প্রাচীন ভারতবর্ষের বেদান্ত ও উপনিষদে এ মহৎ ঐক্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বর্তমান যুগে পৃথিবীর মানুষ পরস্পর সন্নিকটবর্তী হয়েছে। প্রাচীনকালে মানুষের এ সুযোগ ছিল না। সেজন্যে সে যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষ ছিল বিচ্ছিন্ন। ভারতবাসীও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ তখন জীবন সংঘাত-বিমুক্ত থেকে আধ্যাত্ম-অনুশীলনে মনোযোগী হয়েছিল—এ অনুমান অহেতুক নয়।

সুপ্রাচীন যুগে অধ্যাত্ম-অনুশীলন-তৎপর ঋষিরা ছিলেন সমাজের মধ্যে পরম শ্রদ্ধেয়। সংসারাশ্রম থেকে দূরে অবস্থান করে অরণ্য প্রকৃতির শান্ত ছায়ায় যোগযুক্ত মন নিয়ে তাঁরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাহাত্ম্য উপলব্ধির চেষ্টা করতেন। এ মহৎ প্রয়াসের ফল হল সর্বশক্তিমান স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সম্পর্কে একটি আশ্চর্য উপলব্ধি—যে বিস্মিত উপলব্ধির কথা অনুস্যূত হয়ে আছে বেদমন্ত্র ও উপনিষদের সুক্তে। এ প্রসঙ্গে ঋষিকথিত দুটি মন্ত্রের কথা অনুল্লেখ্য নয় ঃ

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

এ মন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সকল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, এ মন্ত্রের প্রবক্তা ঋষি সৃষ্টির বিপুল প্রসার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়ে যে সমস্ত শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন তারা কোন ভৌগলিক সীমায় আবদ্ধ জীব নয়—তাঁরা সমস্ত বিশ্বের অধিবাসী। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের মৃত্যুঞ্জয় মহিমার প্রতি বেদের ঋষি শ্রদ্ধান্বিত। মানুষ হীনজীবী নয়, ক্ষুদ্র-তুচ্ছ নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে অমৃতের স্পর্শ, সে অমৃতরূপী ভগবানের সন্তান—যে ভগবান মহান। দেবের ঋষি দাবি করেছেন ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা পরম রহস্যময় মৃত্যুঞ্জয় সে জ্যোতির্ময় সত্তার স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করেছেন।

বেদের ঋষি সে মহান পুরুষকে জেনেছিলেন ভয়ের অনুভূতি নিয়ে নয়—প্রীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধার অনুভূতির সাহায্যে। সে জন্যে তিনি ভগবানকে অনুভব করেছেন পিতারূপে এবং তাঁর সৃষ্ট সমস্ত জীবকে অনুভব করেছেন ভ্রাতারূপে। নিম্নোধৃত বেদমন্ত্রে এ ভাবটি সুপরিস্ফুট ঃ

ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি
নমস্তেঽস্তু।

তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে পিতা বলে যেন জানি—তোমাকে নমস্কার। এ কথার তাৎপর্য হল ভগবান আমাদের পিতা, আমরা সকলেই সে অমৃতরূপী ভগবানের সন্তান—সুতরাং মানুষ মাত্রই পরস্পর ভাই ভাই।

ভারতেতিহাসের সে সুপ্রাচীন যুগে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্ট জীব সম্পর্কে এ উদার উপলব্ধি প্রকৃতপক্ষে ভারত-সংস্কৃতির সুদৃঢ় ভিত্তি

রচনা করেছে। উপনিষদের যুগে এ উপলব্ধি ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে গড়ে তুলেছে একটি বিশিষ্ট জীবন দর্শন। এ দর্শন মানুষের স্বাভাবিক ভোগ প্রবৃত্তিকে স্বীকার করেও ভোগের উপর ত্যাগকে দুঃখকে স্থান দিয়েছে। উপনিষদের ঋষিদের বাণী—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—এ উক্তির সমর্থক। মানুষের লোভ প্রবৃত্তি মানুষকে দুর্বলের উপর শোষণ ও পীড়ন করবার জন্যে উত্তেজিত করে—যার ফলে মানব সমাজে জেগে উঠে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও কোলাহল। সে জন্যে উপনিষদ বলেছেন : 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্'। এ ভাবে উপনিষদের ধর্মপ্রবক্তারা মানুষের মনকে মোহমুক্ত করে আকর্ষণ করেছেন সে প্রেমস্বরূপ ভগবানের প্রতি যিনি 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'—অর্থাৎ যিনি মানুষের সমস্ত শক্তিকে শান্তির মধ্যে সংবরণ করতে সহায়তা করেন, যিনি মানুষের অপরিসীম জীবন-জটিলতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে মানুষের মনকে মঙ্গলের অভিমুখী করে তোলেন, যিনি মানুষের মনের অহং-বোধ, আত্মপরের দ্বন্দ্বজনিত বিরোধ ঘুচিয়ে দিয়ে সে মনকে উত্তীর্ণ করেন উদার ঐক্যানুভূতির জগতে।

উপনিষদের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' তত্ত্বে মানুষের অনুভূতি কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। মানব জীবন সম্পর্কে উপনিষদের ঋষিদের চরম আত্মোপলব্ধি ঘটেছে 'তত্ত্বমসি' ধারণায়। এ তত্ত্বে ঋষিরা নিজের আত্মার মধ্যে নিখিল বিশ্বের যোগকে স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন। এ যুগে আমরা যাকে বলি বিশ্বানুভূতি এ তত্ত্বে তারই প্রকাশ দেখা যায় স্পষ্ট ভাষায়। নিখিল মানবের প্রতি সে যুগের ঋষিদের বিস্তৃত সহানুভূতি তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল সমষ্টির মুক্তি ঘোষণায়। এ সমষ্টি মুক্তির সাধনা আধুনিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত আন্তর্জাতিক মনোভাব থেকে পৃথক। এ মুক্তি আত্মানুশীলনের পথেই লভ্য—সুতরাং এ মুক্তির পথ আধ্যাত্মিক।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে উপনিষদের ঋষিদের এ ব্যাপক ও গভীর চিন্তা সাধারণ সামাজিক লোকের চিত্তকেও আকর্ষণ করেছিল নিশ্চয়ই। তাই তারা উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তাদের সন্তানদের ঋষিদের নিকট পাঠাতে শুরু করেছিলেন—এ অনুমান অহেতুক নয়। অরণ্য প্রকৃতির শান্তচ্ছায়ায় ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে উঠল ঋষিদের তপোবন। কৃচ্ছ্র সাধনার সাহায্যে সংযম শিক্ষা, নিজের খাদ্য নিজে আহরণ প্রভৃতি বিষয় কর্মের সঙ্গে অধ্যাত্ম সাধনার নিবিড় চর্চা চলল ঋষিদের এ আশ্রমগুলিতে। সংসার জীবনের লোভ হিংসা প্রভৃতি হীন প্রবৃত্তি থেকে দূরে অবস্থান করে, ঋষিদের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সমন্বিত শিক্ষার গুণে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব যে সুবলায়ত সুগঠিত হয়ে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠত—এটা খুবই সম্ভব। এ সমস্ত আশ্রম-লালিত প্রাজ্ঞ শিক্ষার্থীরাই পরিণত বয়সে রাজাদের উপদেষ্টার স্থান গ্রহণ করতেন। জ্ঞান কর্ম ও প্রেমের ভিত্তিতে ঋষিদের আশ্রম পরিবেশে ক্রমশ: যে সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করল পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষে তা খ্যাতি লাভ করেছিল 'তপোবন সংস্কৃতি' নামে। মহাকবি কালিদাসের কাব্যে নাটকে তপোবনের জীবন বর্ণনা একটি মুখ্য স্থান গ্রহণ করেছে।

তপোবন সংস্কৃতির অস্তিত্ব সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক যতই তর্কের ঝড় তুলুন না কেন রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট সে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ছিল দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল সত্য। প্রিন্স দ্বারকানাথের পরিবারে আবাল্য ঐশ্বর্য ও বিলাসের হাওয়ায় বর্ধিত হয়েও তিনি ত্যাগ বৈরাগ্য ও সংযম সাধনার দিকে তাই এত বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে বৈষয়িকতার দিকে আকর্ষণ করেও বিফল হয়েছিলেন—তার প্রমাণ দেবেন্দ্রনাথের জীবনেতিহাস। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে অস্থির-চঞ্চল গতি এবং শেষ পর্যন্ত একটি

অনির্বাণ শান্তিময় পরিণতির মূলেও রয়েছে ভারতের সুপ্রাচীন তপোবন-সংস্কৃতির প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা।

পিতার মৃত্যুর পর ঠাকুরবাড়ীর জীবনধারাকে আমূল সংস্কার করবার প্রয়াস পেলেন দেবেন্দ্রনাথ। পিতার পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবিত আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রার স্থলে প্রবর্তন করলেন তিনি প্রাচীন ভারতীয় আদর্শানুবর্তী সংযমপূত ও নিয়মব্রত জীবনধারা। কৃচ্ছ্রসাধনায় অভ্যস্ত করতে চেষ্টা করলেন তিনি পরিবারের সন্তানদের। আর সেই সঙ্গে বেদ ও উপনিষদের মন্ত্রোচ্চারণ ও উপাসনাদি হল তাদের নিত্যকর্ম। সত্যসন্ধ দেবেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র পরিবার জীবনে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ বিস্তারে যে মনোযোগী হয়েছিলেন তা নয়—নিজের জীবনকেও সে আদর্শে সঞ্জীবিত করে তোলবার জন্যে গড়ে তুললেন বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রম। বালক রবীন্দ্রনাথ যেদিন পিতার সঙ্গে সে আশ্রমে সর্বপ্রথম পদার্পণ করেন সেদিন তিনি নিশ্চয়ই ভাবেন নি সে আশ্রমের বিকশিত রূপের মধ্যে তাঁর জীবনসাধনা পূর্ণতম অভিব্যক্তি লাভ করবে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে বেদ ও উপনিষদের আবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের কিশোর মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল—সে প্রভাবই পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে তপোবন-সংস্কৃতি ও বিশ্বমানবিকতার অভিমুখে।

রবীন্দ্র-মনে বিশ্বচেতনার আবির্ভাব কোন আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয়। কবিচিত্তের অন্যান্য ভাবধারার বিকাশের মত এ উদার ভাবধারাও স্তরপরম্পরায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটকে বিশ্বজীবনের স্পর্শলাভের জন্যে যে আবেগ ব্যাকুলতা—তার মধ্যে আর যাই থাক বিশ্বজীবন সম্পর্কে কোন মননজাত অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর নেই, থাকা সম্ভবও ছিল না। কেননা পারিবারিক জীবনের অভ্যস্ত গণ্ডীর মধ্যে থেকে অসীমের স্বপ্ন দেখা এবং কল্পনার সাহায্যে বিশ্বজীবনকে রামধনুর বিচিত্র রঙে

রঙীন করে দেখাই চলে—তার বেশী নয়। স্বপ্নবিলাসী কবি রবীন্দ্রনাথও প্রথম তারুণ্যের আবেগোচ্ছ্বসিত উত্তেজনায় বিশ্বজীবন ও বিশ্বজগতকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ পান নি।

বিশ্বজীবনের বিচিত্র রূপ না হোক স্বদেশের দুঃখ দৈন্য বেদনা-নিপীড়িত সাধারণ জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সে অপ্রত্যাশিত সুযোগ এল যখন কবি যৌবনে পিতার নির্দেশে ঠাকুর স্টেটের পরিচালনা ভার নিয়ে এলেন শিলাইদহে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশ বছরও পূর্ণ হয়নি। জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কবির এতদিনকার বহু সযত্নলালিত স্বপ্ন-কল্পনাকে ভেঙে দিল। 'সাধনা'র সম্পাদকরূপে স্বদেশীয় জীবনের বাস্তব সমস্যা আলোচনায় তাঁর লেখনী উঠল সবল হয়ে। রবীন্দ্র-অনুরাগী সাহিত্যিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মনে করেন পরবর্তীকালে যে উদার বিশ্বমানবিকতার অনুভূতি রবীন্দ্র-মনকে বিশাল ব্যাপ্তি দিয়েছে তার প্রথম সূচনা হয় শিলাইদহে জনজীবনের সান্নিধ্যে এসে (দ্রষ্টব্য ঃ রবীন্দ্র চর্চার ভূমিকা ॥ পৃষ্ঠা ১৮)।

দেশের জনজীবনে বাস্তব সমস্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হলেও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রতিফলিত ও মহর্ষি-নির্দেশিত তপোবন-সংস্কৃতির প্রভাব রবীন্দ্র-মন থেকে তখনও নিশ্চিহ্ন ভাবে মুছে যায়নি। শিলাইদহে বাসকালে কবি কয়েকবার এলেন মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমে। এ আশ্রমের শান্ত পরিবেশ ররীন্দ্র-মনে জাগ্রত করল একটি নতুন স্বপ্ন—সে স্বপ্ন হল প্রাচীন তপোবনের আদর্শে একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা। সুকঠোর বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে এলেও আদর্শবাদী যাঁরা তাঁরা স্বপ্ন ছাড়া বাঁচতে পারেন না—রবীন্দ্র-মনও জগতের অপরাপর আদর্শবাদীদের মনের মত স্বপ্নচারিতার এক আশ্চর্য বাহন। দেশের সুকুমারমতি শিশুদের প্রাচীন ভারতের তপোবনের উদার শিক্ষাদর্শে শিক্ষিত করে তুলবেন—এ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কবি সপরিবারে চলে এলেন

শান্তিনিকেতনে। সে বৎসরই প্রতিষ্ঠিত হল শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়'। এ প্রাচীনপন্থী ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়ে বারে বারে বাস্তবজ্ঞান-হীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন স্বপ্নচারী কবি। একক ভাবে এ বিদ্যালয়ে সমগ্র ব্যয়ভার বহন করতে হওয়ায় কবিকে অবর্ণনীয় আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। একটি আদর্শায়িত প্রাচীন পন্থায় শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালনা করতে গিয়েও নতুন শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে তাঁকে আপস রফা করতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে প্রেরণের কথা স্মর্তব্য। শুধু তাই নয়, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের পংক্তিভোজনের যৌক্তিকতা নিয়েও রবীন্দ্রনাথকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের মানুষকে সংস্কৃতির আদান প্রদানের মাধ্যমে ঐক্যচেতনায় অনুপ্রাণিত করবার সুমহান স্বপ্ন রবীন্দ্র-মনে তখনও রূপ নেয়নি।

ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নানা ভাঙাগড়া কবির মননজাত অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। ক্রমে ক্রমে প্রাচীন তপোবনের আদর্শের সঙ্গে যুগোপযোগী ভাবধারার সম্মিলনে নবতর একটি বিশ্ব-সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা কবির মনে দানা বেঁধে উঠেছে। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে লিখিত 'ভারতীয় ইতিহাসের ধারা' ও 'তপোবন' প্রবন্ধ কবির এ নতুন ভাবকল্পনার দিক নির্দেশক ভ্রমণের চিহ্ন।

পঞ্চাশোর্ধ রবীন্দ্রনাথের (কবির বয়স তখন ৫১ বৎসর) ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে দু'বৎসর ব্যাপী পাশ্চাত্ত্য দেশ ভ্রমণকে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তুলনা করেছেন গ্যয়টের ইটালি ভ্রমণের সঙ্গে (দ্রষ্টব্যঃ, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, পৃঃ ১৪৮)। ইটালি ভ্রমণ গ্যয়টের মনকে যেমন স্বদেশ প্রীতির সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত করে বিশ্বপ্রীতির উদার ভাবধারার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করেছিল এবারকার

পাশ্চাত্ত্য দেশভ্রমণও রবীন্দ্র-মনকে তেমনি সম্প্রসারিত করেছিল স্বজাতি-প্রেমের সীমাবদ্ধতা থেকে বিশ্বজীবনের বিস্তৃততর পটভূমিকায়। অধ্যাপক বিশী এ পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণকে আরো তুলনা করেছেন তীর্থযাত্রার সঙ্গে, যেহেতু এ ভ্রমণ ছিল রবীন্দ্র-মনের পূর্ণ বিকাশের পরম সহায়ক। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন'-এ অধ্যাপক বিশী লিখেছেন :

> এই তীর্থদেবতা কোনো জাতি নয়, কোনো ধর্ম নয়, জাতিধর্মসম্প্রদায়-মুক্ত মানব। এ দেবদর্শনের ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনেও অনুরূপ একটা পরিবর্তন ঘটিয়া গেল, যাহার ফলে দেশে ফিরিয়া পূর্বতন গণ্ডীর মধ্যে আর পূর্ব স্থানটি তিনি তেমন ভাবে অধিকার করিতে পারিলেন না। এই মানবদর্শনের ফলে মহত্তর রবীন্দ্র-প্রতিভার সমুদ্ভব।

ভালোয়-মন্দয় মেশানো যে ভারতীয় জীবনের উপর কবির মন ছিল এতদিন স্থিরনিবদ্ধ সে মনের উপর এসে পড়ল এবার বিশ্বজীবনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। দেশ কালের সীমোত্তীর্ণ এ প্রাণাবেগ জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকার্যেও এনে দিল নবীনতর তাৎপর্য ও সজীবতা। সাহিত্য ও সঙ্গীত-জগতে রবীন্দ্র-মন যেমন প্রবেশ লাভ করল গভীরতর উপলব্ধির রাজ্যে, কর্মের ক্ষেত্রেও সে মন তেমনি সচল হয়ে উঠল বিশ্বভাবধারাকে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুসংহত রূপ দেবার জন্যে। এ সম্প্রসারিত চেতনার বাস্তব রূপ দেখা দিল ১৯১৯ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠায়। এ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত গ্রন্থে অধ্যাপক বিশী লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের জীবনের চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের কোঠা নৈবেদ্য, খেয়া, স্বদেশী আন্দোলনের প্রবন্ধাদি, গোরা, গীতাঞ্জলির দ্বারা চিহ্নিত; শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম সেই যুগের সৃষ্টি। আবার পঞ্চাশের পরে যখন বৃহত্তর রবীন্দ্রনাথের উদ্ভব, বলাকা-ফাল্গুনীর যুগ, বিশ্বভারতীর সৃষ্টি সেই যুগধর্মজাত।

কোন কোন রবীন্দ্রানুরাগী মনে করেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যে বৎসর (১৯১৩) নোবেল প্রাইজ দ্বারা সম্মানিত

হন তখন থেকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান প্রদানের ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা কবি মনে ক্রমশঃ জাগ্রত হয়। এ অনুমান নিতান্ত যুক্তিহীন না হলেও আরো যে কয়েকটি গুরুতর কারণে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন—সেগুলি অনুল্লেখ্য নয়। পিতার শিক্ষায় রবীন্দ্র-মন নানা বিরোধের মধ্যে শান্তি কামনায় আবাল্য অভ্যস্ত। যৌবনে অতিতীক্ষ্ণ সৌন্দর্যচেতনা তাঁর মনকে জীবনের অসুন্দর দিকের প্রতি বিমুখ করেছে। আর পরিণত বয়সে দ্বন্দ্বরত মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একই সঙ্গে অন্তহীন বেদনা ও প্রবল আশাবাদ পোষণ করেছেন ভাবপ্রবণ কবি মনীষী। প্রথম মহা-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান, আমেরিকা এবং ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় কবি সে সমস্ত দেশে উগ্র ও সংঘাতশীল জাতীয়তার প্রভাবে মানবতার যে চরম লাঞ্ছনার চিত্র দেখেছিলেন—তা তাঁর শান্তিবাদী মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল নিশ্চয়ই। জাপানে নেশনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভাষণে, আমেরিকায় জাতি-সংঘাতের কারণ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার মনোভাব যে কত সুস্পষ্ট রূপলাভ করেছিল—সে সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মানবতাবিরোধী নেশনতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করে দ্বন্দ্বরত লোভপরায়ণ আধুনিক মানুষকে মৈত্রী সাধনায় অনুপ্রাণিত করতে না পারলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন—কবি মনীষীর এ বোধই এ সময় তাঁকে বিশ্বভারতী-পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করে থাকবে—এটা খুবই স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় বৌদ্ধ সাহিত্যে কবির প্রবেশাধিকার ঘটেছে। বুদ্ধদেবের বিশ্বমৈত্রী ও করুণার বাণী পরিণত রবীন্দ্র-মনের সামনে উন্মোচিত করেছে এক শান্ত স্নিগ্ধ প্রেমময় জগৎ। হিংসা দ্বেষহীন সে ভাবময় জীবন-পরিবেশকে হিংসায় উন্মত্ত বর্তমান

পৃথিবীর সামনে পুনরায় স্থাপন করা যায় কিনা—এ চিন্তাও এ সময় কবি-মনকে বিব্রত করেছে। জগৎ-প্রবাহের সচেতন পর্যবেক্ষক রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'লীগ অফ নেশনস্'-এর নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে সাম্রাজ্যবাদী কোন কোন জাতি দুর্বলতর জাতির উপর আক্রমণ চালিয়ে চরম নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে। এ অবস্থায় কবি-মনীষী উপলব্ধি করেছেন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংগঠনের সাহায্যে বিশ্বশান্তি লাভ সম্ভব নয়। বিশ্বমৈত্রী ও শান্তিলাভের একমাত্র পথ হল মানুষের হৃদয় পরিবর্তন। এ হৃদয় পরিবর্তন কি ভাবে সম্ভব ? মননশীল কবির বিশ্বাস পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংস্কৃতি ও ভাব-বিনিময়ের সাহায্যে পৃথিবীর মানুষ একে অপরকে ভালভাবে বুঝতে পারবে এবং এ পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই বিশ্বের মানুষের মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতি স্থাপিত হবে।

সমগ্র বিশ্বের ভাব ও সংস্কৃতি বিনিময়ের কেন্দ্র হবে কোথায় ?—এ ভাবনা এ সময় রবীন্দ্র-মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে থাকবে। ভারতেতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠক রবীন্দ্রনাথ জানেন স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ জগতের বিভিন্ন মত ও পথকে সসম্ভ্রমে স্বীকৃতি জানিয়েছে—এত বড় সমন্বয়ের স্থান পৃথিবীতে আর খুব কমই দেখা যায়। সুতরাং শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তরে বিশ্বমানবের মিলনকেন্দ্র স্থাপন করবার স্বপ্ন জাগল রবীন্দ্র-মনে। এ স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ হল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আঠারো বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী। দুইরূপে বিশ্বভারতী ক্রমশঃ নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করল। একরূপে শান্তিনিকেতনে উহা বিকশিত হয়ে উঠল বিশ্বসংস্কৃতির মিলন-ভূমি হিসেবে আর একরূপে শিল্পচর্চা ও গ্রামোদ্যোগের মাধ্যমে সমষ্টিমুক্তির সাধনপীঠ স্থাপিত হল শ্রীনিকেতনে। বিশ্বভারতী কোন গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয় নয়। বিশ্বভারতী হল সমস্ত বিশ্বের ভাবনীড় 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'—যেখানে সমস্ত

বিশ্ববাসী প্রাণের ও প্রেমের প্রেরণায় একসঙ্গে মিলিত হতে পারে। রবীন্দ্র-পরিকল্পিত বিশ্ব মিলনকেন্দ্রের আদর্শ 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'—এ বেদবাক্যটি কবি সকাশে উপস্থিত করেন তাঁর প্রিয় সুহৃৎ ও সহকর্মী পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী। সেজন্য বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে পণ্ডিত শাস্ত্রীর নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

বিশ্বভারতীর ব্যঞ্জনার্থের দিকে লক্ষ্য করলেই রবীন্দ্রনাথ এ ভাবধর্মী বিশ্বমিলনকেন্দ্রকে তাঁর স্বদেশ ভারতবর্ষে কেন স্থাপন করেছিলেন তার অর্থ পরিস্ফুট হবে। শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনি তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত '*Rabindranath Tagore : a Biography*' নামক গ্রন্থে ২৬৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এ সম্পর্কে লিখেছেন :

> Visva in Sanskrit means the world in its universal aspect ; Bharati is knowledge, culture, wisdom. Bharat is the ancient, traditional name for India and so the compound Visva-Bharati has a secondary suggestion : India where she is Universal.

শ্রীকৃপালনির এ ব্যাখ্যার সঙ্গে বেদের 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' বাণীটির যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। শ্রীসুধীরচন্দ্র কর তাঁর 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা'য় বিশ্বভারতীর আদর্শ ব্যাখ্যায় লিখেছেন (দ্রষ্টব্যঃ পৃঃ ২৪২-২৪৩) :

> শান্তি, কল্যাণ এবং একতা-র অখণ্ড একটি ভাবে জীবনের প্রত্যেকটি চিন্তা ও ব্যবহার অভিসিঞ্চিত থাকলেই সেখানে সমস্ত বিশ্বের নীড় সৃষ্টি হতে পারে, তার মিলিত প্রভাবই স্বভাবতঃ সে নীড়কে সৃষ্টি করে।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মনীষী-কবি নিজে এ বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও লক্ষ্য নির্দেশ করেন এভাবে :

Visva-Bharati represents India where she has her wealth of mind which is for all. Visva-Bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best.

১৯২০ সনে যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের—বিশেষ করে রণবিধ্বস্ত ফ্রান্সের দুর্দশা দেখে পাশ্চাত্ত্য জাতির হিংসা প্রবৃত্তিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন কবি। য়ুরোপ ভ্রমণের সময় সে দেশের শান্তিবাদী ও মানবতাবাদীদের সংস্পর্শে এসে সে ধ্বংস যজ্ঞের মধ্যেও মানব সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯২১ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর আনুষ্ঠানিক ভাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করে উহার পরিচালনাভার সমর্পণ করলেন স্বদেশবাসীর হস্তে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ঘোষণা পত্রে রবীন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন তার মধ্যে রবীন্দ্র-মনের বিশ্বজনীন চেতনার পূর্ণতম প্রকাশ ঘটেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ তখন উত্তীর্ণ হয়েছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতাবাদীদের সমপর্যায়ে। রবীন্দ্র-কথিত বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য হল:

To study the mind of man in its realization of different aspects of truth from diverse points of view.

To bring into more intimate relation with one another, through patient study and research, the different culture of the East on the basis of their underlying unity.

To approach the West from the standpoint of such a unity of the life and thought of Asia.

To seek to realize in a common fellowship of study the meeting of East and West, and thus ultimately to strengthen the fundamental conditions of world peace

through the establishment of free commuication of ideas between the two hemispheres. And with such ideal in view to provide at Santiniketan aforesaid a centre of culture where research into and study of the religion, literature, history, science and Art of Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian and other Civilization may be pursued along with the culture of the West, with that simplicity in externals which is necessary for true spiritual realization, in amity, good fellowship and co-operation between the thinkers and scholars of both Eastern and Western countries, free from all antagonisms of race, nationality, creed or caste and in the name of the one Supreme Being who is Shantam, Shivam, Advaitam.

শান্তিবাদী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতাবোধের অমূল্য দলিল হল বিশ্বভারতী পরিষদ্ গঠন উপলক্ষে প্রচারিত এ ঘোষণা পত্রখানি। সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায় শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিত্থালয় প্রতিষ্ঠার সময় রবীন্দ্র-মন যে একটি বিশেষ সংস্কারের বশবর্তী হয়ে মানবহিতব্রতী হয়েছিল বিশ্বভারতী গঠনের সময় সে একই মন পূর্ব সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করে যুগোপযোগী ভাবকর্মের প্রেরণায় অকল্পণীয় ব্যাপ্তিলাভ করেছে। ব্রহ্মচর্য বিত্থালয় প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ের মুলে ছিল বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে ভারতের তপোবন সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ আর বিশ্বভারতীর লক্ষ্য হল ভারতের সমন্বয়ী আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বসংস্কৃতির নবীনায়ন। ব্রহ্মচর্য বিত্থালয় প্রতিষ্ঠার সময় কবির মনের সামনে ছিল কল্পনানির্ভর প্রাচীন ভারতের একটি আদর্শায়িত স্বপ্নচ্ছবি, আর বিশ্বভারতী স্থাপনের প্রেরণার উৎসে ছিল বর্তমান পৃথিবীর মানুষকে স্বাদেশিক ও স্বাজাতিক ভাবনার গণ্ডীবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে বিশ্বপ্রেম মৈত্রী ও কল্যাণবোধের

আদর্শে জাগ্রত করা। শুধুমাত্র প্রকৃতি-সংস্পর্শে এনে মানুষের ব্যক্তিত্ব-উদ্বোধনের চেষ্টা নয়—নানা বিরুদ্ধ মানবীয় ভাব ও ভাবনার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সমষ্টিমুক্তির সাধনাই হল বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূল উৎস। এ সম্পর্কে 'বিশ্বভারতী' গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় কবি বলেছেন:

> প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশঃ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে।

দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় কবির মন প্রকৃতির সর্বব্যাপী প্রভাবকে স্বীকার করে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি আকৃষ্ট—সুতরাং অতীতমুখী। আর বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময় অতীত থেকে ভাবরস আহরণ করেও মননশীল কবির মন সমকালীন আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধানের দিকে প্রসারিত। মানুষের ধর্ম সম্পর্কে মানব প্রেমিক ও মনীষী কবি রবীন্দ্রনাথের যে সুগভীর উপলব্ধি কয়েক বৎসর পরে অক্সফোর্ড ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণে সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছিল তার প্রথম অঙ্কুর দেখা যায় বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময়।

বিশ্বভারতীর ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে পৃথিবীর বিভিন্ন মত ও পথাবলম্বী মানুষকে পরম আকাঙ্ক্ষিত ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করবার জন্যে কবি এসময় কত বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে চিন্তা ও বিচার করেছিলেন। বিশ্বভারতীর প্রথম উদ্দেশ্য ঘোষণায় তিনি বলেছেন: বিভিন্ন দিক থেকে মানুষের মন সত্যের

যে বিচিত্র রূপের অনুসন্ধান করে সর্বাগ্রে সে মনের পরিচয় নিতে হবে। এখানে কবির বাস্তবদৃষ্টি সুপরিস্ফুট। মানব মনের জটিলতাকে কবি এখানে স্বীকার করে নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, প্রাচ্যের বিভিন্ন সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত যে ঐক্যবোধ আছে ধৈর্যশীল পাঠ ও গবেষণার সাহায্যে তা জানতে হবে। এতে এ ভূখণ্ডের মানুষ পরস্পর সন্নিকটবর্তী হবে। এখানে কবি প্রাচ্যের তুলনামূলক সংস্কৃতি আলোচনার উপর জোর দিয়েছেন। তৃতীয়ত, প্রাচ্যের জীবন ও চিন্তার ঐক্যবোধকে পাশ্চাত্ত্যের অভিমুখী করে দিতে হবে। এখানে সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিয়ে কবি প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলন-স্বপ্ন দেখেছেন। চতুর্থত, বিশ্বভারতীর শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনের উপলব্ধি —যাতে দুই গোলার্ধের মধ্যে ভাবের অব্যাহত আদান-প্রদানের দ্বারা পরিণামে বিশ্বশান্তির বুনিয়াদকে দৃঢ় করা যায়। এখানে কবি করেছেন বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে অস্বীকার ও ভাবমূলক সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। কবির মতে বিশ্বভারতীর সর্বশেষ লক্ষ্য হল— শান্তি-নিকেতনে এমন একটি সংস্কৃতিকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে যেখানে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ইসলাম শিখ খ্রীষ্টীয় এবং অপরাপর সংস্কৃতি-চর্চার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির চর্চা ও গবেষণা চলবে। এখানে তুলনামূলক সংস্কৃতি-চর্চার সাহায্যে বিশ্বমানবের মিলনের উপায়কে আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্বমানবের মিলন কেন্দ্রের অধিবাসীদের আচার-আচরণের বৈশিষ্ট্য কি হবে তাও উল্লেখ করতে ভোলেননি মনীষী রবীন্দ্রনাথ। সর্বশেষ উদ্দেশ্য ঘোষণায় তিনি বলেছেন, সত্যিকারের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য যে সরলতার প্রয়োজন এখানকার জীবনযাত্রা হবে সে সারল্যের ভিত্তিতে পরিচালিত। মানুষের মিলনের জন্য আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অপরিহার্যতা এখানে স্বীকৃত। বিশ্বভারতীতে অনুসরণীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে কবি আরো বলেছেন, ‘এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

শিক্ষার্থী ও চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে শান্তি সহযোগীতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ হবে পরম কাম্য বস্তু। ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগীতাই যে মানব মুক্তির মূল ভিত্তি এখানে সে মহান সত্য স্বীকৃত। উদ্দেশ্য ঘোষণার পরিণতিতে উপনিষদের ভাবরস পুষ্ট কবি সর্বমানবের মিলনের মূলে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের ঈশ্বরোপলব্ধিকেই বড় করে তুলেছেন। তিনি বলেছেন, সৃষ্টির মধ্যে মহত্তম সত্তা যিনি—সে শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌-কে স্মরণ করে বিশ্বভারতীর অধিবাসীরা জাতীয়তা সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবিদ্বেষের সকল প্রকার দ্বন্দ্বমুক্ত হবে। বিশ্বানুভূতির প্রেরণা হিসেবে এ শান্তং শিবমদ্বৈতম-এর আদর্শ পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী পরিচালক ভারতীয় সরকারের ভালো লাগেনি। সে জায়গায় সরকার বিশ্বভারতীর লক্ষ্য রূপে স্থাপন করেছেন—'সত্যমেব জয়তে'—এ আদর্শকে। এ সম্পর্কে শান্তিনিকেতনের পুরাতন আশ্রমিক শ্রীসুধীর চন্দ্র কর তাঁর 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা' গ্রন্থের ২৪২-২৪৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

> কেবল মুক্ত বায়ুতে অধ্যাপনা, নৃত্যগীত, সভাকরা, ছবি আঁকা, নাটক করা ইত্যাদিতে বিশ্বভারতীর সব কিছু পর্যবসিত নয়। এর বিশ্বনৈতিক উৎস যে সাধনায়, তা 'শান্তং শিবম্‌ অদ্বৈতমে'র সাধনা। আধুনিক কালে তার প্রেরণা পেয়েছি আমরা 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌' বাণীটি। শান্তি, কল্যাণ এবং একতার অখণ্ড একটি ভাবে জীবনের প্রত্যেকটি চিন্তা ও ব্যবহার অভিসিঞ্চিত থাকলেই সেখানে সমস্ত বিশ্বের নীড় সৃষ্টি হতে পারে, তার মিলিত প্রভাবই স্বভাবতঃ সে নীড়কে সৃষ্টি করে। কিন্তু আইন-কানুনে এই দুইটি মন্ত্রই অস্বীকৃত ও অনুল্লিখিত হওয়ায় কর্মীদের কর্মেও এ দু'মন্ত্রের প্রভাব শিথিল, এমন কি অচল হতে পারে, এমন সম্ভাবনা কিছু রয়ে গেল। সেদিকে আমরা যেন সচেতন থাকি।

সৌভাগ্যক্রমে বিশ্বভারতীর ঘোষণাপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তির আদর্শ স্বপ্নের মত শূন্যে মিলিয়ে যায়নি।

১৯২১ সাল থেকে জীবনের শেষ কয় বৎসর কবি তাঁর এ মহৎ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার উদ্দেশ্যে নিজের বৃহৎ শক্তি সামর্থ ও উদ্যমকে নিয়োজিত করে গড়ে তুলেছেন বিশ্বভারতী—যে প্রতিষ্ঠান বিশ্বসংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে আজো স্বাধীন ভারতের গৌরব ঘোষণা করেছে। বিশ্বমানবতা-চর্চার এ কেন্দ্রের প্রতি 'হিংসায় উন্মত্ত' পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বহু অমূল্য সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বহু দেশে বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার কার্যে ব্যয় করেছেন। তাঁর জীবৎকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বহু জ্ঞানযোগী ও মানব প্রেমিক মনীষী শান্তিনিকেতন ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামোন্নয়নের কেন্দ্রস্থল শ্রীনিকেতনে এসে কবির সুগভীর মানবতার আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে সক্রিয় হয়েছিলেন—রবীন্দ্র-জীবনী পাঠক মাত্রই তা জানেন। এ সমুচ্চ আদর্শবাদের জন্যে দেশ-বিদেশের কোন কোন মহল কবিকে সমালোচনা ও বিদ্রূপও কম করেনি। কিন্তু বিরূপতার আঘাত মানবতাবাদী কবি-মনকে বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমৈত্রীলাভের সুমহান সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। সংকীর্ণ জাতীয়তার উৎকট উত্তেজনায় শক্তিদম্ভস্ফীত পাশ্চাত্ত্য জাতি মানব প্রেমিক কবির জীবন-গোধূলিতে আরও একটি মৃত্যুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছে। সে মারণ যজ্ঞের লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে শান্তিবাদী কবি তবু আশা করেছেন—এ ধ্বংসলীলার রক্তপঙ্কিল পথেই মহামানবের আবির্ভাব হবে বিশ্ব-বাসীকে শান্তি ও মঙ্গলের অভিপ্সিত পথে এগিয়ে দেবার জন্যে।

রবীন্দ্র-মনের বিশ্বমানবতাবোধের পরম বিকাশ ঘটেছে এখানে।

রবীন্দ্র-চিত্তের ধর্মবোধ ঃ মানুষের ধর্ম

ধর্ম বস্তুটির বিশিষ্ট কোন রূপ নেই, কিন্তু ধর্মবোধ জগতের অনুভূতিশীল ও মননশীল ব্যক্তিদের মনকে যুগে যুগে জীবনের স্বাভাবিক কক্ষপথ থেকে উৎক্ষিপ্ত করেছে। ধর্মবোধের প্রেরণায় মানুষ রাজ্যসুখ ত্যাগ করেছে, দাম্পত্য জীবনের মোহ তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছে। ধর্মবোধের বৃহত্তর চেতনায় মানুষ শুধু জীবনের ক্ষুদ্র সুখকে বিসর্জন দেয়নি—দুর্গম দুঃসহ ক্ষুরধার দুঃখের পথে পা বাড়িয়েছে। বুদ্ধদেব খ্রীষ্ট শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদের ধর্মসাধনাও নিঃসঙ্গ ত্যাগব্রত জীবনের আশ্চর্য উদাহরণ।

সার্বভৌম কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী চেতনার উৎসেও ছিল একটি সুগভীর ধর্মবোধ। রবীন্দ্র-চিত্তে সে ধর্মবোধের স্তরটি ক্রমসম্প্রসারণশীল। কোন বিশেষ দেশ কাল বা সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে তা সীমাবদ্ধ ছিলনা। রবীন্দ্র-মনের যে বিশ্বানুভূতির কথা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সে মানবতাবোধের প্রেরণাই ছিল কবির বিস্তৃত ও গভীর ধর্মবোধের মূলে। অনুভূতিগভীর এই ধর্মের উপলব্ধিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্প্রদায়গত ধর্মবোধকে অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বিশ্বমানবধর্মের উন্মুক্ত রাজ্যে। রবীন্দ্রনাথের পরিণত ভাবনায় মানুষের খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপ হয়েছিল যেমন তাঁর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অবলুপ্ত, তেমনি সাম্প্রদায়িক ধর্মের ক্ষুদ্র পরিধিও তাঁর কাছে মনে হয়েছিল ত্যাজ্য। ব্যক্তিমানবের ভিতর তিনি যেমন দেখেছিলেন Universal man-কে তেমনি তাঁর ক্রম-উদ্ভিদ্যমান ধর্মচেতনা জীবনের শেষ পর্যায়ে সুমহান ব্যাপ্তি লাভ করেছিল Religion of Man-এ বা মানবধর্মে।

রবীন্দ্রনাথের বহু কাব্য নাটক উপন্যাস মননশীল রচনা ও ধর্মদেশনা তাঁর সংস্কারমুক্ত ধর্মবোধের আশ্রয়স্থল।

সৌভাগ্যক্রমে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর যে পারিবারিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের বাল্য-জীবন কেটেছিল সে পরিবেশ ছিল সঙ্কীর্ণ ধর্মসংস্কার-মুক্ত। হিন্দুধর্মের প্রাচীন আচার-বিচার-বিমুক্ত মহর্ষি পরিবারে উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি ছিল বালকদের পক্ষে নিত্যকর্ম। এই শ্লোক আবৃত্তি বালক রবীন্দ্রনাথের মনে কেমন ভাবে যে একটি অস্পষ্ট ধর্মবোধের সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে পূর্ব অধ্যায়ে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার পরবর্তী স্তর দেখা যায় কবির যৌবনে। এ সময় ব্রাহ্ম-সমাজের কার্যপরিচলনা ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে বহু ভাষণ দেন এবং ব্রাহ্মসমাজের ধর্মভাবকে অনেক ব্রহ্মসঙ্গীতে অভিব্যক্তি দান করেন। এই ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে ধর্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে তা আনুষ্ঠানিক ধর্মের সীমোত্তীর্ণ বলা চলে না:। যৌবনে কবির ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কীয় ভাষণগুলিকে ধর্মতত্ত্বের কেতাবী আলোচনার পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

অতঃপর শান্তিনিকেতন-এর উপদেশমালায় রবীন্দ্রনাথের যে ধর্মানুভূতি প্রকাশ পেল তা পূর্বেকার কেতাবী ধর্মালোচনা থেকে স্পষ্টতঃ পৃথক পর্যায়ের।

এ পর্যায়ের উপদেশমালায় রবীন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত মন সর্বপ্রথমে পরিপূর্ণতার আদর্শ সন্ধানে যাত্রা করেছে। সে আদর্শ সম্প্রদায়গত ধর্মের গণ্ডির উর্ধ্বে। শান্তিনিকেতনএর উপদেশমালায় পূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনলাভের জন্যে ভাবুক কবির যে আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে তার রসরূপ দেখা যায় 'গীতাঞ্জলি'র ভক্তি-সঙ্গীত গুলিতে। এ রসানুভূতির পূর্ণতা গীতিমাল্য ও গীতালির সঙ্গীতে। ইতিপুর্বে 'নৈবেদ্যে'র কবিতাগুলিতে ভগবানকে পিতৃভাবে অনুভবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মানুভূতির একটি বিশিষ্ট প্রকাশ লক্ষিত হয়।

অতঃপর 'ধর্ম' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে ধর্মীয় উপদেশ সংকলিত হয়েছে তার উপর ব্রাহ্মধর্ম ও নৈবেদ্যের প্রভাব খুব বেশী দেখা যায়। কিন্তু 'খেয়া' কাব্যে ভগবানের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা এবং মিলনের আকাঙ্ক্ষা নতুন ছন্দে চমৎকার রাহস্যিক রূপ লাভ করেছে। শুধুমাত্র গীতিধারায় এবং গীতিকাব্যে নয়, রবীন্দ্র-চিত্তের এই নব-জাগ্রত ধর্মানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে 'শারদোৎসব', 'অচলায়তন', 'রাজা' ও 'ডাকঘর' প্রভৃতি Symbolic নাটকে। এ সমস্ত নাটকে যে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের চিত্র পাওয়া যায় তা যেন অবচেতন কবি-মনেরই সংগ্রাম। 'কাহিনী'র নাট্যকাব্যগুলিতে কবির যে ধর্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। যে ধর্ম সত্য নিত্য ক্ষয়হীন অবিনশ্বর সে ধর্মকে মানুষের সংস্কারগত লৌকিক ধর্ম কি ভাবে নিত্য নিয়ত আঘাত করে এবং নিত্য আঘাতের সম্মুখীন হয়েও সত্যধর্ম পরিণতিতে কি জ্যোতির্ময় মূর্তিতে প্রকাশ পায়— তারই উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'কাহিনী'র নাট্যকাব্যগুলিতে।

প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের ধর্মজ্ঞান ঔপনিষদীয় ধর্মের যে পরিধিতে বিচরণ করছিল শান্তিনিকেতনের উপদেশমালার পর্ব থেকে তা গণ্ডিমুক্ত হয়ে জীবনের বিচিত্র মত ও পথে মুক্তির উপায় খুঁজেছে। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে পরবর্তী ভাষণগুলিতে রবীন্দ্রনাথের এই উদার ধর্মবোধের পরিচয় অতি-প্রত্যক্ষ। জগতের যে কোন দেশের যে কোন কালের মহাপুরুষের জীবনে কবি মানবমাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখলেন, সে মহান জীবন এ সময় থেকে কবি-চিত্তকে সবলে আকর্ষণ করল। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও কবি শান্তিনিকেতনের মন্দিরে যীশুখ্রীষ্ট ও চৈতন্যমহাপ্রভুর জীবনবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভাষণ দান করলেন। শুধু তাই নয়, কিছুকাল পরে শান্তিনিকেতনে বুদ্ধদেব এবং হজরত মহম্মদের স্মরণ-দিন প্রকাশ করবার রীতিও প্রবর্তিত হল। এ ছাড়া পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের সাহচর্যে এসে মধ্যযুগের সন্তদের জীবনে দেখতে পেলেন তিনি সংস্কারমুক্ত ধর্মবোধের

পরিচয়। সে উদার ধর্মাদর্শ রবীন্দ্র-চিত্তকে আরো প্রসারিত করল।

শান্তিনিকেতনের উপদেশমালায় কবি ব্রাহ্মধর্মকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ শুধু গতানুগতিকতামুক্ত নয়, তা মানবিক আদর্শ ও অনুভূতিনির্ভর। যে ধর্ম মর্মোৎসারিত বা যুক্তিসিদ্ধ নয় সে ধর্মকে তিনি ধর্ম মনে করেন নি। উক্ত পর্যায়ের উপদেশমালায় রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ যুক্তি, অনুভূতি ও প্রাচীন ঋষিদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শান্তিনিকেতনের ব্রাহ্মোৎসব সাম্প্রদায়িকতাগন্ধী মনে হওয়ায় তিনি সে উৎসবের নামকরণ করেন ব্রহ্মোৎসব। তাঁর মতে ধর্মোৎসব মানুষ মাত্রেরই মধ্যে মিলনের সূচনা করে সুতরাং সম্প্রদায়গত উৎসব কখনও সার্থক হতে পারে না। মানুষের অন্তরে যখন সত্যিকারের আধ্যাত্মিক প্রেরণা জাগে তখন মানুষ কোন সম্প্রদায়গত ধর্মের গণ্ডির মধ্যে বাস করতে পারে না। সম্প্রদায়গত ধর্মমতবাদ তখন তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়। যে ধর্মের আবেদন জাতি বা সম্প্রদায়-নির্বিশেষে নিত্যকালে প্রসারিত সে ধর্মাদর্শ লাভের জন্য তখন তাঁর চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠে। কাহিনীর নাট্যকাব্যগুলিতে সত্য এবং নিত্যধর্মের সঙ্গে লৌকিক ধর্মের বিরোধের চিত্র অতি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। এ নাট্যকাব্যে রবীন্দ্র চিত্তের যে ধর্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তা একদিকে যেমন বিস্তৃত আর একদিকে তেমনি গভীর। এই প্রসারিত ধর্মচেতনার প্রভাবেই কবি ক্রমশঃ প্রবেশ করলেন ধর্মসমন্বয় ও জাতি-সমন্বয়ের উদার চিন্তা-জগতে। ঐ সময় থেকেই সর্বাশ্রয়ী মানবধর্মবোধের মহান আদর্শ তাঁর চিত্তকে অধিকার করে।

রবীন্দ্র-চিত্তে মানবধর্মের যে আদর্শ ছিল প্রথমে অস্পষ্ট-ভাবময়—মননজাত অভিজ্ঞতার ফলে তা ক্রমশঃ স্পষ্ট রূপ লাভ করে।

সে ধর্মবোধের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন :

> সমগ্র জীবনের যে একটি পরিপূর্ণতার আদর্শ তাঁহার অন্তরে ছিল তাহাই তাঁহার ধর্ম। সে ধর্ম ভাবাত্মক মতবাদ, সৌখিন ভাববিলাস নহে। কবির ধর্মমত কঠিন আত্মশাসন ও সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তথাচ উহা সর্বজন-সাধনোপযোগী। কবির ধর্ম নিখিলের জ্ঞানের সমন্বয়, জীবনের আপাতবিরুদ্ধ অর্থ-হীনতা ও বৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন, মানুষের সকল বৃত্তি সুসংগতভাবে সুপুষ্ট হইবার সুযোগ দান। মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ হইতেছে এই ধর্মজীবনের আদর্শ। কোন ইন্দ্রিয়কে কৃশ করা নহে, মনকে উপবাসী করা নহে, আত্মাকে শূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করা নহে—এই হইতেছে নব-যুগের ধর্মবোধ (রবীন্দ্র-জীবনী ২য় খণ্ড-পৃঃ ২০৮)।

রবীন্দ্রনাথ নবযুগের এ ধর্মবোধের কথা বলেছেন তাঁর মননশীল রচনা-'*Religion of Man,*' '*Personality,*' 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থে। রবীন্দ্র-জীবনীর উক্ত খণ্ডে প্রভাতবাবু মানবধর্ম ব্যাখ্যায় আরো বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের মানব ধর্ম—কোঁৎ (Comte) প্রমুখ পজিটিভিষ্টদের মানবপ্রীতি বা মানবতা নহে,—কবির ধর্ম একাধারে বাস্তবের উপর ও ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ; উহা স্পষ্ট, ভাবাত্মক, পরিপূর্ণ মানবতার ধর্ম—উহা কর্মে কঠোর, জ্ঞানে উজ্জ্বল, ভক্তিতে রসাপ্লুত, সৌন্দর্যে সমন্বিত।

রবীন্দ্র-চিত্তের ধর্মবোধের বিকাশের ক্রম হল মোটামুটি এই।

রবীন্দ্র-চিত্তের এ বিকশিত ধর্মবোধ মানুষের ধর্ম উপলব্ধিতে যে অন্তহীন প্রসার লাভ করেছিল এখন তাই হবে আমাদের আলোচ্য।

রবীন্দ্র-মন ও মানুষের ধর্ম

রবীন্দ্র-মনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে 'মানুষের ধর্ম' উপলব্ধিতে। মানবজীবন-জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্র-মনের ব্যাপ্তি কত উদার তারও বিশিষ্ট পরিচয় রবীন্দ্রনাথের এই মানব-ধর্মবোধ। কবির বোধির (intuition) সঙ্গে মনীষীর বোধের (intellect) এক অপরূপ সমন্বয়ে বিকাশ লাভ করে রবীন্দ্রনাথের এ ধর্মানুভূতি। এ প্রসারিত ধর্মচেতনা রবীন্দ্র-মনকে মুক্তি দিয়েছিল সীমাবদ্ধ জীবনবৃত্ত থেকে ব্যাপক বিশ্ববোধের ক্ষেত্রে। সে সীমাতিক্রান্ত মনের স্বাক্ষর তাঁর সাহিত্য দর্শন ও কর্মপ্রচেষ্টা।

সমাজ-জীবনে রবীন্দ্রনাথ এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সে সম্প্রদায়ের উপাসনা মন্দির থেকে সে বিশিষ্ট ধর্মাদর্শের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি বহুসংখ্যক ভাষণে এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র অক্সফোর্ডে আবার তিনি ধর্ম ব্যাখ্যা করলেন। সে ধর্মের নাম দিলেন তিনি 'মানুষের ধর্ম' বা Religion of Man। সে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কবি মনীষী রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তা ও জীবনবোধের পরিচয় অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে প্রদত্ত এই 'হিবার্ট বক্তৃতামালা'। অহংবাদী উগ্র স্বাতন্ত্রপরায়ণ পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর কানে এবং মনে তিনি উদার মানবতাবোধের মন্ত্র দিলেন এই বক্তৃতাগুলির মাধ্যমে। মহা উৎসাহে অভ্যর্থিত হ'ল সে মানবমাহাত্ম্য-বোধের উদার অনুভূতি-নির্ভর বাণী জড়-সভ্যতাধর্মী পাশ্চাত্ত্য দেশে। হিবার্ট বক্তৃতামালা শেষ হ'ল। কিন্তু রবীন্দ্রমনে উদার ধর্মবোধ যে গভীর সুরের অনুরণন তুলেছিল তা সুযোগ খুঁজতে লাগল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হবার জন্যে। সুযোগও জুটে গেল মাত্র তিন বৎসর পরে যখন ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'কমলা বক্তৃতামালা' দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হলেন। এ বক্তৃতায় তিন পর্যায়ে তিনি স্বদেশবাসীকেও

শোনালেন 'মানুষের ধর্ম' সম্বন্ধে তাঁর উদার উপলব্ধির কথা। হিবার্ট লেকচারস্ ও কমলা লেকচারস্ পরস্পরের পরিপূরক। এ উভয় বক্তৃতায় অনুস্যূত হয়ে আছে 'মানুষের ধর্ম' বিষয়ে কবি ও মনীষী রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধর্মবোধ।

মানবধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে ধর্ম বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝেন সে সম্পর্কে আলোচনা আগে প্রয়োজন। '*Religion of Man*' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ধর্মের অর্থ সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন: ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বিশেষ মতবাদ বা ক্রিয়াকাণ্ড। এ ছাড়া ইহলোক পরলোক পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বহু বিষয় জড়িত থাকায় ধর্ম বস্তুটি যুগে যুগে সকল দেশের মানুষের কাছে একটি জটিল ব্যাপার বলে মনে হয়েছে। ধর্ম কি কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের ধর্মশাস্ত্র মাত্র? তাই যদি হত তাহলে ধর্মের কোন সার্বজনীন আবেদন থাকত না। আসলে ধর্মের অর্থ বিচিত্র। 'ধর্মশাস্ত্রে'র প্রকৃত অর্থ হ'ল 'Code of laws or conduct'—যে সমস্ত নিয়ম ও সদাচার মানব সমাজকে ধারণ করে আছে তাই হল ধর্ম। ধর্মের একটি সাধারণ অর্থ আছে যে অর্থে বুঝায় বস্তুর গুণ—যেমন জল বা অগ্নির ধর্ম শীতলতা বা উষ্ণতা। এ ছাড়া বিশেয বিশেষ ধর্মও আছে—যেমন রাজার ধর্ম, প্রজার ধর্ম, সর্পের ধর্ম, ব্যাঘ্রের ধর্ম। কিন্তু নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক মানুষের কোন সাধারণ ধর্ম আছে কিনা '*Religion of Man*' গ্রন্থে তাই হল কবিমনীষী রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসার বিষয়।

ব্যক্তি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী নিরপেক্ষ ব্যষ্টি-মানবের ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ সম্পর্কে নিজের মননজাত অভিজ্ঞতা ও স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ '*Religion of Man*' ও 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থদ্বয়ে। এ উভয় গ্রন্থের বক্তব্য প্রায় এক বলে মানবধর্ম বিশ্লেষণে আমাদের আলোচনার ভিত্তি হল 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থখানি।

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের ভূমিকায় মানব-মনের দুটি সুস্পষ্ট প্রবৃত্তি লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ : এক প্রবৃত্তির প্রভাবে মানুষ শুধু নিজের সংকীর্ণ বিষয়বুদ্ধি নিজের স্বার্থবোধ নিয়েই বাঁচতে চায়। মানুষের এ প্রবৃত্তিকে বলা চলে জীবভাব। কিন্তু মানুষের জীবনে আর একটা দিক আছে—

> যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবন-যাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ; যাকে বলি মৃত্যু, সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্যে বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

বর্তমান জীবনের সংকীর্ণ প্রয়োজনবোধকে অতিক্রম করে সর্বযুগের বিশ্বমানবের আদর্শ-লাভের অভিমুখীতাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—বিশ্বভাব। জীবভাব অতিক্রমণের মধ্য দিয়েই মানব-অন্তরে বিশ্বভাবের সূচনা হয়। বিশ্বভাবের সাধনাই হল মনুষ্যত্বের সাধনা। এ তপস্যা কঠোরের তপস্যা। এ তপস্যার সিদ্ধিতে যে দুর্লভ ধর্মলাভ হয়, তাকে বলা চলে 'মানবধর্ম'।

মানুষের অন্তরে জীবভাব ও বিশ্বভাব দুই-ই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। তপস্যার দ্বারা জীবভাবকে অবদমিত করে জীবন ও মনে বিশ্বভাবকে বিমূর্ত করে তোলাই হল মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরিচয়। এ সাধনাই সাধারণ মানুষকে ক্রমশঃ এনে দেয় 'সর্বজনীন সর্বকালীন মানবে'র সান্নিধ্যে।

> তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায়, ভাবে, কর্মে, সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে এই উত্তরণ-প্রক্রিয়া সহজসাধ্য নয়। এ প্রক্রিয়া অনুশীলন সাপেক্ষ। বর্তমান আন্তর্জাতিকতার যুগেও বিশ্বমানবের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ। তাই 'মানুষ আজও মানুষ হয়নি।' তা হলেও আশার কথা এই যে, এ অসম্পূর্ণ মানুষও বিশ্বভাবের ও বিশ্বমনের আকর্ষণ নিত্য নিয়ত অনুভব করছে। এ জন্যেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই পূর্ণ মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাকেই বলেছে—এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছে :

স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

'সেই মানব সেই দেবতা,···যিনি এক'—তাঁর পরিচয়কে উদ্‌ভাসিত করে তুলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ মানবধর্ম-আলোচনায়। এখন রবীন্দ্র-মনের এ উদার উপলব্ধির বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় নেবার চেষ্টা করা যাক।

অভিব্যক্তি-ধারায় চতুষ্পদ প্রাণী যতদিন দ্বিপদ মানুষে পরিণত হয়নি ততদিন তার প্রয়োজনবোধ ছিল দেহের সীমায় আবদ্ধ। মনের বিকাশ তখনও হয়নি, জৈবিক প্রয়োজনের বাইরে তার গতিবিধি ছিল না। মনের বিকাশ হল তখন যখন চতুষ্পদ প্রাণী দ্বিপদ মানুষে পরিণত হল। তার প্রয়োজনের সীমাও তখন প্রসারিত হল। শুধুমাত্র দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তিতে সে তৃপ্ত থাকতে পারল না মনের তৃপ্তির জন্যে সে চাইল আরও কিছু। পশুর মধ্যে দেখা যায় সাধারণতঃ খাদ্য সংগ্রহের জন্যে প্রবল প্রতিযোগিতা, আর মনের অধিকারী মানুষের মধ্যে দেখা গেল একের সঙ্গে অপরের সহযোগিতা —'মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ।'

ব্যক্তিমন এভাবে বিশ্বমনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ক্রমশঃ ব্যাকুল হল। সে মন বুঝতে পারল 'জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে সে যুক্ত হয়, ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা'। সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত মনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সর্বজনীন মন'। —'এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ'। এ অভি-ব্যক্তির ফলেই মানুষ নিজের পরিবেশের সংকীর্ণ সীমানা অস্বীকার করেছে, আর নিযুক্ত করেছে নিজেকে 'বৃহৎ মানুষে'র সাধনায়। 'এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব'।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, নির্বিশেষ মানবের ঐক্য-উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত সত্য-উপলব্ধি। এ সত্যকে বলা চলে মানব-সত্য। মানবসত্যের শ্রেষ্ঠ তাৎপর্য হল—সংকীর্ণ ব্যক্তিসত্তা, প্রত্যক্ষ বর্তমান ও দেশসীমাকে অতিক্রম করে সর্বযুগের সর্বদেশের মানব-মনের সঙ্গে সহজ আনন্দের যোগ স্থাপন। মানুষ 'যে পরিমাণে··· এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে,—মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট, সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর'।

আত্মগত আত্মসম্পূর্ণ জীবন-প্রচেষ্টায় মানুষ পশুধর্মী। আত্ম-কেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তির ঔৎসুক্যের মধ্য দিয়ে তার মানবধর্মের উন্মেষ। এই পশুধর্মের আত্মমগ্নতার সঙ্গে মানবধর্মের উন্মুক্ত প্রসারের ভেদরেখা চিহ্নিত করেছেন 'মননধর্মী কবি ও কবিধর্মী মনীষী' রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি চমৎকার উদাহরণের সাহায্যে। প্রাণী-জগৎকে তুলনা করেছেন তিনি একটি চলমান রেলগাড়ীর কামরার দুই শ্রেণীর যাত্রীর সঙ্গে। এক কামরার যাত্রী জন্তু, আর এক কামরার যাত্রী মানুষ :

> এ গাড়ী সংকীর্ণ লক্ষ্যপথে বাঁধা রাস্তায় চলে। জন্তর মাথাটা গাড়ীর নিম্নতলের সমরেখায়। গাড়ীর সীমানার মধ্যে তার আহার-বিহারের সন্ধান চলছে নীচের দিকে ঝুঁকে। ঐটুকুর মধ্যে বাধা বিপত্তি যথেষ্ট, তাই নিয়ে দিন কাটে। মানুষের মতো সে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে পারে না। উপরের জানালা পর্যন্ত পৌঁছয় না তার দৃষ্টি, তার মনের গতি নেই প্রাণধারণের বাইরে।

কিন্তু একই গাড়ীর আর এক কামরায় মানুষ-যাত্রীর অবস্থা আলাদা। সে কামরায়ঃ

> মানুষ খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনে পেয়েছে জানালা। জানতে পেরেছে গাড়ীর মধ্যেই সব কিছু বদ্ধ নয়। তার বাইরে দিগন্তের পর দিগন্ত। জীবনের আশু লক্ষ্যপথ উত্তীর্ণ হয়েও যা বাকী আছে, তার আভাস পাওয়া যায়, সীমা দেখা যায় না।

এ দুর্নিরীক্ষ্য সীমাহীন বাইরের দিকেই মানুষের আকর্ষণ সহজাত। 'সুদূরের পিয়াসী' স্বভাবচঞ্চল মানুষ অনুভব করল ঃ

> তাকে ছাড়া পেতে হবে সেইখানেই, যেখানে তার প্রয়োজন নেই, যার পরিচয় তার কাছে আজও অসম্পূর্ণ। প্রাণশক্তির অতি নির্দিষ্ট সাম্রাজ্য-প্রাচীর লঙ্ঘন করে সে জয় করতে বেরল আপন স্বরাজ। এই জয়যাত্রার পথে তার সহজ প্রবৃত্তি তার পক্ষ নেয় না, এই পথে তার আরাম নেই, তার বিশ্রাম নেই; শত শত যাত্রী প্রাণ দিয়ে এই পথকে কেবলই প্রশস্ত করছে, উন্মুক্ত করছে।

দেহের দিক থেকেও চতুষ্পদী পশুর সঙ্গে দ্বিপদী মানুষের পার্থক্য বিস্তর। চার পায়ের উপর ভর করে চলার সময় দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা যত সহজ, শুধুমাত্র দুই পায়ের উপর ভর করে চলা তত সহজ নয়ঃ

> ধাক্কা খেয়ে মানুষের অঙ্গহানি বা গাম্ভীর্যহানির যে আশঙ্কা, জন্তদের সেটা নেই। শুধু তাই নয়, ডাক্তারের কাছে শোনা যায় মানুষ উত্তত ভঙ্গী নিয়েছে বলে তার আদিম অবতত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়। তবু মানুষ স্পর্ধা করে উঠে দাঁড়াল।

দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াবার ফলে মানুষের চলার প্রয়াস কষ্টসাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু তার বদলে সে যা পেল তা মানুষকে দান করল মনুষ্যত্বের গৌরব :

> নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে জন্তু দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে ঘ্রাণ দেয় যোগ।··· দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায়, সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের।

কিন্তু 'উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলো দৃশ্যকে, অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি'।

এই মুক্তদৃষ্টি মানুষকে আকর্ষণ করেছে অজ্ঞাত অভাবনীয়ের দিকে। এই মুক্তদৃষ্টির সঙ্গে ক্রমশঃ যুক্ত হল মানুষের কল্পনাদৃষ্টি। এই দৃষ্টির সাহায্যে :

> সে লাগল অভাবিতের পরীক্ষায়, অচিন্ত্যপূর্বের রচনায়···। মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নব্রহ্মের নয়, যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্মের—আনন্দব্রহ্মের রাজ্য।

এই জ্ঞানের জগতে বিচরণ করে মানুষ আনন্দ পেল। ক্রমানু-শীলনের ফলে উপলব্ধি করল সে, এ বিরাট বস্তুবিশ্ব একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যের জালে ঘেরা। এ রহস্য আবিষ্কার করল সে নিজের অন্তরের ভিতরও। শুরু হল তখন মানবমনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের পালা। সে প্রয়াস মানুষের এখনও সমাপ্ত হয়নি। যতই সে এই রহস্যের গ্রন্থি মোচন করতে যায় ততই সে নতুনতর জটিল জালে জড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই মানুষের পূর্ণ রূপ এখনও মানুষের কাছে অনুদ্‌ঘাটিত। মননশীল কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> **পূর্ণ পুরুষের অধিকাংশ এখনও আছে অব্যক্ত। ব্যক্ত করবার প্রত্যাশা নিয়ত চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। পূর্ণ পুরুষ আগন্তুক। তাঁর রথ ধাবমান, কিন্তু তিনি এখনও এসে পৌঁছন-নি।**

অনিশ্চিত অভাবনীয়ের দিকে মানুষের যে এই যাত্রাপথ, সে পথ বিঘ্নসংকুল, পদে পদে তার বাধা। তথাপি পূর্ণের অভিলাষী মানুষ কোন বাধা মানেনি, দুঃসহ দুঃখকে সে স্বীকার করেছে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে। বাস্তবিকই পূর্ণের প্রকৃত প্রকাশ 'দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে'। স্বেচ্ছায় এ দুঃখ ও মৃত্যুকে বরণ করে নেবার অভীপ্সার মধ্যে মানুষ পরিচয় দিয়েছে যে মহৎ প্রবৃত্তির, তাকে বলা চলে 'মানবধর্ম'। নিজের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবন-পরিবেশের ক্ষেত্রে, বৃহৎ ভাব ও কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের মন যদি মুক্তিপ্রার্থী হত তাহলে 'পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাক-প্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত'। সীমাকে মানুষ স্বীকার করে। স্বীকার না করে উপায় নেই, কিন্তু চরম বলে মানে না। 'যদি মানত তাহলে মানুষের ভৌতিক বিজ্ঞানও বহুকাল পূর্বেই ঘাটে নোঙর ফেলে যাত্রা বন্ধ করত'। মানুষের মনে অনন্ত অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা আছে বলেই তথ্য থেকে সত্যের আদর তার নিকট বেশী। 'তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য।' ঐশ্বর্যের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো'। পৃথিবীতে মহামানব তাঁরা, যাঁরা উপলব্ধি করেছেন সত্যের ঐশ্বর্য, তাই অল্প সুখের মোহ তাঁদের মনকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তাঁরা চেয়েছিলেন ভূমার সুখ, প্রকাশ করেছিলেন বৃহতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বৃহতের এই ঐশ্বর্য-উপলব্ধির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে মানুষের ধর্ম।

মানুষের অন্তর্নিহিত পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে হয় মানব-ধর্মের বিকাশ। মানুষের ভিতর যে আদিম পশুপ্রবৃত্তি আছে সে প্রবৃত্তি মানুষকে প্ররোচিত করে ভোগের পথে। আবার তার অন্তরে যে আদর্শবাদী মহৎ প্রবৃত্তি আছে সে প্রবৃত্তি আকর্ষণ করছে মানুষকে দুঃখ-বরণের পথে, ত্যাগের পথে, কঠোর তপস্যার পথে। মানুষ যে পরিমাণে সহজ ভোগপ্রবৃত্তির বশীভূত সে পরিমাণে

মনুষ্যধর্মবিচ্যুত। আর যে পরিমাণে ত্যাগব্রতে দীক্ষিত, সে পরিমাণে মানবধর্মবোধে উন্নীত।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'—অর্থাৎ রহস্যময়তার প্রচ্ছায়ে নিহিত আছে ধর্মের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্ব। চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথও অনুভব করেছেন, মানবধর্মের তত্ত্বও অত্যন্ত জটিল। তার ভিত্তি শুধু মানুষের ধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, মানুষের মননের উপরও স্থাপিত। এই মহৎ ধর্মোপলব্ধির জন্যে প্রয়োজন অন্তরে ধ্যান ও বাইরে কর্ম। অন্তরের ধ্যান দিয়ে মানুষ পায় শ্রেয়কে, বাইরের কর্মের সাহায্যে মানুষ লাভ করে প্রেয়কে। এ শ্রেয় ও প্রেয়-র দ্বন্দ্ব মানুষেরই দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানবধর্ম ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়ে উঠে।

শ্রেয় ও প্রেয় বস্তু লাভের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। প্রেয় বস্তু ঐহিক, শ্রেয় আত্মিক। প্রেয় বস্তুর সান্নিধ্যে এসে মানুষ অনুভব করে সে কিছু পেয়েছে—যেমন জাগতিক ধন মান ঐশ্বর্য যশ। কিন্তু শ্রেয় বস্তুর সান্নিধ্যে এসে মানুষ অনুভব করে সে কিছু হয়েছে। সেজন্য শ্রেয় ও প্রেয়-র দ্বন্দ্ব 'হওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্ব'। জীবনে শ্রেয়ের সন্ধান পেলে মানুষ হয় নির্মোহ, জাগতিক ধনৈশ্বর্যকে সে অত্যন্ত সহজেই উপেক্ষা করতে পারে—যেমন পেরেছিলেন মহামানব বুদ্ধদেব। মানব-ধর্মের প্রকৃত উদ্বোধন এই শ্রেয়োবোধের জাগরণে।

এই শ্রেয়োবোধেরও স্তরবিভাগ আছে। ব্যক্তির মুক্তি-কামনার মধ্যে যে শ্রেয়োবোধের প্রকাশ সে শ্রেয়োবোধ খণ্ডিত, আর সমষ্টির মুক্তি-কামনায় যে শ্রেয়োবোধের বিকাশ মানুষের ধর্ম সেখানে সহস্রদল পদ্মের মত বিকশিত। সর্বমানবের মুক্তি-কামনার মধ্য দিয়ে মানবধর্মের পরিচয় হয় সার্থক। মানুষের ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ উদার উপলব্ধি তাঁর জাগ্রত মনকে মিলিত করেছে বুদ্ধ চৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহামানবদের বিশ্বচৈতন্যযুক্ত মনের সঙ্গে।

মানুষের ব্যক্তিসত্তার দুই রূপ : এক রূপ অহং আর এক রূপ আত্মা। অহং-এর প্রভাবে মানুষের মনের হয় সঙ্কোচ আর আত্মার বিকাশে মনে আসে সীমাহীন বিস্তৃতি। ব্যক্তিগত 'আমি' লোভী, আর নৈর্ব্যক্তিক 'আত্মা' সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত। এই আত্মিক সাধনাতেই মানুষের মনে জ্বলে ওঠে আলো,—'তখন ছোট হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহঙ্কার। জ্ঞানে প্রেমে ভাবে—বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা'।

এ দুই ভাবের প্রচণ্ড বেগ লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ বর্তমান মানুষের মধ্যে :

> একদিকে ব্যক্তিগত 'আমি'র টানে ধনসম্পদ ও প্রভুত্বের আয়োজন পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে, আর একদিকে অতিমানবের প্রেরণায় পরস্পরের সঙ্গে তার কর্মের যোগ, আনন্দের যোগ, পরস্পরের উদ্দেশে ত্যাগ।

এ ভোগ ও ত্যাগ, হিংসা ও ক্ষমার দ্বন্দ্বে মানবধর্ম আজ আন্দোলিত। এক দিকে অহং-এর প্রসারে আত্মার অবক্ষয়, আর এক দিকে আত্মার মহিমায় অহং-বোধের পরাজয় :

> মানুষের অন্তরে একদিকে পরম-মানব, আর একদিকে স্বার্থসীমাবদ্ধ জীব-মানব, এই উভয়ের সামঞ্জস্য-চেষ্টাই মানব-মনের নানা অবস্থা অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্মতন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত।

কিন্তু এ সামঞ্জস্য-সাধনায় মানবধর্মের বিকাশ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে মানবধর্মের প্রকৃত বিকাশ হবে আত্মার উন্মেষে। মননধর্মী কবি বলেন :

> অহং সীমার মধ্যে যে সুখ-দুঃখ আত্মার সীমায় তা রূপান্তর ঘটে। যে মানুষ সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের জন্যে, লোকহিতের জন্যে—বৃহৎ ভূমিকায় যে নিজেকে দেখেছে, ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের অর্থ তার কাছে উল্‌টো হয়ে গেছে। সে মানুষ সহজেই সুখকে ত্যাগ করতে পারে এবং দুঃখকে স্বীকার করে দুঃখকে অতিক্রম করে।

আত্মার সংস্পর্শে আগত এ রূপান্তরিত মানুষের সকল প্রয়াস নিযুক্ত হয়েছে সর্বযুগে 'মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার

জন্যে সেই সত্য, যা তার পুঞ্জিত দ্রব্যভারের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত প্রথা মত বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো, যার মৃত্যু নেই, যার ক্ষয় নেই'। সেই সত্য উপলব্ধিতেই মানবধর্মের প্রকৃত পরিচয়।

মানুষের ধর্ম ও মানবসত্যের মহত্তম স্বরূপ উপলব্ধির জন্যে রবীন্দ্র-মন একদিকে যেমন বিচরণ করেছে হিন্দুর সনাতন ধর্মগ্রন্থ বেদ ও উপনিষদের জগতে এবং মহামানবদের জীবন ও বাণীর মধ্যে তেমনি সহজপন্থী বাউলদের স্বতঃ উৎসারিত মর্মসঙ্গীতের মধ্যেও সে ভাবগ্রাহী মন শুনতে পেয়েছিল মানবধর্মের সত্যবাণী। উপনিষদের ঋষির মত ব্রাত্য বাউলও দেবতাকে অন্বেষণ করে নিজের মধ্যে, আর তাকে বলে 'মনের মানুষ'। দেবতার এ আন্তর উপলব্ধির দ্বারা বাউল আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে। বাউলদের মত 'বৃহদারণ্যক'ও বাহ্যিকতাকে হীন বলে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, 'যে দেবতাকে আমার থেকে পৃথক করে বাইরে স্থাপন করি, তাঁকে স্বীকার করার দ্বারাই নিজেকে নিজের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিই'।

দেবতাকে স্বীয় অন্তরে উপলব্ধি-প্রয়াসের মধ্যে 'অহং'-ই প্রাধান্য পায় বলে প্রথমে ভ্রান্তি জন্মে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন, বাউলের 'সোহহং' তত্ত্বে 'অহং'-এর স্থান গৌণ। নিজের মন বা আত্মার মধ্যে নিখিলের যোগ বা বিশ্বানুভূতিই বাউলের আন্তর সাধনার প্রধান কথা। এ সাধনা কঠিন এবং দুঃসাধ্যব্রতী মানুষেরই উপযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের মতে বৃহতের উপলব্ধি :

> বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পূজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ-পালনে উপাসনা করা সহজ ; কিন্তু আপনার চিন্তায় কর্মে পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সব চেয়ে কঠিন সাধনা।

মানুষের রিপু যখন প্রবল হয়ে উঠে তখন মানুষ পরমাত্মা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে অহং-বোধের প্রভাবে অহংকৃত হয়ে উঠে।

তখনই মানুষ হয় মানবধর্ম থেকে ভ্রষ্ট। সেজন্য তত্ত্বান্বেষী রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার বলে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে আমাদের সমাজে অনুভূত হচ্ছে, সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠছি।

অভিব্যক্তি-ধারায় মানুষের মন অন্তর্মুখী হয়েছে, অনুভব করেছে স্বীয় মনের ভিতর বিশ্ব-চৈতন্যকে। 'জ্বলে উঠল যখন ধীশক্তি, তখন চৈতন্যের রশ্মি চলল সংকীর্ণ জীবনের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বভৌমিকতার দিকে'। মধ্যযুগের সাধক রজ্জবের বাণীর ভিতর তত্ত্বান্বেষী রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেলেন মানবধর্মের সত্য বাণী, 'সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ, না মিলৈ সো ঝুঁট্,' অর্থাৎ সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে।

স্বীয় অন্তরে এ বিশ্বচৈতন্যের জাগরণের ফলেই ব্রাহ্মণ রামানন্দ একদিন আলিঙ্গন করতে পেরেছিলেন নাভা চণ্ডালকে, জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে। ব্রাহ্মণেরা সংস্কারবশে সেদিন তাঁর এ সামাজিক কাজকে ধিক্কৃত করেছিল কিন্তু তিনি ছিলেন অবিচল। অনুরূপ উপলব্ধির ফলে যীশুখ্রীষ্টও বলেছিলেন, 'আমি আর আমার পরম পিতা একই'। কেন না তাঁর যে প্রীতি, যে কল্যাণবুদ্ধি সকল মানুষের প্রতি সমান প্রসারিত সে প্রীতির আলোকেই আপন অহং-সীমা ছাড়িয়ে পরমমানবের সঙ্গে নিজেকে অভেদ দেখেছিলেন। বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন ব্রহ্মবিহার তারও অর্থ হল—অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে। অন্তর্লোকে এই বিশ্বচৈতন্যের অনুভবই মানুষকে জাগ্রত করেছে মানবধর্ম-বোধে।

প্রাণী-জগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু অমেয় প্রাণশক্তিতে নয়,—তাকে ঘিরে মানবমহিমার যে অম্লান জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সে জ্যোতিই দিয়েছে তাকে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব। এ মহিমাই তাকে সবল করেছে 'সোঽহম্' তত্ত্ব প্রচারে—মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি

ঘটেছে যে তত্ত্বে। এ 'সোঽহম্' অবশ্য ব্যক্তিগত মুক্তিই ঘোষণা করেনি—সমষ্টিগত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র ঘোষিত হয়েছে এ তত্ত্বের মধ্যে। মানবধর্ম উপলব্ধিতে যাঁদের জীবন সার্থক হয়েছে, তাঁরা শুধু নিজের মুক্তিচিন্তা নিয়েই তৃপ্ত থাকেন নি। তাঁদের জীবনের রথ অগ্রসর হয়েছে বিশ্বজনের কল্যাণ কামনায় বিচিত্র কর্মের পথে। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারতের 'সোঽহম্' তত্ত্ব উপলব্ধি ধ্যানস্তব্ধ নয়, কর্মনির্ভর—'কেন না যাঁরা মহাত্মা, তাঁরা বিশ্বকর্মা'।

মানবধর্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রবীন্দ্র-মন আশাবাদী। অহং-সীমায় আবদ্ধ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে মহামানবের আবির্ভাব দেখে তিনি মনে করেন, ধীর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'জীব-মানব কেবলই তার অহং-আবরণ মোচন করে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে বিশ্বমানবে। বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজছে সেইখানে, এই বিশ্ব-পৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানবে'। আমরা যারা ক্ষুদ্র মানুষ, সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আমরা বর্তমান মানুষের অহংবোধ ও মানবধর্মচ্যুতি দেখে ক্ষুব্ধ হই, দুঃখ বোধ করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সীমাহীন অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে অমিতবীর্য মানুষের অক্লান্ত জয়যাত্রা দেখে মানবধর্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হয়েছেন আশান্বিত। তাঁর এ আশাবাদ শুধু কবির ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ আশাবাদের ভিত্তিভূমি সমাজ-তাত্ত্বিকের বস্তুদৃষ্টি ও তত্ত্বান্বেষীর ভাবদৃষ্টি। স্বীয় অননুকরণীয় ভঙ্গীতে তিনি বলেছেন :

> জগতে বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণকনায়, তারপর জন্তুতে, তারপর মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগল। মানুষে এসে যখন ঠেকল, তখনই যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়। দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে। মানুষ বলতে পারলে, যাঁরা সত্যকে জানেন তাঁরা 'সর্বমেবাবিশন্তি'—সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।—

> আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকীরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি তার মহৎকে তার মহামানবকে...দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয় তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক—মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত ক'রে বলতে পারুক 'সোঽহম্'।

'মানুষের ধর্ম' উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি মননশীল কবিকে উত্তীর্ণ করেছে সর্বযুগের মানবহিতব্রতী মহামানবদের সমপর্যায়ে।

র বী ন্দ্র সা হি ত্য

প্রাক্‌-কথন

বহু শতাব্দীর গ্রন্থবদ্ধ মানব-হৃদয়ের ভাষাকে লক্ষ্য করে 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে বিস্মিত উক্তি করেছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিপুল প্রসার ও গভীরতা সম্পর্কে একটু পরিবর্তিত আকারে একই উক্তি উচ্চারণ করলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানবহৃদয়-'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল' যেন 'ঘুমিয়ে-পড়া শিশুটির মত' চুপ করে আছে। স্মরণাতীত অতীতের 'নীরব মহাশব্দ' এখানে স্তম্ভিত বিস্ময়ে প্রকাশিত। 'মানবাত্মার অমর আলোক' রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে'। 'হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে' তেমনি রবীন্দ্রসাহিত্যে শত যুগের অজস্র 'মানব হৃদয়ের বন্যা' অপরূপ সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে বন্ধন স্বীকার করেছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে একথা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না যে-মানুষ 'সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে' এত সুন্দর বাণীমূর্তি দিতে পারে, 'অতীতকে বর্তমানে' এত সৌন্দর্যের প্রচ্ছদে ভূষিত করতে পারে, 'অতলস্পর্শ কাল সমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই' দিয়ে এত অপরূপ স্বর্ণসেতু রচনা করতে পারে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য মানব হৃদয়ের অগণ্য পথের সন্ধান দিয়েছে: 'কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়েছে, কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব হৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে-দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না'। রবীন্দ্র-সাহিত্য

বিশ্বের মানব হৃদয়ের দ্বারে মহৎ মুক্তির নির্বাধ আনন্দধ্বনিকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। বিশ্বসাহিত্য সভায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের গৌরব হল এখানে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য শুধুমাত্র মানবহৃদয়ের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বকে অপূর্ব শিল্পকৌশলে সুন্দর বাণীরূপ দেয়নি, সে সাহিত্য 'মানব-হৃদয়ের উত্থান পতনের শব্দ'-মুখরিত। সেখানে 'জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে'। 'বাদ ও প্রতিবাদ' সেখানে 'তুই ভাইয়ের মতো' পাশাপাশি অবস্থান করে। 'সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার' সেখানে 'দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে'। সেখানে 'দীর্ঘপ্রাণ স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না'।

শুধু সর্ব যুগের নয়, সর্ব দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণীকে ধ্বনিত করে তুলেছে বিপুল-প্রসার রবীন্দ্র-সাহিত্য। 'কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো, এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসঙ্গীত গান হইতেছে'।

রবীন্দ্র-সাহিত্য নিখিল মানব-অন্তরের আলোকচ্ছটায় উদ্‌ভাসিত। জগতের একতান সঙ্গীত সভায় পরম ঐক্যের বাণী বহন করে এনেছে রবীন্দ্র সাহিত্য। দিগন্ত-বিস্তৃত ও অতলস্পর্শ মানবিক মহানুভূতির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন :

> দেশ বিদেশ হইতে, অতীত-বর্তমান হইতে, প্রতিদিন আমাদের কাছে মানব জাতির পত্র আসিতেছে···সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, ···জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার উপরকার লাউ-কুমড়া লইয়া মকদ্দমা ও আপিল চালাইতে থাকিব।

বাঙলা দেশকে অন্তরের সমস্ত আকুলতা দিয়ে ভালবেসেও বাঙালী জীবনের সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বহৃদয়ের হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পেয়েছিলেন কান পেতে। স্বদেশের ভাষায় তিনি বিশ্বহৃদয়ের ভাষাকে অপূর্ব বাণীভঙ্গীতে রূপ দিয়েছেন। আজ বিশ্বজীবন-সঙ্গীত মধুরতর হয়েছে বাঙালী-কণ্ঠের বিচিত্র সুরের সংযোগে।

রবীন্দ্র সাহিত্যের পরম পরিণতি হল এখানে। আধুনিক বিশ্বের বিপুল-গভীর সাহিত্য-সীমায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশিষ্ট মূল্যও খুঁজতে হবে এখানে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা

আমাদের প্রাচীন আলংকারিক 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা'কে প্রতিভার পরিচায়ক বলে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ গভীর প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও অসামান্য রসবোধের সাহায্যে কাব্যজগতে যে অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করে গেছেন তা তাঁর কবিপ্রতিভার চূড়ান্ত নিদর্শন মনে করতে কোন বাধা নেই। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় প্রতিভার বহুমুখী বিকাশ সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি-পরিচয়কেই বড় করে দেখেছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দিক্-নির্ণয়ে এটা খুবই অর্থব্যঞ্জক। নিজের সাঙ্গীতিক প্রতিভা, চিত্রনির্মাণ নৈপুণ্য, কথাশিল্প-রচনাদক্ষতা, নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে কবি যে অনবহিত ছিলেন এ কথা বলা চলে না। তথাপি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংকৃত আত্মপরিচয় ব্যাখ্যায় কবি-পরিচয়ের উপর এতটা জোর দিলেন কেন?—এ প্রশ্ন যে কোন রবীন্দ্র-পাঠকের মনকে আলোড়িত করে।

রবীন্দ্র-জীবনের বিচিত্র প্রকাশের দিকে লক্ষ্য করলে এ প্রশ্নের সদুত্তর পেতে পাঠককে বেগ পেতে হয় না। ভাব ও কর্ম-জীবনে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কবি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রকাশের জগতে কবি সব চাইতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন কাব্য রচনায়। নিজের দীর্ঘ জীবনের ষাট বৎসরের অধিককাল সময় কবি কাব্য-কবিতা রচনা করেছেন। যেদিন কোন কারণে কবিতা রচনায় ছেদ পড়ত সেদিনটিকে মনে করতেন তিনি বন্ধ্যা। জৈবিক জীবনে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্তিতে মানুষ যে তৃপ্তি অনুভব করে সে একই তৃপ্তি অনুভব করতেন কবি তাঁর অনির্বাণ প্রকাশ-পিপাসাকে কাব্যের আকাশে মুক্তি দিয়ে। কাব্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের এ স্বতঃস্ফূর্তি দেখে

রবীন্দ্র-অনুরাগী অধ্যাপক গিলবার্ট মারে বলেন :

> 'He was indeed one of those who 'lisped in numbers, for the numbers came'. His life was a constant poem ; and consequently a poem which, like life itself, is infinitely varied, infinitely monotonous.'
>
> (দ্রষ্টব্য : অরবিন্দ বসু সম্পাদিত *Wings of Death*-এর ভূমিকা)

বস্তুতপক্ষে কাব্যের সঙ্গে একান্তভাবে সমন্বিত এরূপ একটি জীবন পৃথিবীর কাব্যেতিহাসে দুর্লভ।

Capacity for taking infinite pains-কে আক্ষরিক অর্থেও যদি প্রতিভার অন্যতম লক্ষণ বলে স্বীকার করা হয় তাহলে সহস্রাধিক কবিতা এবং দুই সহস্রাধিক সঙ্গীত রচনা করে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে বড় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-কাব্যের এ অজস্রতা ও বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কেউ কেউ তাঁকে তুলনা করেছেন ভিক্টর হ্যুগোর সঙ্গে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আয়াস স্বীকার শুধুমাত্র কাব্য সঙ্গীতের পরিমাণগত প্রসারের দিক দিয়ে সত্য নয়— গুণগত মূল্যের দিক দিয়েও বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। যে আবেগময় ভাববস্তুর সাহায্যে জীবনের প্রায় সমস্ত প্রান্ত স্পর্শ করে রবীন্দ্রনাথ এ বিপুল-প্রসার কাব্যসঙ্গীত রচনা করেছেন সে ভাববস্তুকে বিলাসী কবিকল্পনার ফেনায়িত বুদ্বুদ মনে করে কোন কোন আধুনিক সমালোচক যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করুন না কেন— কবিচিত্তের যে গভীর মনন ও মানবিক সহানুভূতি থেকে তাদের উদ্ভব তাতে তাদের গুণগত উৎকর্ষ পৃথিবীর কাব্যসভায় চিরদিন সমাদৃত হবে সন্দেহ নেই।

সেক্সপীয়রের উত্তুঙ্গ কাব্য-সিংহাসনের দিকে লক্ষ্য করে ম্যাথু আর্নল্ড-এর কবিকণ্ঠ থেকে একদিন যে পরম বিস্ময়ের বাণী নিসৃত হয়েছিল এ যুগে সে একই বিস্ময়ের বাণী ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার উদ্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বহু মননশীল ব্যক্তির মুখ থেকে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্যতা প্রদর্শন করে

জনৈক মননশীল লেখক বলেছেন : 'তাজমহল নির্মাণের পরে আশাহীন ও নিবীর্য ভারতবাসী বহু শত বর্ষব্যাপী অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষমতা হারিয়ে জগৎসভায় বিস্মৃত হতে চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ অত্যাশ্চর্য কাব্যপ্রতিভার সাহায্যে এ যুগে অপূর্ববস্তু নির্মাণ করে জগৎসমক্ষে পুনরায় ভারতবাসীর সে সৃষ্টিপ্রতিভার পরিচয়কে উজ্জ্বল করে তুলেছেন (দ্রষ্টব্য : *Golden Book of Tagore : Rabindranath's Place in Indian Literature* : Nanalal Mehta, Nainital)। একই গ্রন্থে আমেরিকা শিকাগো নগর থেকে জেন এ্যাডাম্‌স লিখেছেন : 'বর্তমান জটিল যুগে মনীষার সব চাইতে বড় দান বোধ হয় বিভিন্ন মানব-অভিজ্ঞতার মধ্যে পরম ঐক্যের আবিষ্কার —যে আবিষ্কারের সাহায্যে বর্তমান মানুষের বানিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থকেও মননশীল এবং আবেগময় প্রেরণায় একটা বোঝাপড়ার সীমায় আনা যেতে পারে। বর্তমান বিজ্ঞান আধুনিক জীবনের সে মিলনের মহান পথকে বাধামুক্ত করলেও সে মিলনকে সম্পূর্ণরূপে সার্থক করে তুলতে পারে মানুষের অসামান্য প্রতিভা। মানব-মিলনের উদ্দেশ্যে প্রতিভাবানের বাণী শুধু স্বতঃস্ফূর্ত হলেই চলেনা —সে বাণীর মধ্যে থাকা চাই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যে একটি অব্যর্থ আবেদন। সে জন্য প্রতিভাবানের বাণীর মধ্যে শুধু বৈচিত্র্য থাকলেই চলেনা—সে বাণী হওয়া চাই গভীর। সে বাণী লোকমনে যেমন আনন্দ বিধান করবে তেমনি সে বাণী হবে মর্মভেদী। সর্বোপরি বিভিন্ন মানুষের মধ্যে—বিশেষ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে ব্যবধানের যে দুস্তর সমুদ্র বিদ্যমান সে ব্যবধানকে দূর করে মানুষকে ঐক্যের স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধতে পারে একমাত্র প্রতিভাবানের মাধুর্যশ্রীমণ্ডিত সুন্দর বাণী। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক একটি মাত্র ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রতিভার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এ সমস্ত গুণের একত্র সম্মেলন ঘটেছিল। তিনি ছিলেন একাধারে কবি দার্শনিক মানবতাবাদী এবং লোকশিক্ষক।'

নরওয়ের মননশীল লেখক জন বোয়ার (*John Bojer*) রবীন্দ্রনাথকে অভিহিত করেছেন ভারতাত্মার প্রতীক বলে। পাশ্চাত্ত্যের জন্যে তিনি যে বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন তা বেদনার নয়—আনন্দের সৌন্দর্যের। রবীন্দ্রকাব্যের সর্বজনীনতামুগ্ধ জন বোয়ার বলেন: 'রবীন্দ্রকাব্য বিশেষ কোন জাতের নয়। সে কাব্য বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ ফুল। সে ফুলকে সৃষ্টি করেছে সূর্যের অবারিত আলোক আর বর্ষার অক্লান্ত বর্ষণ। মানুষের প্রতি দুর্বার ভালোবাসা রূপ পেয়েছে তাঁর অনবদ্য কাব্যসঙ্গীতে। তিনি জানেন, ঘাসের উপর শিশিরবিন্দু যেমন পারে স্বর্গকে প্রতিবিম্বিত করতে তেমন মানুষের মনও পারে ভগবানের আভাসকে ফুটিয়ে তুলতে। তাঁর ধর্মের অবস্থান আশা বা ভয়ের উর্ধ্বে—আধ্যাত্মিকতার শান্তিস্বর্গে। মানবাত্মাই সে স্বর্গ অনুভবের উপযুক্ত বাহন'।

রবীন্দ্র-প্রতিভামুগ্ধ নরওয়ের আন্দ্রে বুতিসন (Andrea Buteuschon) পরম বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছেন: 'পৃথিবীতে কে তোমার মত আনন্দ ও বেদনার বাণীকে একই সঙ্গীতসূত্রে বেঁধে দিতে পেরেছে? তোমার সঙ্গীতে যেন 'পাতায় পাতায় আনন্দের নৃত্য এবং সে আনন্দ সীমাহীন।' তোমার আনন্দানুভূতি আমাদের চিত্তে সে আনন্দময় অনুভবকে জাগ্রত করে— 'যে আনন্দের শান্ত অবস্থান বেদনার রক্তপদ্মের উপর এবং যে আনন্দ ধূলোয় ধূলোয় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে একটি অনির্বচনীয় শান্তির মধ্যে মগ্ন হয়ে যায়'—যারা তোমার এ বাণীর অর্থ বুঝতে পেরেছে পৃথিবীতে তারা ভয়োত্তীর্ণ'।

ন্যু ইয়র্কের কম্যুনিটি চার্চ থেকে জন হোম্‌স লিখেছেন: 'আমাদের মত যারা পাশ্চাত্ত্যের মানুষ তারা সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে একজন বলে মনে করে। হোমার যেমন প্রাচীন গ্রীসের, দান্তে যেমন মধ্যযুগের ইটালির সংস্কৃতির প্রতিভূ, রবীন্দ্রনাথও তেমনি নিজের দেশের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। হোমার ও দান্তের বাণীর মত তাঁর বাণীও মানবতার ঐকতানের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে।

কবি ও দার্শনিক হিসেবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে সেতুবন্ধনের অগ্রদূত হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দৈব অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি যেন এক ভূখণ্ডের মানুষের কাছে অপর ভূখণ্ডের মানুষের মর্মবাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন'।

ডার্মস্টাড্ট্, জার্মানি থেকে রবীন্দ্র-বন্ধু দার্শনিক কাইসারলিং লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ একটি জাতির স্রষ্টা। ...অধিকাংশ জাতিসৃষ্টির মূলে কার্যকরী হয়েছে কোন মহৎ কবির প্রেরণা—যিনি জাতির দ্বিধাকম্পিত আকাঙ্ক্ষাকে কাব্যে সজীব বাণী দিয়েছেন। অরফিয়সকে গ্রীক জাতির জনক বলে স্বীকার করে নিলেও য়ুরোপে এ ধরনের সর্বশেষ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বোধ হয় হোমার। গ্রীসের পক্ষে হোমারের স্থান যা ভারতবর্ষের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের স্থানও তাই —আগামী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। ভারতবাসীর পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা স্পৃহাকে মহান সঙ্গীতের মধ্যে রূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক ভারতবাসীকে মানবতার মর্যাদায় সর্বপ্রথমে উন্নীত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ...জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমি সব চাইতে প্রশংসা করি, কারণ আমার জানাশোনার মধ্যে এত বড় সার্বজনীন সর্বব্যাপক এবং পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী মানুষ আমি আর দেখিনি'।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে জ্ঞানতাপস আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেন: 'কবিতার সৃষ্টিরহস্য ও বিচারের মাপকাঠি আবেগের ঊর্ধ্বায়ন, কল্পনার নবরূপায়ণ কিংবা নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনা মাত্র নয়—কিন্তু এ সমস্তের মধ্য দিয়ে একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি—যে ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র জীবন-পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বিশ্বের প্রতি একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে পারে। উপরোক্ত মাপকাঠিতে বিচার করলে দেখা যায় কাব্যরচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা পূর্ণতার দাবি রাখে'।

রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবিকাশ নির্ণয় প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেন:

'প্রথম যুগের রবীন্দ্রকাব্যে শুধু আবেগেরই উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। ক্রমশ তার সঙ্গে যুক্ত হল শিল্পি-কল্পনার নব-রূপায়ণ (যেমন, উর্বশীতে)। রবীন্দ্রনাথের কবিকর্ম অবশেষে অশেষ মূল্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠল জীবন-সমালোচনার প্রকাশে। কাব্যে এ জীবন-সমালোচনা অবশ্য আবেগ বা কল্পনাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। সর্বশেষে পরিণত কবিসিদ্ধিতে দেখা যায় উপরোক্ত সমস্ত শিল্প প্রকরণের সাহায্যে তিনি এমন একটি সৃজন-কর্তৃত্ব লাভ করেছেন যা ব্যক্তিগত জীবন-পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে কবির ব্যক্তিত্ব-বিকাশকে সম্ভব করে তুলেছে। শুধু তাই নয় জগতের প্রতি একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীকেও উদ্ভিন্ন করেছে'।

নৈনিতাল থেকে ননলাল মেহ্‌তা ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আরো লিখেছেন: 'কালিদাসের পরে রবীন্দ্রনাথের মত আর কোন কবি ভারতের আত্মাকে এত সুন্দরভাবে প্রতিবিম্বিত বা মূর্তি দিতে পারেন নি। সাম্প্রতিক কালে তাঁর তুলনা চলে একমাত্র মহান কবি গ্যয়েটের সঙ্গে—যিনি ভবিষ্যৎ জার্মানিকে তাঁর কাব্যে প্রতীকীত করে তুলেছিলেন। গ্যয়টে ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের বৈশিষ্ট্য হল প্রতিভার বহুমুখিতা ও শব্দ-সঙ্গীতের উপর অনন্যসাধারণ কর্তৃত্ব। ভাষাশিল্পের উপর ব্যাপক ও গভীর অধিকার রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রধান লক্ষণ। রবীন্দ্রকাব্যের অতীন্দ্রিয় ভাবধারা ও মানবতাবাদ, রহস্যময়তা ও বিশ্বমানবতা,—এ সবই পেয়েছিলেন তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার সূত্রে। কৌতূহলের বহুমুখিতায় এবং প্রকাশের বিচিত্র ভঙ্গীতে তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের ছাড়িয়ে গেছেন।

প্রকাশ-বৈচিত্র্যের মধ্যে কবির নাটকীয় ভঙ্গী অন্যতম। এ নাটকীয় ভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও নাট্যকবিতায় মানুষের বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী অনুভূতির দ্বন্দ্বকে যে অব্যর্থ রূপ দিয়েছে তার তুলনা বিরল। কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্থান আমাদের প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের পাশে। বৈষ্ণব কবিদের কাছে ঋণ স্বীকারে

তিনি কখনও দ্বিধা করেন নি। বৈষ্ণব-প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথের নিকট কাব্যের বাইরের রূপটা বড় নয়—তার অন্তর্নিহিত ভাবটাই প্রধান। কাব্যের বহিরঙ্গের চাইতে অন্তরের ভক্তিভাব—এক কথায় অন্তরের পরিচয়কেই তিনি কাব্য রচনায় মুখ্য করে তুলেছেন। মহৎ কবিতার লক্ষণও হল বিষয়ের সঙ্গে কবির অন্তরতম সহানুভূতি এবং কবি-আত্মার আভ্যন্তরীণ সমন্বয়বোধ। এ সমস্তের অভাবে কাব্য শুধু ভাষার ইন্দ্রজালে মনোহর হয়ে উঠে। মানব অন্তরের গভীরে প্রবেশ করবার অন্বিষ্টার চাইতে শব্দ ও ভাষার কারিকুরির দিকেই তখন লক্ষ্য হয় বেশী। ভাবের মুক্ত আকাশে নির্বাধ সঞ্চরণ তখন কবির পক্ষে সম্ভব হয় না'।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *Golden Book of Tagore* গ্রন্থে পৃথিবীর কোন কোন মননশীল ব্যক্তি রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্পর্কে যে সমস্ত বিস্মিত উক্তি করেছিলেন তার কয়েকটি মাত্র অংশের ভাবানুবাদ সঙ্কলিত হয়েছে উক্ত অংশে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-ব্যক্তিত্ব এত ব্যাপক, এত বৃহৎ এবং এত সর্বগ্রাসী যে এ কয়েকটি মূল্যসমৃদ্ধ উক্তির মধ্যে সে দেশকাল-পরিব্যাপ্ত কবিসত্তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—কত দেশ কত যুগের ভাব ও ভাবনা, কর্ম ও সাধনা, আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার বাণীকে আত্মসাৎ করে কবি রবীন্দ্রনাথ নামক মৃত্যুঞ্জয় বনস্পতির সৃষ্টি। সে মহান সৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা করতে গেলে একদিকে যেমন প্রয়োজন ঐতিহাসিক সত্যদৃষ্টির আর একদিকে তেমনি প্রয়োজন তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির। বর্তমান গ্রন্থের সীমাবদ্ধ পরিসরে এ উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্তৃত প্রয়োগে রবীন্দ্র-কবিব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় লাভ সম্ভব নয়। বিপুলপ্রসার রবীন্দ্রকাব্যে এ দেশকালজয়ী কবিপ্রতিভার পরিচয় কিভাবে এবং কত সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে—সে সম্পর্কে ক্ষুদ্র একটি রূপরেখাঙ্কণ করাই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করে ইংরেজীতে অনূদিত গীতাঞ্জলির সাহায্যে নোবেল প্রাইজ পাবার পর। অথচ একথা অনস্বীকার্য রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার আসল পরিচয় নিহিত রয়েছে তাঁর মাতৃভাষায় রচিত অসংখ্য গীতি-কবিতায়। এ বিশ্ববিজয়ী কবিপ্রতিভার জাগরণের মূলে বহু শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সব চাইতে বড় যে শক্তি রবীন্দ্রনাথকে চিরযুগের কবিসভায় একটি অগ্রগণ্য আসনের অধিকারী করেছে সে হল তাঁর লিরিক-প্রতিভা। কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের অঙ্গাঙ্গী সংমিশ্রণে পাঠক-অন্তরে যে বিচিত্র রাগিণী বেজে উঠে সে ঐন্দ্রজালিক সুরের স্পর্শে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকে করে তুলেছেন সঙ্গীতধর্মী। অত্যাশ্চর্য সাঙ্গীতিক প্রতিভার অধিকারী কবি সঙ্গীতের সঙ্গে কবিতার ভেদরেখা প্রায় মুছে দিয়েছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা সঙ্গীতের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে আবার বহু সঙ্গীতও কাব্যধর্মী রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গীতমুগ্ধ কোন কোন পাঠক সবিস্ময়ে তাই প্রশ্ন করেছেন—সাঙ্গীতিক ও কাব্যপ্রতিভার মধ্যে কবির কোন প্রতিভা বড়? কেউ কেউ কবির সাঙ্গীতিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবার পক্ষপাতী। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি অসামান্য সাঙ্গীতিক প্রতিভার অধিকারী কবি দিগন্তবিস্তৃত কল্পনা, অতলান্ত সহানুভূতি এবং অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনাকে সাঙ্গীতিক উচ্ছ্বাসের সাহায্যে কাব্যে যে অব্যর্থ শিল্পরূপ দিয়েছেন তা সুরপ্রবণ অনুভূতিশীল চিত্তকে এ অপরূপ কাব্যজগতের দিকে চিরকাল আকর্ষণ করবে।

শুধুমাত্র সুরমাধুরী নয় পরম ঐশ্বর্যময় অপূর্ব চিত্রসম্পদও রবীন্দ্র-নাথের কাব্যপ্রতিভার পূর্ণ জাগরণের মূলে। সঙ্গীত যেমন হৃদয়কে আকর্ষণ করে অনির্বচনীয় ভাবজগতের দিকে, প্রকৃতি-জগৎ ও মানব জীবনের বিচিত্র বর্ণালিম্পিত চিত্রও পাঠক-দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত করে এক সৌন্দর্য-পরিপূর্ণ জগৎ। ভাব থেকে রূপে আবার রূপ

থেকে ভাবে অবিচ্ছিন্ন গতিই রবীন্দ্রকাব্যের প্রাণ—একথা কবি তাঁর কাব্যধর্ম বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বহুবার স্বীকার করেছেন। রূপ ও রস জগতের মধ্যে অবাধ সঞ্চরণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহে শুধুমাত্র গতি সঞ্চার করেনি, সে কাব্যকে করেছে সতেজ সজীব—নিত্যনতুন রূপ ও ভাববৈচিত্র্যে পরম আস্বাদ্য। রবীন্দ্র-কাব্য প্রতিভার অসামান্যতার মূলেও রয়েছে এ গতিময় গীতোচ্ছ্বাস এবং স্থিতিশীল রূপোল্লাস। কাব্য-সাহিত্যে চিত্র ও সঙ্গীতের পারস্পরিক স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে'র অন্তর্গত 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে বলেছেন:

> ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিষ মিশাইয়া থাকে, চিত্র ও সঙ্গীত।
>
> কথার দ্বারা যাহা বলা চলেনা ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে ছবি আঁকার সীমা নাই।…এ ছাড়া ছন্দে শব্দে বাক্য-বিন্যাসে সাহিত্যকে সঙ্গীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনমতে বলিবার জো নাই এই সঙ্গীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য এই সঙ্গীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সঙ্গীতই সঞ্চারিত করিয়া দেয়।
>
> অতএব চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভাকে বিচিত্র অর্থে তাৎপর্যময় করেছে চিত্র ও সঙ্গীতের অপূর্ব গঙ্গাযমুনা সম্মেলন। রবীন্দ্র কবি-জীবনের ঊষালগ্নে কবির নব্যপন্থার গীতোচ্ছ্বসিত লিরিক কবিতা দেশব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেনি। সে অবস্থায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এ তরুণ কবির প্রতিভায় ভবিষ্যৎ বিশ্ববিজয়ী সার্থকতার সম্ভাবনা আবিষ্কার করে কবির গলায় নিজের বিজয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন। এ গীতোচ্ছ্বাস ও চিত্রধর্মিতা বিভিন্ন রূপ-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবিজীবনের প্রথম থেকে শেষ যুগ পর্যন্ত ছিল অব্যাহত।

চিত্রসম্পদ ও গীতিমাধুর্য কবির কাব্যকে পাঠকচিত্তের নিকট অতি দ্রুত আকর্ষণীয় করে সন্দেহ নেই কিন্তু চিরকালীন পাঠকের নিকট কবিতা মূল্যসমৃদ্ধ বিবেচিত হয় কবির বহুবিস্তৃত কল্পনা ও সুন্দর প্রকাশের জন্যে। সাহিত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

> কবির কল্পনা-সচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয় ততই তাঁহার রচনার গভীরতায় আমাদের তৃপ্তি বাড়ে। ততই মানববিশ্বের সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের চিরন্তন বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে। কিন্তু রচনা শক্তির নৈপুণ্যও সাহিত্যে মহামূল্য। কারণ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে শক্তি প্রকাশিত হয় তাহা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ হইলেও এই শক্তিটি একেবারে নষ্ট হয়না। ...এই ক্ষমতাটি লাভের জন্য মানুষ চিরকাল ব্যাকুল।

সাহিত্যের সামগ্রী সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনায়ও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে জোর দিয়েছেন রচনার উৎকর্ষের উপর ঃ

> এই কলাকৌশলপূর্ণ রচনা ভাবের দেহের মতো। এই দেহের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যকারের পরিচয়। এই দেহের প্রকৃতি ও গঠন অনুসারেই তাহার আশ্রিত ভাব মানুষের কাছে আদর পায়, ইহার শক্তি অনুসারেই তাহা হৃদয়ে ও কালে ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে।...ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের। তাহা একজন যদি বাহির না করে তো কালক্রমে আর একজন বাহির করিবে। কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। তাহা একজনের যেমন হইবে আর-একজনের তেমন হইবে না। সেজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে; ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।

রবীন্দ্র-কাব্যের অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তার মূলেও এ কলাকৌশলপূর্ণ রচনা শক্তি। চিত্র ও সঙ্গীত, ধ্বনি ও ইঙ্গিতের সাহায্যে কাব্য রচনায় সৌন্দর্যসৃষ্টির দিকে এত বেশী মনোযোগ এ যুগে খুব কমই দেখা গেছে।

কিন্তু অলংকরণ সৌন্দর্য ও প্রসাধনপ্রিয়তাই রবীন্দ্রকাব্যের একমাত্র গৌরব একথা মনে করার মত ভ্রান্তি আর কিছুই নেই। প্রসাধিত সৌন্দর্য কাব্যকে এক মুহূর্তেই পাঠকের নিকট প্রিয় করে সন্দেহ নেই কিন্তু ভাবগভীরতা বিষয়বৈচিত্র্য এবং কল্পনার প্রসার যে কাব্যের আবেদনকে বহুকালের দূরবর্তী মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়—একথা অস্বীকার করা যাবে কী? বস্তুতপক্ষে ভবিষ্যৎ কাব্য-পাঠককে রবীন্দ্রকাব্য যদি আকর্ষণ করে সে আকর্ষণ হবে কল্পনার সুদূরপ্রসারী বিস্তার, ভাবের গভীরতা এবং বিষয় বৈচিত্র্যের জন্যে। কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয় প্রসঙ্গে শেলী বলেছেন: কাব্য হল কবিকল্পনারই বিকাশ মাত্র—যে কল্পনা বিশ্বের গুহায়িত সৌন্দর্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। রবীন্দ্রনাথও শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণ হিসেবে বিশ্বব্যাপী কল্পনার উপর সব চাইতে বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেছেন:

> কবির কল্পনা-সচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয় ততই তাঁহার রচনার গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে। ততই মানববিশ্বের সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের চিরন্তন বিহার ক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে। (সাহিত্যের তাৎপর্য ॥ সাহিত্য)

সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের সীমাতিশায়ী কল্পনা নিকট ও সুদূর, স্বদেশ ও বিশ্ব, মানবহৃদয় ও অধ্যাত্মচেতনা, জন্ম ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য, আকাশ বাতাস জলস্থল—সব কিছুকে নিয়েই অপরিসীম ব্যাপ্তি লাভ করেছে। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতকে কল্পনার সাহায্যে এক অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখবার এবং সৌন্দর্যচর্চিত রূপ দেবার এত অনন্যসাধারণ ক্ষমতা পৃথিবীর কম কবির প্রতিভাতেই দেখা গেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্যতা হল এখানে।

কবি-কল্পনারও রূপভেদ আছে। এক ধরনের কবিকল্পনা শুধুমাত্র জগৎ ও জীবন-রহস্যের প্রান্ত স্পর্শ করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এ ধরনের কল্পনাকে বলা যায় খেয়ালী কল্পনা—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় *Fancy*. যে কবিকল্পনা কাব্যজগতে স্থায়িত্বের দাবি রাখে সে

কল্পনা শুধুমাত্র খেয়ালী হলে চলে না। সে কল্পনা হবে সৃষ্টিধর্মী —Constructive. সৌন্দর্য-বিলাসী কবি কীট্‌স বলেছেন—Invention বা আবিষ্কারই হল কাব্যের ধ্রুবতারা, কল্পনা হাল এবং ফ্যান্সি বা খেয়ালী-কল্পনা কাব্যের পাল মাত্র। এ রূপকল্পের অনুসরণে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর *New Essays in Criticism* গ্রন্থে বলেছেন, যে লিরিক সমুদ্রে নব্য রোমান্টিক যুগের বাঙালী কবিরা কাব্যতরণী ভাসিয়েছিলেন সে সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করবার জন্যে তাদের সামনে কোন ধ্রুবতারা বা তরণীর ভারসাম্য রক্ষার জন্যে কোন হাল ছিল না। শুধুমাত্র পালের উপর নির্ভর করেই তাঁরা কাব্যসমুদ্রে তরণী ভাসিয়েছিলেন। ফলে নব্য রোমান্টিক বাংলা কবিতায় জীবন-রহস্য সম্পর্কে নতুন আবিষ্কারের বিস্ময় নেই—নেই কোন সৃষ্টিধর্মী কল্পনার পরিচয়। যে সৃষ্টিধর্মী সমন্বয়ী কল্পনা কবিকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ জীবনসমালোচনায় প্রণোদিত করে প্রথম যুগের রোমান্টিক গীতিকবিতায় তার সূচনাও দেখা দেয়নি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের খেয়ালী কল্পনা-প্রধান কাব্য-কবিতাও এ মন্তব্যের ব্যতিক্রম নয়। কবির পরবর্তী কাব্য-কবিতায় সৃষ্টিধর্মী ও সমন্বয়ী কবিকল্পনা প্রাধান্য লাভ করায় সে কাব্য গভীর জীবন-সমালোচনায় মূল্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় নব্য রোমান্টিক কবিদের সবল কবিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী কবিদের প্রথম যুগের কবি-কল্পনাকে বলেছেন ছায়াময় ভাববিলাস মাত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কবিতাও এ আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের সীমাতিক্রমী নয়। য়ুরোপের নব্য রোমান্টিক কবিশ্রেষ্ঠ গ্যয়টের লিরিক-প্রতিভার বিকাশধারা দেখাতে গিয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন, গ্যয়টে যখন লিরিক কবিতার শিক্ষানবিশী করছিলেন তখন তাঁর কবিতা ছিল একান্তভাবে মন্ময়। শিক্ষানবিশী পর্ব শেষ হবার পর গ্যয়টের হাতে কাব্য-কবিতা আশ্চর্যভাবে তন্ময় হয়ে উঠে। অতঃপর মন্ময়তার

সঙ্গে তন্ময়তার অপরূপ সংমিশ্রণে য়ুরোপের বাস্তবজীবনকে স্পর্শ করে সে দেশের কাব্য-কবিতা প্রকৃত মূল্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠে। বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক, নন্দনতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রশ্নাত্মক—এমন কোন বিষয় নেই যা য়ুরোপীয় নব্য রোমান্টিক কবিতার পরিধি ও ভাবগভীরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেনি।

ভারতীয় জীবনে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত অভাব। এ দেশীয় জীবনে পাশ্চাত্ত্য বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার চাপের মত এত চাপও বেশী অনুভূত হয় না। সেজন্যে বিরেঞ্জার, মুসেট্, সান্ত ব্যভ্, থিয়োফিল গ্যোতিএ, সুইনবার্ণ, ক্লফ (Clough), বুকানন, দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি প্রভৃতি নব্য রোমান্টিক কবির কবিতায় পাশ্চাত্ত্য সমাজের ঐশ্বর্যময় বহুমুখী ও বিচিত্র প্রবণতা যেভাবে নানা বর্ণানুরঞ্জিত রেখায় আত্মপ্রকাশ করেছে বাংলা রোমান্টিক কবিতায় তা কখনও আশা করা যায় না। রোমান্টিক কবি শেলী ও কীটসের কাব্যে জীবনের পটভূমিকা খুব বৃহৎ ছিল বলা চলে না। তবু সমুচ্চ আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অথবা আত্মগত চেতনাপ্রসূত জীবন পুনর্গঠন প্রবৃত্তির সাহায্যে তাঁরা কাব্যে যে জটিল মননশীল কৌতূহল প্রদর্শন করেছেন তা দেখে আমরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হই। শেলীর মননশীল কৌতুহল কোন না কোন সময়ে যে সমস্ত বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করে অভিব্যক্তির পথ খুঁজছিল তাদের মধ্যে মুখ্য হল: মন্ময় এবং প্ল্যাটোনিক আদর্শবাদ, স্পিনোজীয় মতবাদ (Spinozism), ভলতায়ারীয় ও নিহিলিস্ট্ সংশয়বাদ, হেলেনীয় প্রবণতা এবং আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাশ্যবাদ ও সমাজবিদ্রোহ, ইতালীয় শিল্পানুরাগ ও রাসায়নিক সমীক্ষা, স্প্যানিশ রোমান্স ও সর্বেশ্বরবাদী দুর্জ্ঞেয়তা, দেহভিত্তিক ও পরীক্ষামূলক মনঃসমীক্ষা, বিষয়বিবিক্ত জীবননীতি, আইরিশ ও নব্য হেলেনিক রাজনীতি, জার্মান অধিবিদ্যা (metaphysics), গায়টের বিশ্বমানবতাবাদ, এবং কান্টের জীবন

সমালোচনাও ছিল শেলীর মানস-কৌতূহলের সামগ্রী। কীটসের মননশীলতা এবং মানসপরিধি শেলীর মত এত ব্যাপক ও কৌতূহলোদ্দীপক না হলেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে তা আশ্রয় খুঁজেছিল : মধ্যযুগীয় রোমান্স, হেলেনীয় পুরাণ কথা, ইটালীয় কাব্য এবং শিল্প, আধুনিক ইতিহাস ও জীবনী, বীরগাথা ও মহাকাব্য এবং সর্বশেষে বাস্তব জীবন এবং আবেগ-সমন্বিত এলিজাবেথীয় নাটক।

নব্য রোমান্টিক বাংলা কাব্যে এ মননশীল কৌতূহলের ছিল একান্ত অভাব। রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম পর্যায়ে কবির মননশীল কৌতূহল আত্মপ্রকাশ না করলেও ভানুসিংহ ঠাকুর ছদ্মনামে কবি কল্পনার সাহায্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে প্রাচীন সৌন্দর্য জগতের পুনর্গঠনে যে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছিলেন তা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় কীট্‌স-এর বিস্মৃত যুগের জীবনস্বপ্নকে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ নব্য রোমান্টিক বাংলা রচনার প্রথম সার্থক নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'কে। জীবনের স্বপ্নভঙ্গ ও নিরাসক্তি থেকে যে সংশয় ও নৈরাশ্য আসে সে ভাবানুভূতিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন লেখক গদ্যে লিখিত এ কাব্যোচ্ছ্বসিত রচনায়। গ্যয়টের প্রথম জীবনে লিখিত *The Sorrows of Young Werther* (১৭৭৪) রোমান্সেও সে অপ্রকৃতিস্থতা ও আত্মনাশী প্রবণতা ছিল কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে গ্যয়টের ভাবানুভূতির সর্বজনীনতা নেই। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে লেখকের নৈরাশ্যের উৎসে ছিল অপরিতৃপ্ত ও চির অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা—গ্যয়টের অন্তর-বেদনার ব্যাপকতা এ গদ্য রোমান্সে নেই। এ জন্যে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করেন বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের সূচনা মাত্রাতিরিক্ত ভাবপ্রবণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। য়ুরোপের রোমান্টিক আন্দোলনের সুপরিসর বিস্তৃতি সে আন্দোলনে ছিল না। উদ্বেল হৃদয়াবেগের প্রকাশে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় যে দার্শনিক 'মুডের' পরিচয় দিয়াছিলেন তা তাঁর অসুস্থ মনেরই উচ্ছ্বসিত

প্রকাশ মাত্র। জগৎনীতি, ভগবান, আত্মা, ব্যক্তিজীবনের অনশ্বরতা, স্বাধীন ইচ্ছা—সব কিছুকেই সংশয়ীর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের লেখক। অবশ্য এ উচ্ছ্বসিত ভাবপ্রবণতার কেন্দ্রে ছিল লেখকের সুগভীর প্রেম-প্রবৃত্তি।

বাংলা কাব্য প্রথাবদ্ধ ধর্ম ও নীতির অনুশাসনে যখন গতানুগতিক প্রাণহীন ও জীর্ণ হয়ে উঠেছিল সে অবস্থায় হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত হল এ গদ্যকাব্য। ধর্মানুভূতির স্থানে প্রাধান্য পেল লেখকের অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতি—যে অনুভূতির উৎস মুখ্যত মানবিক ও সামাজিক। এ কারণে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের সুর তরল ভাবালুতার উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তৎক্ষণাৎ পাঠকমনে যেন বিদ্যুতের চমক দিয়ে গেল। প্রেমজগতে মোহভঙ্গ নতুন কিছু সত্য নয়। সকল প্রেমই মোহভঙ্গের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমেও প্রেমের মোহভঙ্গটাই বড় কথা নয়। কিন্তু এ কাব্যে মন্ময় কামনা বাসনার সীমায় যে সীমাহীন আত্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে এবং যে আত্মবোধ সর্ব মনে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে—তাতে প্রকৃতি ও মানবমন জীবন এবং সমাজের চিত্র যেন অলক্ষ্যে আমাদের দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত হল।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্বেও সে তরল ভাবালুতাপূর্ণ আত্মগত বেদনা ও নৈরাশ্য। সে বেদনা ও নৈরাশ্যবোধ অহংপরায়ণ, জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন—নব্য রোমান্টিকতার পন্থানুসারী। যে সুগভীর স্বদেশানুভূতি ও বিশ্বানুভূতি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যধারাকে বিশ্বসমাজে জনপ্রিয় করেছিল কবির প্রথম পর্যায়ের কাব্য-নাটকে তা ছিল একান্তভাবে অনুপস্থিত। *Werther* রোমান্সে গ্যয়টের ভাবালুতাপূর্ণ বিষণ্ণতাকে ব্যঙ্গ করে থেকারে (Thackery) তাঁর ক্ষুদ্র একটি ব্যঙ্গ কবিতার সমাপ্তিতে লিখেছিলেন :

Charlotte, having seen his body
Borne before her on a shutter,
Like a well-conducted person
Went on cutting bread and butter.

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ নিতান্ত বেরসিকের মত রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার প্রথম পরিচায়ক কাব্যগ্রন্থ 'কড়ি ও কোমল'কে অহেতুক ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছিলেন। আসলে গ্যয়টের সমালোচকের মত রবীন্দ্রনাথের সমালোচকেরও ব্যঙ্গের লক্ষীভূত হওয়া উচিত ছিল প্রথম পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত কবির অকারণ বিষণ্ণতা। যে কবি-প্রতিভার খরদীপ্তি পরবর্তীকালে সমস্ত বিশ্ববাসীর অন্তরকে চকিতে বিদ্যুতস্পৃষ্ট করেছিল কবিকাহিনী ও বনফুলের মত বর্ণবৈচিত্র্য ও জীবনবোধহীন কাব্য দিয়ে তার শুরু হল কি করে তা ভাববার বিষয়।

জনৈক রবীন্দ্র সমালোচক মন্তব্য করেছেন, অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত বেদনাবোধের প্রভাবে কবি কাব্য রচনায় যে সত্যিকারের প্রেরণা অনুভব করেন রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার উৎসে সে বেদনাবোধ নেই। (দ্রষ্টব্য : J. C. Ghosh : *Bengali Literature*) রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের অকারণ বিষণ্ণতাসঞ্জাত তরল ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতাও সে শ্রেণীর। যে সমাজবোধ সৌন্দর্যবোধ ও অধ্যাত্মচেতনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার পূর্ণ জাগরণের মূলে তার কিঞ্চিৎ আভাসও দেখা যায় না প্রথমে পর্যায়ের কাব্যে। তবে রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার জাগরণের উৎসে যে চিত্রধর্মিতা ও লিরিক উচ্ছ্বাস পূর্বাপর ক্রিয়াশীল ছিল তা সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে সন্ধ্যাসঙ্গীতে। রোমান্টিক কাব্যজগতে এ অভিনব আবির্ভাবই যে সৃষ্টিপ্রতিভাধর রসিক বঙ্কিমের চিত্তকে আকৃষ্ট করে থাকবে—এতে সন্দেহ নেই।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-সরণী'তে

(প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯) বলেছেন, কবি-জীবনের কয়েকটি অসামান্য অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার জাগরণকে সম্ভব করে তুলেছিল। প্রথম অভিজ্ঞতা ঘটে কলকাতায় সদর স্ট্রীটে একটি শুভ প্রভাতে। সে প্রভাতের সূর্যোদয়ের অনির্বচনীয় মহিমা কবিচিত্তকে বিষণ্ণতার বেদনা থেকে মুক্ত করে যুক্ত করেছিল আনন্দময় বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বজীবনের সঙ্গে। প্রভাতসঙ্গীত থেকে বলাকা-পূর্ব কাব্য সঙ্গীত এ আনন্দময় চেতনার সুরস্পন্দিত। রবীন্দ্রজীবনে যে দ্বিতীয় সুমহৎ অভিজ্ঞতা কবির কাব্যপ্রতিভার জাগরণকে বিশ্বব্যাপী করেছিল সে অভিজ্ঞতা ঘটে কাশ্মীরের ঝিলাম নদীর উপর। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অভিজ্ঞতা কবির নীহারিকাশ্রয়ী কল্পনাকে একটি বিশিষ্ট গতি ও অভিপ্রায় দান করিয়াছিল। সে গতি ও অভিপ্রায় মানবসংসারাভিমুখী' (রবীন্দ্র-সরণী ॥ প্রমথনাথ বিশী)। এখানে কবি-চিত্তের আকর্ষণ সীমা বা 'হেথা'র দিকে। কিন্তু ঝিলাম নদীর অভিজ্ঞতা কবি-মনকে সীমার বন্ধন থেকে মুক্ত করে অসীমের পথে উত্তীর্ণ করে দিল। এখানে কবি-মনের গতি 'হোথা' অর্থাৎ নিরুদ্দিষ্ট দুর্জ্ঞেয়তার দিকে। বলাকার গতিপ্রবাহের মধ্যে কবি যে বিশ্বজীবনের চলমানতা অনুভব করেছিলেন সে জীবনের লক্ষ্য অনন্তের অভিমুখী। গীতাঞ্জলি যুগে সীমা ও অসীমের সমন্বয়ে কবি যে সুন্দর জগতের স্বপ্ন দেখেছিলেন বলাকা যুগে কবি-চেতনা সে সমন্বয়-বোধমুক্ত হয়ে অসীম অর্থাৎ বিশ্ব-চৈতন্যের সঙ্গে যোগযুক্ত হবার জন্য প্রয়াসী হয়েছে। অধ্যাপক বিশী বলেছেন, সীমা-অসীমের সমন্বয়হীন এ মহাসঙ্কটের পথে রবীন্দ্র-মন যুক্ত হয়েছে আধুনিক মনের সঙ্গে। বলাকা থেকে প্রান্তিকের অন্তর্বর্তী কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের সে বিশ্বানুভূতির আশ্রয়স্থল।

রবীন্দ্র-জীবনে শেষ উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা ঘটে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রাণসংশয়কর পীড়ার আঘাতে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন সে অভিজ্ঞত

কবিচিত্তকে উত্তীর্ণ করে দিল নবতর চেতনার জগতে। 'সুপ্তিগুহা হতে' চৈতন্যের জগতে মুক্তিলাভ করে কবি মানুষকে দেখলেন ভিন্ন মূর্তিতে। বিশ্বব্যাপী লোভী মানুষের হাতে দুর্বল মানুষের নিদারুণ লাঞ্ছনা কবির লেখনীতে এনে দিল ইস্পাতের ধার। নির্যাতিত মানুষের প্রতি কবির গভীরতম ও অকৃত্রিম সহানুভূতি এ যুগে রবীন্দ্র-প্রতিভাকে জাগ্রত করল বাস্তবতার কঠিন জগতে। একদিকে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে জীবন সম্পর্কে কবির নিবিড়তম উপলব্ধি আর একদিকে বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি মৃত্যুত্তীর্ণ কবি-হৃদয়ের অনন্ত বেদনা—'প্রান্তিক' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত গোধূলি পর্যায়ের কাব্যধারায় মিলিত রূপ পেয়ে রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার চরম পরিণতি ঘোষণা করল।

রবীন্দ্র-কবিজীবনে এ সমস্ত অসামান্য অভিজ্ঞতা মুখ্যত দৈব প্রভাবেই প্রাপ্ত। সুতরাং এ সমস্ত দৈবী ঘটনাকে রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার পূর্ণ জাগরণের মূলে স্বীকার করার মানেই হল রবীন্দ্রনাথের সচেতন মননশীল প্রতিভাকে অস্বীকার করা। রবীন্দ্র-কবিজীবনে অহেতুক দুঃখবিলাসিতা আছে, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ আছে, দৈবী অভিজ্ঞতার প্রভাবে অন্তরের সুগভীর আলোড়ন আছে—এ সমস্ত তথ্যকে স্বীকৃতি দিলেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে পৃথিবীর কাব্যেতিহাসে এত বড় সচেতন প্রতিভার সাক্ষ্য খুব কমই পাওয়া যায়। রবীন্দ্র কবি-জীবনে গ্যয়েটের মত এত বহুমুখী কৌতূহল হয়ত ছিল না। কিন্তু আজীবন উদার সংস্কৃতির প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনায় যে নানামুখী মানব-কৌতূহলকে বেদনাসুন্দর রূপ দিয়েছিলেন সে বিচিত্র রূপই রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভাকে বিশ্বের কবিসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করেছে। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের মত এত সচেতন ও সর্বগ্রাসী মন পৃথিবীর খুব কম কবিরই দেখা গেছে। সে সদাজাগ্রত, সদাচঞ্চল, সর্বচিত্ত-সর্বলোক-

সর্বকালে সঞ্চরণশীল অতি-কর্ষিত মনই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার পূর্ণ জাগরণের মূলে।

উদার সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষণ হল দেশকালবিধৃত সীমায়িত চেতনার জগৎ থেকে বৃহত্তর মানবচেতনার জগতে মুক্তি। এ সীমাতিক্রমী মুক্তিচেতনা শুধুমাত্র জীবনে নয় সাহিত্য-শিল্পেও তার অম্লান চিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবন-সাধনা সে সংস্কারমুক্তিরই অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস। ধর্ম ও কর্ম, সাহিত্য ও রূপচর্চা, জাতীয়তাবোধ ও বিশ্ববোধ, রূপ ও অরূপানুভূতি—জীবনের সকল প্রদেশেই গতানুগতিক সংস্কারকে অতিক্রম করে বিশ্বজীবন ও বিশ্বমনের সঙ্গে পরম আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে এত বড় উৎসাহ পৃথিবীর খুব কম কবির জীবনেই দেখা গেছে। ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রে পিতার সংস্কার-মুক্তির সাধনা কৈশোর ও প্রথম যৌবনে রবীন্দ্র-চিত্তকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল রবীন্দ্র-মন আলোচনায় সে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যৌবনে রবীন্দ্র-মনকে সব চাইতে বেশী আকর্ষণ করেছিল রামমোহনের বিশ্বজনীন মানবধর্মের আদর্শ (Universal human religion)। পরিণত যৌবনে প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে বুদ্ধ চৈতন্য ও খ্রীষ্টের দুর্নিবার মানবপ্রেম, মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত বৈষ্ণব ও আউল বাউলদের সহজিয়া মানবপ্রীতি রবীন্দ্র-মনে সৃষ্টি করেছিল সর্বানুভূতির চেতনা। রবীন্দ্র-কাব্য-জীবনের প্রথম পর্যায়ে সে চেতনা আবেগময় রূপ নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ও তারপরে কয়েকবার ব্যাপক বিশ্বভ্রমণের ফলে সে চেতনা কিরূপে মননশীল রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্র-মনের বিকাশ অধ্যায়ে। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটে বিশ্বজীবন ও বিশ্বসংস্কৃতির নিকট-সান্নিধ্যে এসে। বলাকা থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত কাব্যে বিশ্ব-জীবনের যে উত্তাল আবেগ-তরঙ্গ রবীন্দ্র-কাব্যকে বিচিত্র রূপে রসে ভাব ও ভাবনার বৈচিত্র্যময়

প্রকাশে সবল-সুন্দর রূপ দিয়েছে তাতে এ পর্যায়ের বিশ্বসংস্কৃতি-সচেতন ভাবুক শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব যুগের আর্টিস্ট্ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক ব্যক্তি বলেই মনে হয়।

বাস্তবজীবনে বিশ্বমানব-সাংস্কৃতিকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করবার যে মহান পরিকল্পনা বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মধ্যে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিল ভাবজীবনে তারই প্রতিফলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজীবন-সচেতন কাব্য ও সঙ্গীতে। বস্তুতপক্ষে ভবিষ্যৎ বিশ্ববাসীর নিকট রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয় হবেন মুখ্যত তাঁর আন্তর্জাতিক ভাবধারার জন্যে। পরিণত রবীন্দ্রকাব্যে বিশ্বমানবের উদ্দেশে যে আন্তরিক প্রীতির অঞ্জলি আবেগময় ভাষায় সমর্পিত হয়েছে বিশ্বের কাব্যেতিহাসে তার তুলনা খুবই বিরল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য অতীত ও বর্তমান সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আশ্চর্য নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য। বাংলা দেশের নিত্য-পরিবর্তনশীল প্রকৃতি রবীন্দ্রকাব্যের বিরাট প্রেক্ষাপটে স্থান গ্রহণ করে সে কাব্যকে বহু বর্ণালিম্পিত করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার পরম বিকাশের মূলে যে তুঙ্গস্পর্শী বিশ্বসংস্কৃতি-চেতনা এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। প্রাচ্য জীবনের শান্তিময় সৌন্দর্যচেতনার আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জীবনের সচল সবল সংঘাতময় জীবনাদর্শের যখন সমন্বয় ঘটল রবীন্দ্রকাব্য তখন যে বেগ ও বলিষ্ঠতা অর্জন করল তা ইতিপূর্বে ছিল একান্তভাবে অভাবিত।

এ মানবমুখী বিশ্বসংস্কৃতি-চেতনাকে কবি-প্রেরণার ভাবস্বর্গে উত্তীর্ণ করে দিতে সব চাইতে বড় অংশ গ্রহণ করেছিল কবি-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। আধুনিক পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব শান্তি ও মৈত্রীপ্রিয় রবীন্দ্র-মনকে জীবন সায়াহ্নে যে কত পীড়িত করেছিল এ সংবাদ রবীন্দ্র-জীবনী পাঠকের অজানা নয়। এ বিষণ্ণ অভিজ্ঞতার ফলে মানবজীবন-বেদনায় যন্ত্রনাজর্জর প্রজ্ঞাবান কবি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, এ বিরোধ-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে

শান্তি আনয়ন করতে পারে একমাত্র সৃষ্টিধর্মী শিল্পী ও কবির সংস্কারমুক্ত বিশ্বদৃষ্টি। আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীর বহুদূরান্তবর্তী মানুষকে পরস্পর সন্নিহিত করবার আশ্চর্য কৌশল শিখালেও সহযোগিতা ও প্রীতিনির্ভর বিশ্বদৃষ্টি দানে সমর্থ হয়নি। তার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান এ যুগের বিজ্ঞান দিয়েছে মানুষকে পারস্পরিক হিংসা দ্বেষ ঘৃণা ও জিগীষার প্রবৃত্তি। অথচ মানবেতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় অতীতের মানুষ হিংসার বশবর্তী হয়ে পরস্পর যেমন যুদ্ধ করেছে তেমনি পরস্পর সম্মিলিতও হয়েছে। মানব-মিলনের এ নৈতিক ভিত্তিই মানুষের সকল মহত্ত্বের মূলে। এ মৈত্রীপূর্ণ মিলনের শান্তিচ্ছায়ায় অতীতের মানুষ সৃষ্টি করেছিল মহৎ শিল্প সাহিত্য ধর্ম এবং মানুষের সৌন্দর্যস্বপ্নকে রূপ দেবার জন্যে নানা প্রয়োগবিদ্যা।

মানবেতিহাসের এ নিবিড় অনুশীলন পরিণত রবীন্দ্র-মনে জাগিয়ে তুলল বিশ্বমানবতার স্বপ্ন। ভাবদর্শী রবীন্দ্রনাথ জীবনে বহু স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু বিশ্বমানবতার স্বপ্নের মত এত মহৎ স্বপ্ন দেখার সৌভাগ্য তাঁর জীবনে বোধ হয় বেশী ঘটেনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এ স্বপ্ন যুক্তিবর্জিত অলীক—শুধু কবির স্বপ্ন মাত্র। এ স্বপ্নকে বাস্তব-জীবনে রূপ দিতে গেলে জাতির অখণ্ডতা ব্যাহত হয়। জাপানী মনীষী কবি নোগুচিও একদা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু যুক্তিশীল রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিশ্বমানবতার উপলব্ধি জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে নয়—জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে সকল বৈষম্যের মধ্যে এক পরম ঐক্যের অনুভবই বিশ্বমানবতাবোধের চরম অন্বিষ্ট। বাস্তব জীবনে রবীন্দ্রনাথ এ মহান মানবাদর্শ লাভের জন্য সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল ব্যয় করেছেন তাঁর স্ব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর পরীক্ষাশালায়, আর ভাবজীবনে 'ভারততীর্থে'র মত কবিতা রচনা করে সর্বযুগের মানবসত্যকে মহিমান্বিত রূপ দিয়েছেন। জীবন-সায়াহ্নে পরম বেদনার সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আধুনিক

বিজ্ঞান-সত্য পরস্পর দ্বন্দ্বরত বিশ্বমানবের মধ্যে মিলন সাধনায় ব্যর্থ হয়েছে। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ মানব-মিলনের জন্য সৃষ্টিধর্মী শিল্পী ও কবির উপর এতটা নির্ভর করেছিলেন। আশা করেছিলেন তিনি জাতীয় সংস্কৃতি থেকে প্রাণরস আহরণ করে বিশ্বসংস্কৃতি ও বিশ্বজীবনের উদার আকাশে বিচরণ করবেন আধুনিক সৃষ্টিধর্মী কবি ও শিল্পী। দুর্নিবার প্রাণের প্রেরণায় সকল মানুষের মধ্যে মিলন সাধনাই হবে তাদের জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা কবির দৃষ্টিতে এঁরাই হলেন মহামানব। জীবনের শেষ জন্মতিথিতে কবি-মন যখন আধুনিক পৃথিবীর লোভ ও হিংসার আঘাতে বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তখনও প্রবল আদর্শবাদের প্রেরণায় মহানমানবের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি আনন্দময় সঙ্গীতের মাধ্যমে।

বস্তুতপক্ষে মহামানবের আবির্ভাব-কল্পনাই মননশীল-কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার পূর্ণ জাগরণের স্বাক্ষর। কবির দৃষ্টিতে এ মহামানব ব্যক্তি ও বিশ্ব, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন সেতু রচনা করবেন। হোক উহা মানবপ্রেমিক কবির স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু এ মহৎ স্বপ্নের মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকবেন ভবিষ্যৎ মানুষের মনে।

জগতের মহাকবি মাত্রই নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টিকে তাঁদের কাব্যে প্রাধান্য দেননি। দুঃখ তাপ বেদনা-নিপীড়িত বিশ্ববাসীর জন্য কাব্যের আধারে বহন করে এনেছেন তাঁরা মৃত্যুঞ্জয় জীবনের আশা ও আশ্বাসের বাণী। আধুনিক হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে খণ্ডিত মানুষের উজ্জীবন-স্বপ্নই রবীন্দ্রকাব্যের সে সুমহান বাণী। জীবনে যেমন তিনি কোন খণ্ডিত সত্যকে গ্রহণ করতে পারেননি কাব্যেও তেমনি কোন বিশিষ্ট দেশকালবিধৃত খণ্ড সত্যকে স্বীকার করেননি। পূর্ণতার সাধনা রবীন্দ্রজীবনের যেমন রবীন্দ্রকাব্যেরও

তেমনি শ্রেষ্ঠতম পরিচয়। জীবন-সায়াহ্নে মানবসত্যের চরম বিকৃতি দেখে পূর্ণ মানুষের আবির্ভাব-কল্পনার মধ্যেই কবি তাই শেষ আশ্রয় খুঁজেছিলেন। আশা ও আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথের এ সমুচ্চ মানবপ্রত্যয় খণ্ড সত্যের পূজারী এক শ্রেণীর বাস্তববাদী য়ুরোপীয় সমালোচকের তীব্র সমালোচনার সামগ্রী হয়েছিল। কবির কালজয়ী জীবনাদর্শকে বাস্তববিমুখ স্বপ্নবিলাসিতা বলে অভিহিত করতেও তাঁরা দ্বিধা করেননি। যে কাব্যধারায় এ মহান দ্রষ্টার আদর্শায়িত স্বপ্নের ছায়াপাত ঘটেছে সে কাব্যকেও তাঁরা বায়বীয় ভাবে পরিপূর্ণ মূল্যহীন কাব্যপ্রয়াস বলে মনে করেছেন।

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর খণ্ড সত্যের উপাসক বস্তুবাদী সমালোচকের কাছেও রবীন্দ্রনাথের প্রবল আদর্শবাদ নির্মম সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ শ্রেণীর জনৈক সমালোচকের মতে গ্যয়টের কাব্যপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথের তুলনায় শ্রেষ্ঠ—যেহেতু গ্যয়েটের জীবনবোধ রবীন্দ্রনাথের জীবনচেতনা থেকে অনেক বেশী বলিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের সত্যানুধ্যানও গ্যয়টের তুলনায় দুর্ব্বল, কেননা 'অস্তিত্বের দুর্বহ জটিলতা এবং দুঃসমাধেয় বিরোধের মুখোমুখি হয়ে তিনি আড়াল খুঁজেছেন বিমূর্ত ভাবের সরল সমন্বয়ে।' উক্ত সমালোচকের মতে সত্যানুধ্যানের পথে রবীন্দ্রনাথ যখনই কোন দুরারোহ সংশয়ের সম্মুখীন হয়েছেন তখনই তিনি 'মানবতন্ত্রের কঠিন নির্দেশ ভুলে প্রাক্তন প্রত্যয়ের শান্তিতে আশ্রয় নিয়েছেন'। গ্যয়টেও জীবনে সমন্বয়ের শান্তি-প্রত্যাশী ছিলেন কিন্তু এ শান্তি লাভের জন্য তিনি কখনও সত্যের পথ থেকে দূরে সরে যাননি। আলোচ্য সমালোচক আরো মনে করেছেন 'রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্র গ্যয়টের মানবতন্ত্রের তুলনায় অস্তিত্বনিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেকটা দুর্বল'। ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন ও মানবজীবনকে একটি আদর্শায়িত দৃষ্টিতে দেখেছেন। গ্যয়েটের মত জীবনকে তিনি সমগ্রভাবে স্বীকার করতে পারেন নি। এ কারণে অসামান্য

সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি এমন কোন কাব্য-সাহিত্য রচনা করে যেতে পারেন নি যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমতুল্য। (দ্রষ্টব্যঃ শিবনারায়ণ রায় ॥ সাহিত্য চিন্তা ॥ রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়টে)

আর একজন বস্তুবাদী সমালোচক রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেও বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে আমাদের জাতীয় আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েও সে আন্দোলন থেকে পরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন 'উপনিষদ্-প্রাপ্ত দীক্ষামন্ত্রের প্রভাবে।' বেদের শিক্ষায় তিনি পরস্পর দ্বন্দ্বরত বিশ্বমানবকে শুভবুদ্ধির যোগে সংযুক্ত করার বাণী প্রচার করছিলেন। তত্ত্ব হিসেবে সে বাণীর পরম মূল্য স্বীকার করেও উক্ত সমালোচক মনে করেন ব্যবহারিক কর্মপন্থা হিসেবে সে বাণী ব্যর্থ। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করে তিনি বলেছেন—যে সমাজব্যবস্থার প্রভাবে বর্তমান পৃথিবীতে লোভপ্রবৃত্তি অত্যন্ত উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সে ব্যবস্থা পরিবর্তিত না হলে মানুষের এ প্রবৃত্তি কখনও উৎসাদিত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রসঙ্গে উক্ত লেখক বলেন: 'রবীন্দ্রনাথ লোভ জিনিষটাকে একটা পরম নির্বস্তুক মানস-ভঙ্গীরূপে দেখতেই অভ্যস্ত, এর যে একটা ব্যবহারিক সংকেত অথবা একটা বস্তুগত অস্তিত্ব থাকতে পারে তা কখনও ভেবে দেখেন নি। তাঁর পূর্বসাধকদের মত তিনিও সমস্ত চরাচরে শুধু ভাবের খেলাই দেখেছেন, বস্তুকে দেখেন নি। তাই ভাব দিয়ে বস্তুকে বদলাবার কার্যক্রম ব্যর্থ হয়ে গেল। 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি' 'মা গৃধঃ' সত্ত্বেও সমস্ত মানুষ এক পরম সত্তার আকর্ষণে সংযুক্ত হলো না। (দ্রষ্টব্যঃ অরবিন্দ পোদ্দার ॥ রবীন্দ্র-মানস ॥ রবীন্দ্র-মানস সম্পর্কে কয়েকটি কথা)

রবীন্দ্র-প্রভিভার তুলনায় গ্যয়টের কাব্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন প্রয়াসের ভিতর লেখকের চিন্তার সচলতা প্রকাশ পেলেও জীবন-দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আধুনিক

বস্তুবাদী সমালোচক যতই বুদ্ধিচর্চ্চা করুন না কেন জীবনকে প্রত্যক্ষ বাস্তব সীমার বাইরে দেখতে তাঁরা অনভ্যস্ত। পরিপূর্ণ জীবনের পক্ষে বাস্তবদৃষ্টি যেমন সত্য ভাবদৃষ্টিও তেমনি সমানভাবে সত্য। প্রত্যক্ষ জীবন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের বাস্তবদৃষ্টি প্রখরতা লাভ করে এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রত্যক্ষতার সীমাতিশায়ী দুর্জ্ঞেয় জীবনরহস্যের সম্মুখীন হয়ে মানুষের সচেতন ভাবনা যখন কূল পায় না তখন জীবনের তিমিরাভিসারে ভাবময় দৃষ্টিভঙ্গী আলোর রেখা বিকীর্ণ ক'রে মানবমনকে আকর্ষণ করে শ্রেয়োবোধের দিকে। এ ছাড়া দেশ কালের প্রভাবেই বাস্তব বা ভাবদৃষ্টি মানুষের জীবনে প্রাধান্য লাভ করে। যুরোপীয় রেনেসাঁসের যে বহুমুখী প্রবণতা জীবনের বিচিত্র প্রদেশে আত্মপ্রকাশ করে সে দেশের জীবনদৃষ্টিকে করেছিল বস্তুমুখী সে দেশকালের প্রভাবেই গ্যয়টের কাব্যপ্রতিভা একটা ভাস্বর দীপ্তি লাভ করেছিল। বস্তুজগতে যে নিত্য নতুন উদ্ভাবনীশক্তি রেনেসাঁসের সত্যিকার প্রাণধর্ম ভারতীয় রেনেসাঁস ছিল সে বৈশিষ্ট্যবর্জিত। শুধুমাত্র ধর্ম সমাজ এবং সাহিত্যের আধারে নবতর আদর্শ অনুসন্ধানেই ভারতীয় রেনেসাঁস স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল। সুতরাং যুরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবজাত যে মানবতন্ত্রের সাধনা গ্যয়টের কাব্যপ্রতিভাকে প্রত্যক্ষ জীবনালোকে জাগ্রত করেছিল সে একই বাস্তবাশ্রিত জীবনরূপ রবীন্দ্র-কাব্যে অনুপস্থিত দেখে গ্যয়টের কাব্যপ্রতিভার তুলনায় রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভা দুর্বল—এ ধরনের ধারণা অযৌক্তিক এবং অহেতুক। রবীন্দ্রনাথের নিকট বস্তুজগৎ ও ভাবজগৎ পরস্পরবিরোধী নয়—একে অপরের পরিপূরক। বস্তুজগতের সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থান্ধ জীবনসংঘাতে পীড়িত হয়ে রবীন্দ্র-মন যদি বিমূর্ত ভাবজগতে সমন্বয়ের পথ খুঁজে থাকে তবে সে তাঁর প্রবল আদর্শবাদের জন্যে। নিজের জীবন ও মানব জীবনকে আদর্শায়িত রূপে দেখার প্রবৃত্তির মূলেও রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর জীবন-

মানুষের মনে লোভ আছে, পাপ আছে, হিংসা আছে, ঈর্ষার

হলাহল আছে—বাস্তব জীবনে মানুষের এ কলঙ্ক কালিমাকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি। তা সত্ত্বেও ভাবদর্শী রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় প্রত্যয়, মানবাত্মার অবস্থান এ সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতার উর্ধ্বে—সে আত্মা শুভ্র নিরঞ্জন পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং অংশ। বর্তমান যুগের নির্মোহ বাস্তববাদী পরস্পর বিবদমান মানুষ ক্রমশ আত্মার অনুসন্ধানের পথেই একদিন মৈত্রীবন্ধনে মিলিত হবে—ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার এ পরম উপলব্ধিই রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভাকে একটি মহৎ পরিণতি দান করেছিল।

সংস্কারমুক্ত এ বোধের জগৎ রবীন্দ্র-চিত্তকে সবলে আকর্ষণ করেছিল জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ পরিধি থেকে মানবতার উদার প্রাঙ্গণে। সচেতন বুদ্ধি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন আধুনিক রাজনীতি ও সমাজনীতির বাস্তব আদর্শ সর্বমানবের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। খুব সম্ভব এ কারণেই রবীন্দ্র-মন অতীতচারী হয়ে মানবমৈত্রীর উপায় হিসেবে সবলে আঁকড়ে ধরেছিল উপনিষদের ভোগাসক্তিবিমুক্ত জীবনদর্শন এবং বেদোক্ত শুভবুদ্ধির আদর্শকে। ব্যবহারিক কর্মপন্থা হিসেবে বেদ ও উপনিষদের আদর্শ যে এ যুগে অচল —সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে অনবহিত ছিলেন তা বলা চলে না। তবুও রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক মানুষের সর্বগ্রাসী লোভ ও হিংসা-প্রবৃত্তিকে সমূলে উৎসাদিত করবার জন্যে সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বন করেননি তার কারণ রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতা বা কট্টর নীতিবিদ্ নন—তিনি সর্বযুগের মানবজীবনের রহস্যসন্ধানী সৌন্দর্যদ্রষ্টা শিল্পী এবং সৃজনধর্মী কবি। অখণ্ড মানবসত্যকে দ্রষ্টার ভাবদৃষ্টি দিয়েই যাচাই করেছেন তিনি সারাজীবন ব্যাপী। উপলব্ধি করেছিলেন তিনি বাস্তবদৃষ্টি যে মানবসত্যের সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় ঘটায় সে সত্য খণ্ডিত সুতরাং অপূর্ণ। যে সত্য দেশকালের সীমা অতিক্রম করে সর্বযুগের মানবমনকে শ্রেয়োবোধের জগতে উত্তরণ করেনা সে একপেশী জীবনসত্য রবীন্দ্র-মন কখনও কামনা করেনি। এ অখণ্ড মানবসত্যবোধই রবীন্দ্র-মনকে জীবনের বিচিত্র রূপের দিকে

পথনির্দেশ করেছিল। কাব্যে তার পরিপূর্ণ প্রতিফলন কবির পক্ষে হয়ত সম্ভব হয়নি। প্রকাশের জগতে এ অপূর্ণতার জন্য কবির আক্ষেপেরও সীমা ছিল না।

রবীন্দ্র-জীবনে ভাববাদ প্রাধান্য পেয়েছিল বলে নিজের ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবনকে তিনি একটি আদর্শায়িত দৃষ্টির সাহায্যে দেখেছিলেন সন্দেহ নেই। তাই বলে বস্তুর বাস্তব রূপকে তিনি কখনও অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করেন নি। রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায়ের মনোযোগী পাঠক এ সত্য স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই। তবে রবীন্দ্র-মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে বস্তুর বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করেও বস্তুদৃষ্টিকে জীবনে তিনি একান্ত প্রাধান্য দেন নি। রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ জীবনবোধ ভাববাদী ও বস্তুবাদী চেতনার সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাব্যে বিচিত্র পরিণতি লাভ করেছে। কবির অতি তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যচেতনা ও সীমাতিশায়ী অরূপ ভাবনা যখনই মর্ত্যসীমা অতিক্রম করে ভাবজগতের অসীম আকাশে উড্ডীন হয়েছে তখনই বাস্তবজীবনের বিবর্ণ বিশীর্ণ রূপ তাঁর কবি-কল্পনাকে আবার মানব সমাজের দিকে আকর্ষণ করেছে। এ কারণেই রবীন্দ্রকাব্যে এত দিক্ পরিবর্তন এত রূপ পরিবর্তন। সোনার তরী থেকে শুরু করে জন্মদিন পর্যন্ত কাব্যে কবির ভাবানুভূতি ও ভঙ্গীর ক্ষেত্রে কতবার যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে রবীন্দ্রকাব্য-পাঠকের তা অজানা নয়। আধুনিক ইংরেজী কাব্য সমালোচক লরেন্স ডুরেল (Laurance Durrell) প্রকৃত কবিসত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'Poets must develop and grow if they are real poets and not hacks' রবীন্দ্রকাব্যও কবির ভাব ও বস্তুদৃষ্টির আকর্ষণে বিকর্ষণে ক্রমশ পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। সে পূর্ণতার দিকে যাত্রাপথে কবি কখনও মানবজীবন এবং মানবপ্রেম বিমুগ্ধ হয়ে বহুবর্ণালিম্পিত ছবি এঁকেছেন। আবার কখনও বা এ ছলনাময় সৌন্দর্য-জগতের মোহমুক্ত হয়ে মানবাদর্শের অস্পষ্ট ছায়াময় পথে ধাবিত

হয়েছেন। কাব্যজীবনে ভাবের পথেই হোক রূপের পথেই হোক—যে পথেই অগ্রসর হোন না কেন সে পথের সৌন্দর্যকে কবি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গেই এঁকেছেন। কবির জীবনবোধ ও প্রকাশের জগতে কোথাও ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। রবীন্দ্রকাব্যে অতি তীব্র ভাবাবেগের সঙ্গে আর্টের যে অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে তার তুলনা পৃথিবীর কাব্যেতিহাসে বিরল। খণ্ড দৃষ্টির সাহায্যে বিচার করতে গেলেই রবীন্দ্রকাব্যের সে দুর্লভ সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। ভাব ও বস্তুজগতের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সেতু রচনা করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকে যে সর্বলোকাশ্রয়ী রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন সে মাপকাঠিতে বিচার না করে জীবনবোধের বিশিষ্ট কোন দিক থেকে রবীন্দ্র-কাব্যের মানে খুঁজতে গেলে তা অন্ধের হস্তীদর্শনেই পর্যবসিত হবে সন্দেহ নেই।

বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্র-কাব্যে মানবতন্ত্র বিচারের মাপকাঠি কবির স্ব-জীবনে উপলব্ধ বিশিষ্ট ধর্মবোধ। এ ধর্মবোধ বস্তুধর্মবিবর্জিত নয় কিন্তু মুখ্যত ভাবপ্রধান। বলাকা থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত কাব্যধারায় সে ধর্মবোধ প্রবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও ইতিপূর্বেকার কাব্যপ্রবাহে তা ক্ষীণধারায় হলেও যে আত্মপ্রকাশ করেনি তা বলা চলে না। কাব্য রচনার প্রথম যুগের নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য সম্ভোগের জগৎ থেকে বৃহত্তর মানবধর্মবোধের জগতে উত্তরণের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্র-মনে যে প্রবল ভাবসংঘাত উপস্থিত হয়েছিল তার পরিচয় আছে কল্পনা কাব্যে—যে কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ আখ্যায়িত করেছেন ঋতু পরিবর্তনের কাব্য বলে। নৈবেদ্য, কথা ও কাহিনী এবং কাহিনীতে সে ধর্মবোধের প্রকাশ দ্বন্দ্বহীন ও সুগভীর। দ্বন্দ্বহীন ও গভীরতাধর্মী হলেও আবেগের উচ্ছ্বসিত প্রকাশে স্পন্দমান। মানবতার আদর্শ সন্ধানে এ সমস্ত কাব্যে কবিদৃষ্টিও অতীতচারী।

কিন্তু সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার প্রভাবে আধুনিক সভ্য নামধারী

মানুষ দুর্জয় লোভ ও হিংসার উন্মাদ উত্তেজনায় যে মানবতাবিরোধী কার্যে লিপ্ত হয়েছে তার বাস্তব রূপ দর্শনে বিশ্বসমস্যা-সচেতন কবির দেরী হয়নি। পাশ্চাত্ত্যের সে দন্তুর সভাতার সর্বপ্রথম আবেগময় প্রকাশ নৈবেদ্য কাব্যে (দ্রষ্টব্য: শতাব্দীর সূর্য)। অতঃপর তার মননশীল প্রকাশ ঘটে নবজাতকে। নবজাতক কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন প্রৌঢ় ঋতুর মননজাত ফসল, আর রবীন্দ্রানুরাগী অমিয় চক্রবর্তী বলেছেন কবির প্রথম আধুনিক কাব্য। এ কাব্যে এবং এর নিকটবর্তী কালে রচিত সমস্ত কাব্যেই রবীন্দ্রনাথের উদ্যত সহানুভূতি বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত সম্প্রদায়ের বেদনার বাণীকে যে সবল রূপ দিয়েছে তাতে কবিকে কোনমতেই বস্তুদৃষ্টিহীন ভাবরাজ্যে বিচরণশীল স্বপ্নচারী বলে আখ্যাত করা চলেনা।

এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য। মননশীল প্রবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের উত্তর-পর্যায়ের কাব্যে চরম দার্ঢ্য এনে দিয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু মননশীলতাই রবীন্দ্র কাব্যপ্রতিভার চরম পরিচয় নয়। রবীন্দ্র কাব্যপ্রতিভাকে পরম পরিণতি দান করেছে কবির বোধদৃষ্টি (intuition)। এ দৃষ্টির সাহায্যেই কবি উপলব্ধি করেছেন বর্তমান পৃথিবীর লোভজর্জর মানুষ সাময়িকতার দ্বারা অভিভূত হলেও ক্রমবিবর্তনের ধারায় শুভবুদ্ধির জাগরণের ফলে আবার মানবমৈত্রীর উদার রাজ্যে উত্তীর্ণ হবে। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী। মানব-মাহাত্ম্যের প্রতি কবির শ্রদ্ধা এত অকুণ্ঠ এত দ্বিধাহীন ছিল যে আধুনিক বস্তুবাদীদের মত মানুষকে তিনি শুধু লোভী পশু বলে ভাবতে পারেননি। পূর্ণতার অভিমুখে যাত্রাপথে মোহ জীবনকে ধূলিকলঙ্কিত করে, অবিশ্বাস সন্দেহ এসে মানুষের লক্ষ্যাভিমুখী মনকে করে দ্বিধাকম্পিত। তবু 'দুর্যোগের মায়ার

আড়ালে' নিত্যের যে ভাস্বর জ্যোতি বর্তমান সে অম্লান সত্যের জ্যোতিই মানুষকে যুগে যুগে আকর্ষণ করবে পূর্ণতার দিকে। এখানে অনুভূতিশীল কবি এসে মিলিত হয়েছেন প্রজ্ঞাবান অধ্যাত্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানীর সঙ্গে। সাময়িকতার প্রভাবে আচ্ছন্ন বস্তুবাদী সমালোচকের খণ্ডদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের এ সুবিস্তৃত জীবনচেতনার মর্মগ্রহণে অক্ষম। এ কারণেই তাঁরা রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভাকে পৃথিবীর বস্তুবাদী অপরাপর শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যপ্রতিভার তুলনায় খর্ব করবার আগ্রহে অত্যুৎসাহী। এতে তাঁদের অভিনব চিন্তার দম্ভ প্রকাশ পেতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র পণ্ডিতম্মন্যতার সাহায্যে রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব হয়না। বস্তুতপক্ষে বিশ্বের চিরকালীন কবিসমাজে রবীন্দ্রনাথের স্মরণযোগ্যতার অন্যতম দাবি হবে মানুষের শুভবুদ্ধির উপর কবির সীমাহীন বিশ্বাস এবং শান্তি-স্বর্গচ্যুত পৃথিবীতে মানুষের পুনর্জাগরণ স্বপ্ন।

উক্ত পরিপেক্ষিতে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসচেতন ও মানবসচেতন কবিতার মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদরেখা টানা সম্ভব হয়না। রবীন্দ্রনাথের মানবচেতনা গভীরতম ধর্মবোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত আবার নিবিড় ধর্মবোধও মানবচেতনাবর্জিত নয়। বস্তুবিশ্ব, মানবসমাজ ও অধ্যাত্মজগৎ—এ তিনের নিবিড় উপলব্ধিই রবীন্দ্রকাব্যের অতল গভীরতা ও সুবিশাল ব্যাপ্তির মূলে। তাঁর ধর্মোপলব্ধি বেদ ও উপনিষদের অদ্বৈতবাদকে স্বীকার করে মুখ্যত বিকাশ লাভ করলেও বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ এবং বাউল ও মধ্যযুগের সন্তদের মরমীয়াবাদের প্রভাবে বিচিত্র রসপরিণতি লাভ করছে—এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কবির ধর্মসচেতন কাব্য-সঙ্গীতে এ সমস্ত ধর্মমতবাদের কোন না কোনটির প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান। শেষ পর্যায়ে যে ধর্মবোধ রবীন্দ্রকাব্যকে বিশ্বের কাব্যজগতে বিশিষ্টতা দান করছে তা কোন শাস্ত্রোক্ত ধর্ম নয়—কবির স্ব-জীবনে অনুশীলিত জ্ঞান ও প্রেমের মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত

সর্বসংস্কারমুক্ত মানবধর্ম। ধর্মানুভূতির জগতে এ সংস্কারমুক্তি কবির কাব্যপ্রকাশেও যে অনিবার্য পরিবর্তন এনে দিয়েছিল—রবীন্দ্রকাব্যের মনোযোগী পাঠক মাত্রেই তা লক্ষ্য করে থাকবেন। অলঙ্কারপ্রিয় কালিদাস প্রভৃতি ক্লাসিক কবি, প্রসাধনপ্রিয় বৈষ্ণব কবি ও মধ্য ভিক্টোরীয় যুগের কবিদের ঐতিহ্যলালিত যে কবি-মন বহুকাল যাবৎ রূপ ও রসের জগৎ সৃষ্টিতে নিমগ্ন ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নিদারুণ সংঘাতে সে মনের আবেগময় সৌন্দর্য-স্বপ্ন অকস্মাৎ ভেঙে গেল। বীরের রক্তস্রোত, ভাগ্যহত মাতার মর্মভেদী ক্রন্দন রবীন্দ্র-চিত্তকে জাগিয়ে তুলল বাস্তবলাঞ্ছিত প্রীতিহীন জগতে। মনুষ্য জগতে বিরোধ-বিক্ষোভ, স্বার্থোদ্ধত অবিচার এবং বিধ্বংসী আত্মনাশপ্রবণতা যতই জাগ্রত হয়ে উঠছে কবি ততই আকৃষ্ট হয়েছেন এমন একটি প্রসারিত ধর্মবোধের প্রতি—যে ধর্মবোধ দেশ কাল জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষেরই গ্রহণযোগ্য। কল্পনা কাব্যে যে ধর্মবোধের আভাস, বলাকা কাব্যে সে ধর্মবোধের সুস্পষ্ট প্রকাশ এবং তৎপরবর্তী শেষ পর্যায়ের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি—মানবধর্মবোধের সর্বোত্তম বিকাশ। বলাকা ও নবজাতকের অন্তর্বর্তী পূরবী ও মহুয়া কাব্য কবির প্রেমানুভূতির শ্যামল দ্বীপ। জীবন সংঘাত-পীড়িত কবি-মন বিশ্রামের অবকাশ খুঁজেছে এ দু'টি প্রেমানুভূতিনির্ভর শিল্পসচেতন কাব্যে। কল্পনাসৃস্ট রূপজগৎ থেকে বাস্তবধূসর মানবজগতে উত্তরণই রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার শেষে রবীন্দ্র কাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ সম্পর্কে একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসবার পরও রবীন্দ্র-কাব্য-পাঠকের মনে একটি বড় প্রশ্ন থেকে যায়—কল্পনাশ্রিত রূপজগৎ থেকে বাস্তবাশ্রিত মানব জগতে উত্তরণই কী রবীন্দ্রকাব্য-প্রতিভার চরম পরিচয়? এ প্রশ্ন পাঠক-মনে জাগ্রত হবার প্রধান কারণ বর্তমান

বিশ্বের প্রবল ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়েও মৃত্যুর মাত্র এক বৎসর পূর্বে কবি আবার অনির্বাণ আকূতি অনুভব করেছেন রোমান্টিক রূপজগতের প্রতি (দ্রষ্টব্যঃ নবজাতক)। বাস্তবিক পক্ষে বাস্তব জীবনের নির্মম সংঘাত রবীন্দ্র-কবিচিত্তে যত গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করুক না কেন, রূপ ও রসজগতের প্রতি সহজাত আকর্ষণকে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কবি কখনও অতিক্রম করতে পারেন নি। সুতরাং সর্বশেষে এ সত্য স্বীকার করতেই হয় যে কবির বহুকাল-অনুশীলিত বিশ্বানুভূতির সঙ্গে দুর্নিবার রোমান্টিক সৌন্দর্যানুরাগ রবীন্দ্র-কাব্যকে চিরকালের ভাবুক ও রসিক সমাজে প্রিয় করে তুলবে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা

স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বের লেখক সমাজে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় কোথায়?—তাঁর কাব্যে? গানে? উপন্যাসে? ছোটগল্পে? নাটকে? প্রবন্ধে? না তাঁর তত্ত্বপূর্ণ উপদেশাবলীতে? রবীন্দ্র-প্রতিভার সম্মুখীন হয়ে এ প্রশ্ন বারে বারে জিজ্ঞাসু পাঠকের মনকে আলোড়িত করে। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলতেন উত্তরপুরুষেরা তাঁকে স্মরণ করবে তাঁর সঙ্গীত ছোটগল্প ও চিত্রশিল্পের মধ্য দিয়ে। তাঁর কাব্যের কথা রবীন্দ্রনাথ কিছু বলেন নি। খুব সম্ভব তাঁর কাব্যের প্রভাব সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন। কিন্তু জগতের নাট্য-স্রষ্টাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায়?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে টেনিসনের কাব্যপ্রতিভার উৎকর্ষ বিচারে টি. এস. এলিয়টের মন্তব্যের কথা মনে পড়ে। এলিয়ট টেনিসনকে একজন বড় কবি বলে মনে করেছেন। কারণ এলিয়টের মতে বড় কবি হতে হলে যে তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন তা টেনিসনের প্রতিভায় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল: প্রাচুর্য বৈচিত্র্য এবং পরিপূর্ণ রচনাকৌশল (complete competence)। রবীন্দ্র-নাট্যপ্রতিভায় প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। প্রায় সকল শ্রেণীর নাটক-রচনায় তিনি অক্লান্ত উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন। নেহাৎ গীতিধর্মী ভাব-রসাত্মক নাটক থেকে শুরু করে হাস্যরসাত্মক প্রহসন, উৎকৃষ্ট কমেডি, অন্তর্বিদীর্ণ ট্র্যাজেডি, রূপক ও সাংকেতিক নাটক, মুখ্যত অধ্যাত্ম চেতনামূলক নাটক—এমনকি সমসাময়িক সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যামূলক নাটক রচনা করে তিনি তাঁর মনের সজীবতা প্রসারতা এবং জাগ্রত চৈতন্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর

লিখিত মোট নাটকের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশখানিরও বেশী। এ সমস্ত নাটকের মধ্যে কতগুলি নাটককে নাট্যগুণের অভাবের জন্য কবির কৃতিত্বের সীমা থেকে বহিষ্কার করে দিলেও তাঁর রচনার মধ্যে তবু বহুসংখ্যক নাটক থেকে যায় যাদের উৎকর্ষ বিচারে রবীন্দ্রনাথকে একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান দেওয়া চলে। (নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এ উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান শুধু এদেশের নাট্যকার সমাজে নয়—জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার-সভায়ও তিনি একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

রবীন্দ্র নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে বাঙালীসুলভ এ উচ্ছ্বাসপূর্ণ মন্তব্য করতে গিয়ে আবার এলিয়টের মন্তব্যের কথা মনে পড়ে। বাস্তবিকই নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথের complete competence ছিল কী? এদিক থেকে রবীন্দ্র নাট্যপ্রতিভার পুনর্বিচারের সময় এসেছে মনে হয়।

নাটক দৃশ্যকাব্য। তাহলেও নাটকে শ্রব্যকাব্যের স্থান নেই—একথা বলা চলে না। দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের সমন্বয়ে সংঘাতময় ও গতিশীল মানবজীবনের প্রতিচ্ছবিকে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে দর্শকের সামনে পরিস্ফুট করে তোলাই হচ্ছে নাটকের কাজ। বাস্তবের এ অনুকৃতিতে দর্শকের মনে অলক্ষ্যে রসসঞ্চার হয়। এর থেকে মনে হয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকীয় বিষয় একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ ব্যাপার। কিন্তু এ ধারণার ব্যতিক্রমও আছে। নাট্যকার ইচ্ছা করলে সুকৌশলে পাত্রপাত্রীদের মুখে নিজের মতামতও ব্যক্ত করতে পারেন। নাটকে এ রীতির আশ্রয় গ্রহণ সম্ভব হলেও তা অবশ্য শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতির লক্ষণ নয়। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি থেকে নিজেকে সযত্নে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন—যাতে নাটকের বাস্তবতা অক্ষুণ্ণ থাকে। সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার এ বিচ্ছিন্নতা বা নির্লিপ্ততাই (detachment) হল শ্রেষ্ঠ নাটকের অন্যতম ধর্ম। জগতের নাট্যকারদের মধ্যে নাট্যকার হিসেবে সেক্সপীয়রের কালজয়ী প্রতিষ্ঠার কারণও হল এখানে। যে নাটকে নাট্যকার নাট্যোল্লিখিত

চরিত্রগুলিকে নিজের বিশিষ্ট ভাবনা-বাসনার বাহন করে তোলেন সে নাটক উৎকট রূপে প্রচারধর্মী হয়ে উঠে। এতে নাটকের শিল্পধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়। চলমান বাস্তব জীবনের শৈল্পিক রূপ না হয়ে এ ধরনের নাটক লিরিকধর্মী কাব্য হয়ে উঠে।

নাটক স্থষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের অভিনব শিল্পকৌশল এবং অসামান্য চরিত্র ও সংলাপ রচনা-নৈপুণ্যের কথা স্বীকার করেও তাঁর কোন কোন অনুরাগী পাঠক রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রকৃত নাট্যচেতনার অভাবের অভিযোগ আনয়ন করেছেন। এর মধ্যে রবীন্দ্র-সমালোচক এডওয়ার্ড টমসনের অভিযোগ খুবই উল্লেখযোগ্য। *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist* গ্রন্থের ৪৭ সংখ্যক পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন : 'His dramatic work is the vehicle for ideas, rather than the expression of action.' একই গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠায় তিনি আরো বলেছেন : 'Rabindranath's characters are reeds for the poet's brooding music; his meditations on life and death and on the many coloured joy and sorrow of our race.' এ মন্তব্য করেছেন এডওয়ার্ড টমসন রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্য 'প্রকৃতির পরিশোধ' সম্পর্কে। প্রকৃতির পরিশোধ প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার দিক থেকে এ নাটকের অপরিসীম মূল্যের কথা রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে সগর্বে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা ও নাট্যোৎকর্ষ এক বস্তু নয়। বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃতির পরিশোধ-এর প্রকৃত নাট্যমূল্য কী? নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করতে গিয়ে এডওয়ার্ড টমসন এ নাটককে নাটক বলেই স্বীকার করেননি।

এ নাটকের নাট্যমূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : *Nature's Revenge* is a sketch and not a finished composition.······All are shadows; and it is a shadow that watches them, looking 'upon the countless homes

and haunts of men as shifting sandhills beat by a hollow-moaning sea. নাটকের গঠন-কৌশলের কথা মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: 'The play, in original, is extremely loose in construction; the scenes are ragged, with no clear beginnings or endings. এ ছাড়া নাট্যোল্লিখিত চরিত্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন: এ নাটকে চরিত্রের ভিড় এত বেশী যে মনে হয় একটি চরিত্র আর একটি চরিত্রের প্রতিচ্ছায়া। প্রত্যেকটি চরিত্রের মুখে যে সংলাপ দেওয়া হয়েছে তা উচ্ছ্বাসপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতার মত শোনায়। সন্ন্যাসী এবং রঘুদুহিতার মধ্যে যে সমস্ত কথাবার্তা হয়েছে তা সম্ভাব্যতার সীমাকে অতিক্রম করে। নাট্যোৎকর্ষের দিক দিয়ে একমাত্র উল্লেখযোগ্য দৃশ্য হল পথের নরনারীদের কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা।

প্রকৃতির পরিশোধ-এর (১৮৮৪) ৩৩ বৎসর পরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের *Sacrifice and other Plays.* (London : Macmillan, 1917)। মুখ্যত পাশ্চাত্ত্যের পাঠকদের জন্য এ নাট্যসংকলনে প্রকৃতির পরিশোধ-এর ইংরেজী তর্জমা *The Ascetic* অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রকৃতির পরিশোধ রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল ২৩ বৎসর, আর *The Sacrifice* রচনার সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৬ বৎসর। এই ২৩ বৎসরের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথের নাট্য-চেতনা নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণতর হয়েছে। এ ছাড়া উন্নত-রুচি পাশ্চাত্ত্য নাট্য-পাঠকের জন্য লিখেছেন বলে *The Ascetic* নাটকে তিনি প্রকৃতির পরিশোধ-এর তরল ভাবোচ্ছ্বাসকে অনেকাংশে বর্জন করেছেন। এমনকি মৌলিক নাট্যবস্তুর সঙ্গে পারম্পর্যহীন অনেক দৃশ্যকে একই দৃশ্যে প্রকাশ করে তিনি সংযম ও পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ফলে *The Ascetic* নাটক প্রকৃতির পরিশোধ-এর চাইতে অনেক বেশী নাট্যগুণান্বিত। নাটক রচনার প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের নাট্যচেতনা কত দুর্বল ছিল

পরবর্তী কালে রচিত এ যুগের নাটকের ইংরেজী অনুবাদ পড়লেই তা বেশ বোঝা যায়। কবির মতেও প্রকৃতির পরিশোধ-এর একমাত্র মূল্য হল সীমার মধ্যে অসীমের মিলনানন্দের অনুভূতি—যা তাঁর পরবর্তী সমস্ত সাহিত্যকর্মের মূলসূত্র। নাট্যরস সৃষ্টির দিক দিয়ে এ নাটক সম্পর্কে এডওয়ার্ড টমসনের ভাষায় বলা যায়—There is little enough of joy in this sombre drama.

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে রচিত তিনখানি নাটিকা—রুদ্রচণ্ড, কালমৃগয়া ও নলিনী রবীন্দ্ররচনাবলী অচলিত সংগ্রহে মুদ্রিত হয়েছে। এ তিনখানি নাটিকায় রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের নাট্যচেতনার কোন নিদর্শন নেই। রুদ্রচণ্ড তো সেক্সপীয়রের *Revenge Drama*-র একটা ব্যর্থ অনুকরণ। কালমৃগয়া নাটিকা বর্ণনাপ্রধান। এতে নাটকীয় সংঘাতের কোন পরিচয় নেই। 'নলিনী' নাটিকায়ও শুধুমাত্র অস্পষ্ট ছায়াময় কল্পনার সাহায্যে pathos সৃষ্টির চেষ্টা। নাট্যোল্লিখিত স্থান বা কালের কোন স্পষ্ট পরিচয় নেই। একে ঠিক নাটক বলা চলে না। প্রথম যুগে রচিত 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮৬) গীতি-নাটিকাটিতে যদিও সঙ্গীতের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে তথাপি সংলাপের দ্রুত গতিশীলতায় চমৎকার নাট্যরস সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন—'বাল্মীকি প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সঙ্গীতের একটি নতুন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার স্বাদগ্রহণ সম্ভব নহে।' অভিনয়যোগ্য গুণ আছে বলেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের নাটক-নাটিকার মধ্যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' এখনও নাট্যামোদী সমাজে বেঁচে আছে। এ যুগে লিখিত 'মায়ার খেলা' উল্লেখের দাবি রাখে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার পরিচায়ক হিসেবে নয়—সঙ্গীত-প্রতিভার প্রথম উন্মেষের স্মারকরূপে।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের অমিত্রচ্ছন্দে রচিত নাটক 'রাজা ও রাণী'

এবং 'বিসর্জন' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। ২৮ থেকে ২৯ বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি উক্ত দুখানি নাটক রচনা করেন। এ পর্যায়ের নাটককে রবীন্দ্র-সমালোচক এডওয়ার্ড টমসন বলেছেন—First dramas of maturity। মিঃ টমসনের মতে এ নাটক দু'খানি পরিণতির লক্ষণাক্রান্ত শুধু তাদের বিষয়বস্তুর জন্য। নিছক কবিকল্পনা, অস্পষ্ট অনুভূতি ও অনির্দেশ্য বেদনার জগৎ অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ এ নাটক দুখানিতে সবলে প্রবেশ করেছেন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মননের রাজ্যে। এ দুখানি নাটক পূর্ণাঙ্গ নাটকের লক্ষণাক্রান্ত। ব্যক্তিগত প্রেমাসক্তি রাজকর্তব্য ও স্বদেশচেতনাকে অতিক্রম করলে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তার পরিণতি প্রদর্শন 'রাজা ও রাণী' নাটকের প্রধান লক্ষ্য। সেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শে নাটকখানি রচিত হলেও নাট্যপরিণতিতে সেক্সপীয়রীয় দৃষ্টির পরিচয় নেই। নাট্যকাহিনীর আরম্ভ ও বিকাশ মহৎ পরিণামমুখী হলেও নাটকখানি সমাপ্ত হয়েছে সস্তা মেলোড্রামায়। নাটকের শেষ দৃশ্যে কুমারসেনের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে সুমিত্রার প্রবেশ, সুমিত্রার আবেগময় দীর্ঘোক্তি, পতন ও আকস্মিক মৃত্যু, দয়িতের ভয়াবহ পরিণতি দেখে প্রেমিকা ইলার পতন ও মূর্ছা, শঙ্করের বিলাপোক্তি, চন্দ্রসেনের প্রতিক্রিয়া ও রেবতীর প্রতি ভর্ৎসনা এবং পরিশেষে সুমিত্রার মৃতদেহের উপর পড়ে বিক্রমদেবের উচ্ছ্বসপূর্ণ খেদোক্তি আতিশয্য ও অতিনাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। এলিজাবেথীয় নাটকের আদর্শেই যে লেখক আলঙ্কারিক ভাষা এবং প্রবল আবেগসৃষ্টির সাহায্যে দর্শকের মনে নাট্যরস সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছিলেন—তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু নাটকে বহু অনাবশ্যক সংলাপ ও চরিত্রের ভিড়ে সে রস-সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। নাট্যকলার দিক থেকে 'রাজা ও রাণী' নাটকের ত্রুটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনবহিত ছিলেন না। নাট্যরস সৃষ্টির জন্য যে সমস্ত ঘটনা চরিত্র ও সংলাপকে তাঁর অনাবশ্যক মনে হয়েছিল সেগুলিকে নির্মমভাবে বর্জন করে 'রাজা ও রাণী'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ

করেন তিনি ২৮ বৎসর পরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে—'*King and Queen*' নাম দিয়ে (দ্রষ্টব্য *Sacrifice and Other Plays*)। এ আটাশ বছরের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথের নাট্যচেতনা কত তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে রাজা ও রাণীর শেষ দৃশ্যের সঙ্গে *King and Queen*-এর শেষ দৃশ্য মিলিয়ে পড়লেই তা বেশ বোঝা যায়ঃ

স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রার শিবিকার বাহিরে আগমন।

সহসা সমস্ত বাদ্য নীরব

বিক্রমদেব। সুমিত্রা! সুমিত্রা!

চন্দ্রসেন। এ কী, জননী সুমিত্রা!

সুমিত্রা। ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে
কাননে কান্তারে শৈলে রাজ্য ধর্ম দয়া
রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জিয়া,
... ...
লহ মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির। আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ।......
উর্ধ্বস্বরে
মাগো জগৎজননী
দয়াময়ী স্থান দাও কোলে। (পতন ও মৃত্যু)
ছুটিয়া ইলার প্রবেশ
এ কী! এ কী!
[মূর্ছা]

ইলা। মহারাজ কুমার আমার—
অগ্রসর হইয়া

শংকর। প্রভু, স্বামী,
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন,
এই ভালো, এই ভালো!......

……ভৃত্য আমি চিরজনমের
আমিও যাইব সাথে।

চন্দ্রসেন। [মাথা হইতে মুকুট ভূমে ফেলিয়া]
ধিক্ এ মুকুট !
ধিক্ এই সিংহাসন ! [সিংহাসনে পদাঘাত]

রেবতীর প্রবেশ

রাক্ষসী, পিশাচী,
দূর হ দূর হ—আমারে দিস্ না দেখা
পাপীয়সী !

রেবতী। এ রোষ রবে না চিরদিন। [প্রস্থান]

[নতজানু]

বিক্রম। দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না ? রেখে গেলে
চির অপরাধী করে ?……
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান !

'রাজা ও রাণী'র শেষ দৃশ্যের এ অতি-নাটকীয়তা অনুবাদে কী সূক্ষ্ম নাট্যপরিণতি লাভ করেছে দেখুন :

[Enters Sumitra, with a covered tray in her hands]

Vikram. Sumitra ! My Queen !

Sumitra. King Vikram, day and night you sought him in hills and forests, spreading devastation, neglecting your people and your honour, and to-day he sends through me to you his covered head,—the head upon which death sits majestic than his crown.

Vikram. My Queen!

Sumitra. Sire, no longer your Queen ; for merciful death has claimed me. [Falls and dies]

Shankar. My King, my plasten, my darling boy, you have done well. You have come to your eternal throne. God has allowed me to live for so long to witness this glory. And now, my days are done, and your servant will follow you.

[Enters Ila, dressed in a Bridal dress]

Ila. King, I hear the Bridal music. Where is my lover ? I am ready.

দেখা যাচ্ছে অনুবাদে চন্দ্রসেন ও রেবতীর চরিত্র নাট্যপ্রয়োজনের দিক থেকে অনাবশ্যকবোধে একেবারে বর্জিত হয়েছে। বিক্রম সুমিত্রা ও শংকরের বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করে নাট্যোপযোগী করে তোলা হয়েছে। তারপর প্রিয়তমের নিষ্ঠুর মৃত্যুতে ইলার পতন ও মূর্চ্ছা না ঘটিয়ে নাট্যকার সর্বশেষে ইলার মুখে যে ইঙ্গিতময় সংকেত-ভাষণ দিয়েছেন তাতে নাটকের ট্রাজেডিতে গভীরতর রস সঞ্চারিত হয়েছে।

নাট্যচেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ পরিমার্জিত অনুবাদকর্ম নিয়েও রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। এ পরিমার্জিত শিল্পকর্মকে আরও পরিশোধিত সূক্ষ্ম শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করবার প্রেরণা অনুভব করলেন তিনি। ফলে *King and Queen* প্রকাশের আরও বারো বছর পরে রাজা ও রাণী কাহিনীকে ভিত্তি করে নব কলেবরে প্রকাশ করলেন তিনি 'তপতী' নাটক। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ও রাণী নাটকে বিক্রম-সুমিত্রার কাহিনীর মধ্যে কুমারসেন-ইলার কাহিনী অনাবশ্যক প্রাধান্য লাভ করায় তপতীতে সে কাহিনী

বর্জন করে তিনি সন্নিবিষ্ট করলেন নরেশ-বিপাশার স্নিগ্ধ প্রেমের কাহিনী। এ ছাড়া ভাবানুযায়ী সঙ্গীতের অবতারণা এবং সংযত অথচ তীক্ষ্ণ সংলাপের সাহায্যে চমৎকার নাট্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে এ নাটকে। তপতী নাটক রবীন্দ্রনাথের পরিণত নাট্যচেতনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

'বিসর্জন' নাটক (প্রথম প্রকাশ ১৮৯০) রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের নাটক-গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী নাট্যগুণান্বিত। নাটকের বিষয়বস্তুতে রয়েছে দুটি প্রবল আদর্শের সংঘাত : একদিকে বহুযুগসঞ্চিত দেশপ্রথা ও সংস্কারের অন্ধ আনুগত্য আর একদিকে সর্বযুগ-আকাঙ্ক্ষিত জীবপ্রেম ও মানবপ্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়ে নাটকীয় ঘটনা চলমান হয়ে উঠেছে। রঘুপতির মত অন্তর্দ্বন্দ্ববিদীর্ণ ট্র্যাজিক চরিত্র রবীন্দ্র-নাটকে আর নেই—সমালোচকের এ মন্তব্য একেবারে যুক্তিহীন নয়। অপরাপর চরিত্রের মধ্যে গোবিন্দমানিক্য, গুণবতী, জয়সিংহ ও অপর্ণার চরিত্রও উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত হয়েছে। 'প্রেম' ও 'প্রতাপের' দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত প্রেম জয়লাভ করেছে— রবীন্দ্রনাথের এ প্রিয় আদর্শ-অভিমুখী আইডিয়া শুধু বিসর্জন নাটকে নয়—তাঁর পরবর্তী বহু নাটকেও ঘুরে-ফিরে দেখা দিয়েছে। কিন্তু নাটকে আইডিয়া প্রতিষ্ঠা এবং প্রচারই বড়ো কথা নয়—সে আইডিয়া ঘটনাবিন্যাস ও সংঘর্ষ-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কতখানি নাট্যরস সৃষ্টি করতে পেরেছে তাই আমাদের বিবেচ্য।

বিভিন্নমুখী আদর্শসংঘাতে নাটকীয় ঘটনা চলমান হয়ে উঠলেও এ নাটকের আঙ্গিকে যথেষ্ট খুঁত দেখা যায়। বিসর্জন নাটকের রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজী অনুবাদ *Sacrifice* দীর্ঘ সাতাশ বছব পরে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। নাট্যাঙ্গিকের দিক থেকে বিসর্জন নাটকে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি ছিল প্রসারিত নাট্যচেতনার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ *Sacrifice* নাটককে সে সমস্ত ত্রুটিমুক্ত করবার চেষ্টা করেন। অনুবাদে বহু অনাবশ্যক কথাকে

বাদ দিয়ে তিনি দৃশ্য সংখ্যাকে সঙ্কুচিত করেন। বহু প্রিয় ও সুন্দর অংশের এরূপ নিষ্ঠুর বর্জন প্রকৃত নাট্যরস সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। 'বিসর্জন' নাটকে দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষড়যন্ত্রের বর্ণনা আছে—একটি হল গ্রামবাসীদের মধ্যে, আর একটি রাণী কর্তৃক রাজার পালিত পুত্র ধ্রুবকে অপসারিত করবার চেষ্টার মধ্যে। ইংরেজী অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ এ দুটি ষড়যন্ত্রকেই বাহুল্য মনে করে বর্জন করেছেন। দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রের ঘটনাটিকে উপযুক্তভাবে পরিণতি দিতে পারলে নাট্যরস বৃদ্ধি পেত সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ঘটনার নাট্যরূপ দানে দুর্বল হস্তের স্পর্শ লেগেছিল বলেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তা অনুবাদ থেকে অপসারিত করেন। বিসর্জন নাটকের সব চাইতে ত্রুটিপূর্ণ বিষয় বোধ হয় নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর মুখে উচ্ছ্বাসময় দীর্ঘ সংলাপের যোজনা। সম্প্রসারিত নাট্যচেতনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন পরবর্তীকালে এ নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেন তখন এ ত্রুটি সম্পর্কে নিশ্চয়ই তিনি অবহিত হয়েছিলেন। কারণ আমরা দেখি ইংরেজী নাটকে এ ধরনের দীর্ঘ ভাষণ সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে।

বিসর্জন নাটকের অপর প্রধান ত্রুটি হল নাট্যকারের নির্লিপ্ততার (detachment) অভাব। কোন কোন চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার নিজের মতামত নিয়ে স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া কোন কোন চরিত্রের মুখে যে সংলাপ দেওয়া হয়েছে তাও মানব মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। রঘুপতির পরিবর্তনও এসেছে আকস্মিকভাবে। নাটকের পরিসমাপ্তিও নিটোল নয়। মনে হয় নাট্যকারের পূর্বপরিকল্পিত কোন ভাবাদর্শকে জয়যুক্ত করবার জন্যে তাড়াহুড়া করে এরূপ পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এ সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বিসর্জন নাটকে অভিনেয় গুণ যথেষ্ট বর্তমান। ভালভাবে অভিনয় করতে পারলে এ নাটক জনপ্রিয় হতে বাধ্য। নাটকের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় জয়সিংহের জন্য বেদনায় রঘুপতির অন্তর যখন বিদীর্ণ হয়েছে তখন

তাঁর মুখে দীর্ঘ ভাষণ থেমে গিয়ে সংক্ষিপ্ত আবেগময় কথার মধ্যে তা অপূর্ব নাট্যরস সৃষ্টি করেছে। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যে আশ্চর্য অভিনয় করেছিলেন তার আবেগতপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর প্রিয় শিষ্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ।

বিসর্জনের পর রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য নাটক হল—'রাজা'। রাজা প্রকাশিত হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। বিসর্জন ও রাজা নাটক রচনার অন্তর্বর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ অপর কোন বিশিষ্ট নাটক রচনা করেননি। রাজা নাটক প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল ৪৯ বৎসর। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ও উপলব্ধির জগৎ বিস্তৃত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ, রাজনীতি ও সমাজনীতির জগৎ অতিক্রম করে রবীন্দ্র-মন প্রবেশ করেছে অধ্যাত্ম অনুভূতির রাজ্যে। রাজা রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম চেতনাময় প্রথম স্বতন্ত্র পর্যায়ের নাটক। ইতিপূর্বে বাংলা নাট্যজগতে এ ধরনের নাটক আর রচিত হয়নি। এ নাটকের সঙ্গে বাহ্য সাদৃশ্য দেখা যায় শুধু St. Augustin-এর *The Confessions*, দান্তের *The Vita Nuova*, উইলিয়ম ব্লেকের *The Marriage of Heaven and Hell* এবং ফ্রান্সিস টমসনের *The Hound of Heaven* নাটকের। এ নাটকের কাহিনী গ্রহণ করা হয়েছে বৌদ্ধ নাটক থেকে—যদিও রবীন্দ্রনাথের হাতে সে কাহিনীর রূপান্তর ঘটেছে।

রাজা নাটককে বলা যায় বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সমস্যামূলক নাটক। এ সমস্যা বহির্জগতের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন সমস্যা নয়—সূক্ষ্ম চেতনারাজ্যে রহস্যময় ভগবানের সঙ্গে মানবমনের যে লীলা চলে সে লীলার রূপায়ণ প্রচেষ্টা থেকেই রাজা নাটকের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে এরূপ রূপক-সাঙ্কেতিকতার লক্ষণযুক্ত নাটক সম্পূর্ণ অভিনব। এ ধরনের অস্পষ্ট রহস্যময় কাহিনীকে নাটক বলা যায় কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহ জেগেছিল

অনেক পাঠকের মনে। শুধু নাটকের ক্ষেত্রে নয়—রবীন্দ্রনাথের গ্রহিষ্ণু মন বরাবরই নিত্যনতুন শিল্পকর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। রাজা নাটকের সৃষ্টিও সে নবসৃষ্টি-প্রেরণার প্রভাবসঞ্জাত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও একবার একথা স্বীকার করেছিলেন যে তিনি রাজা নাটক সৃষ্টি করেছেন মেটারলিঙ্কের নাটকের ধারায়। মেটারলিঙ্ক ছাড়াও অবশ্য অপর কোন কোন নাট্যকার এ ধরনের নাটক লিখেছেন। রাজা নাটক চিরাচরিত বাংলা নাটকের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন বলে সাধারণ নাটক-বিচারের মানদণ্ড এ নাটক-বিচারে প্রয়োগ করা যায় না। রূপক ও সাঙ্কেতিকতার সাহায্যে এ নাটকে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে তা মানবচিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব বা Inner conflict of the soul. এ নাটককে বলা চলে *Inner Drama.*

এরূপ রূপক-সাঙ্কেতিক পাঠযোগ্য নাটককে রঙ্গমঞ্চে রূপ দিয়ে নাট্যরস সৃষ্টি করা কষ্টকর। তথাপি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ প্রযোজনা-শক্তির সাহায্যে এ নাটককে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করে অনন্যসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। জার্মানি এবং প্যারিসেও এ নাটকের অভিনয় হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চে রূপদান করতে গিয়ে এ নাটকের কতকগুলি ত্রুটি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়েছিল। তাই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত এ নাটকের ইংরেজী সংস্করণ *The King of The Dark Chamber*-এ তিনি কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। যে সমস্ত ভ্রাম্যমাণ গায়কের দল উদ্দেশ্যহীনভাবে মাতামাতি করে নাটকের গতিতে বাধার সৃষ্টি করেছে ইংরেজী সংস্করণ থেকে তিনি তাদের বর্জন করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন দৃশ্যকে নাট্যকার এমনভাবে অদল-বদল করেন যাতে নাট্যসংহতি বৃদ্ধি পায়। বাস্তবিক পক্ষে এরকম একটি গম্ভীর বিষয়কে নিয়ে নাট্যরস সৃষ্টি করতে নাট্যকারকে খুব সতর্ক ভাবে সংযত হতে হয়। কোন তুচ্ছ বিষয় বা খামখেয়ালীকে কোন মতে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত

হয় না। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ যদি বিরক্তিকর কোন কোন অসঙ্গতিকে বর্জন করতেন তাতে নাটকের বিষয়-গৌরব আরও বর্ধিত হত। উদাহরণ স্বরূপ দেখানো যায় 'ঠাকুরদাদা'র চরিত্র। এ চরিত্রটি কোন কোন ক্ষেত্রে নাট্যরস সৃষ্টির সহায়ক হলেও বহুস্থলে নাট্যরস সৃষ্টির পক্ষে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্র সমালোচক এডওয়ার্ড টমসন ঠাকুরদাদা চরিত্রের আচার আচরণে আতিশয্য দেখে বিরক্ত হয়ে বলেছেন—But 'Grandfather' is just a nuisance. রাজা নাটকে সঙ্গীতের প্রাধান্যও নাট্যরস সৃষ্টিতে বাধা দিয়েছে। সেজন্য ইংরেজী সংস্করণে অনেক গানকে তিনি তুলে দিয়েছেন। এডওয়ার্ড টমসনের মতে একটি অতি-প্রাকৃত কাহিনী এবং খেয়ালী ঘটনাবিন্যাস এ নাটককে জনপ্রিয় হবার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে।

রাজা নাটকের কাহিনী ও ঘটনাবিন্যাস সম্পর্কে মিঃ টমসনের এরূপ অভিযোগ কতটা সমীচীন—তা বিচারযোগ্য। রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকের কাহিনী যদি বাস্তবাতিরিক্ত হয় তাতে দোষের কিছু থাকে না। আর এ ধরনের নাটকের ঘটনাবিন্যাসে যদি নাট্যকারের কিছু খেয়ালীপনা প্রকাশ পায় তাও অস্বাভাবিক নয়। এ পর্যায়ের পাশ্চাত্ত্য নাটকেও এ সমস্ত ধর্ম প্রবল। সুতরাং রাজা নাটকের কাহিনী ও ঘটনাবিন্যাস সম্পর্কে টমসন সাহেবের সমালোচনা গ্রাহ্য নয়।

রাজার দুই বৎসর পরে 'ডাকঘর' প্রকাশিত হয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। এ রূপক নাটিকার উৎকর্ষ শুধু এ দেশে নয়—বিদেশেও সমান ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ডাকঘর রবীন্দ্রনাথের অতি-প্রিয় নাটিকা। কবির বাল্যজীবনের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত বলে এ নাটকখানিকে তিনি বিশেষ ভালবাসতেন। জার্মানীতে এ নাটকের সমাদর দেখে তিনি অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। লণ্ডনে এবং প্যারিসেও নাটকখানির অভিনয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অপরের নিকট নাটকখানি রূপকধর্মী মনে হলেও কবির নিকট তা ছিল বাস্তবধর্মী। শুধু

রবীন্দ্রনাথের নিকট নয়—রবীন্দ্র অনুরাগীদের নিকটও নাটকখানি সমান প্রিয় ছিল। কবি ইয়েট্‌স্ এ নাটকখানির ভাবের সঙ্গে ইংলণ্ড ও আয়ার্লণ্ডের অনুরূপ ভাবধারার সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। ভারতীয় মন স্বভাবতই একটি শান্তিময় পরিণামের অভিমুখী। এ নাটকের পরিণতিতে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যে শান্তিময় মিলনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা অলক্ষ্যে ভারতীয় দর্শক-মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু রবীন্দ্র-সমালোচক এডওয়ার্ড টমসন মনে করেন রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে এ নাটক জনপ্রিয় হয়েছিল ঠাকুরদাদার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অন্তস্পর্শী অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্যে। তাঁর মতে রবীন্দ্র-অনুরাগীরা এ নাটকখানি সম্পর্কে আত্যন্তিক উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। যতই দিন যেতে থাকবে এর জনপ্রিয়তা কমতে থাকবে বলে মিঃ টমসনের বিশ্বাস।

বহুজনপ্রিয় এরূপ একখানি নিটোল নাটকের দোষগুণের বিচার করতে গিয়ে মিঃ টমসন বলেন: সমস্ত নাটকের কাঠামোটি কবি-নাট্যকারের ভাবালুতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত নাটকটিতে যে বেদনাময় পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে তা দেখে ভাবপ্রবণ ভারতীয় মন করুণায় দ্রব হয়ে ওঠে। রঙ্গমঞ্চে এ নাটকের কৃতকার্যতার অর্ধেক নির্ভর করে ভারতীয় দর্শকের তরল ভাবপ্রবণ চিত্তের উপর। ইংরেজী অনুবাদ *The Post Office* নাটকে ভাষার সরলতা ও স্বাভাবিকতার সাহায্যে এরূপ তরল ভাবালুতা সৃষ্টির কারণ দূর করা হয়েছে। না হলে ইংরেজী অনুবাদও মৌলিক বাংলা নাটকের মত ভাবালুতায় পর্যবসিত হত।

মিঃ টমসনের মতে এ নাটকের অপর ত্রুটি হল রবীন্দ্রনাথের টাইপ-চরিত্র ঠাকুরদাদার অবতারণা। যখনই রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ 'মুডে'র দ্বারা প্রভাবান্বিত হন তখনই এ ধরনের একটি চরিত্র সৃষ্টি তাঁর পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠে। এ ধরনের চরিত্র সৃষ্টির স্বপক্ষে শুধু এ কথাই বলা যায়—শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্র নাটক পরিপূর্ণ বাস্তবতার

স্তুর অতিক্রম করে রূপক ও রহস্যময় জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ভালোমন্দের অনুভূতিও এ নাটকে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের বিষয়গৌরবী নাটকে যেখানে সরলতা ও ঋজুতাই ছিল প্রত্যাশিত সেখানে নাট্যকার পণ্ডিত সরকারী কর্মচারী কবিরাজ মোড়ল প্রভৃতির প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করে পাঠকের মনে বিরক্তির সঞ্চার করেছেন। নাটকের সর্বশেষ ত্রুটি হল—পরিণতিতে নাটকটি মেলোড্রামা বা অতিনাটকীয়তায় পর্যবসিত হয়েছে। রাত্রিতে আগত রহস্যময় রাজার বারবার আবির্ভাবে পাঠক বিরক্তি বোধ করে। রাজার চরিত্র রূপকের লক্ষণাক্রান্ত এবং গভীর তাৎপর্যময় সন্দেহ নেই। শুধু এ কারণেই সমগ্র রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যে এ রকমের একটি রহস্যময় চরিত্রের একাধিকবার অবতারণা করা সঙ্গত হয়নি।

ডাকঘরের নাটকীয় আবেদন দর্শকের ভাবপ্রবণতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল—মিঃ টমসনের এ অভিযোগ বোধ হয় অস্বীকার করা যাবে না। ঠাকুরদাদার টাইপ-চরিত্রও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ভাবের বাহন এ মন্তব্যও স্বীকৃত। তবে বিষয়-গৌরবী নাটকে স্যাটায়ার যে সার্থকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে তা প্রমাণ করেছেন রবীন্দ্র-সমসাময়িক নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ড শ'। ডাকঘর-এর পরিণতিতে অতি-নাটকীয়তার অভিযোগও বোধ হয় অখণ্ডনীয়। তারপর রাত্রির অন্ধকারে বারে বারে রহস্যময় রাজার আবির্ভাবে অদৃশ্য রহস্যময় ভগবানের বিভূতি যে ক্ষুণ্ন হয়েছে—পরমাত্মার রহস্যবিমুগ্ধ পাঠক মাত্রই তা নিশ্চয়ই অনুভব করবেন।

এ সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, কি চরিত্রসৃষ্টিতে, কি তাৎপর্যপূর্ণ সংলাপে, কি বাস্তবতায়, কি অনির্বচনীয় ও অন্তস্পর্শী আবেদন সৃষ্টিতে ডাকঘর একটি নিটোল শিল্পকর্ম। যে অদ্ভুত বালক-চরিত্রকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ এ

নাটকে নাট্যরস সৃষ্টি করেছেন—তা কালিদাস বা সেক্সপীয়রের কল্পনায় অজ্ঞাত ছিল।

রাজা ও ডাকঘরকে রবীন্দ্র-সমালোচক অজিত চক্রবর্তী অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন নাটক বলে চিহ্নিত করলেও আসলে নাটক দুটিকে ধর্মীয় চেতনাসম্পন্ন নাটক বলে অভিহিত করাই বোধ হয় সমীচীন। এর কারণ এ নাটক দুটিতে ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে নাট্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে।

এর পর রবীন্দ্রমানসের আবার দিক-পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায় পরবর্তী নাটক 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'তে। এ দুখানি নাটব মানবরস-সমৃদ্ধ। 'রক্তকরবী'র ভূমিকায় নাটকটিকে কবি রূপক বলে স্বীকারই করেননি। কারণ এ নাটকে ভগবানের সঙ্গে মানবের রহস্যময় সম্পর্ক বা মানবাত্মার অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় নেই। মুখ্যত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়েই নাটক দুখানি রচিত।

এ যুগের মানবরস-সমৃদ্ধ আর একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক 'অচলায়তন' (১৯১২)। নাটকখানি ডাকঘর-এর কয়েকমাস পরে রচিত হয়। মুক্তধারা ও রক্তকরবীতে আক্রমণ করা হয়েছে যন্ত্রসভ্যতার আওতায় পুষ্ট মানুষের লোভ-প্রবৃত্তিকে। এ প্রবৃত্তি বর্তমান বিশ্বে সার্বজনীন। অচলায়তনে আক্রমণের লক্ষ্য ভারতবাসীর বহুদিন-লালিত অন্ধ কুসংস্কার। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সাহায্যে এ কুসংস্কারকে আক্রমণের মধ্য দিয়ে নাট্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে এ নাটকে।

পূর্ববর্তী নাটক রাজা বা ডাকঘর-এর মত এ নাটকে ভাবগভীরতা নেই। প্রচণ্ড ঘৃণার সঙ্গে মানুষের বহুযুগসঞ্চিত গোঁড়ামিকে উপহাস করেছেন নাট্যকার এ নাটকে। উপহাস প্রবৃত্তিটা মুখ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করায় এ নাটক দর্শক বা পাঠকের মনে কোন গভীর রস সঞ্চার করতে পারে না। এ নাটকের মুল্য বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্র-সমালোচক মিঃ টমসন বলেছেন: 'As a drama, it is just a long

drawn-out frolic, its seriousness of meaning alone making it more than pleasant, and often delightful foolery'। অচলায়তনের গানগুলি গভীর অর্থব্যঞ্জক হলেও নাট্যরস সৃষ্টির পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। নাট্যোল্লিখিত ঘটনাগুলিকে গানের কাঠামো বলেই ভ্রম হয়।

মানুষের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানোদ্ভাবিত শক্তিশালী যন্ত্রের সম্পর্ক দেখাবার উদ্দেশ্যে রচিত হয় মুক্তধারা নাটক (১৯২২)। এ নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে অত্যাচারী শাসক-সমাজের বিরুদ্ধে যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের চিত্র আঁকা হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের অগ্রগামী রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিচায়ক। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক জীবনচিন্তার পরিচয় অতি-প্রত্যক্ষ।

এ সাঙ্কেতিক নাটকে রবীন্দ্রনাথ যেমন ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক চেতনারাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে বর্তমান জীবন-সমস্যার গভীরে সচেতনভাবে প্রবেশ করেছেন তেমনি নাটক রচনায়ও গতানুগতিক রীতিকে ত্যাগ করে বাংলা নাট্যসাহিত্যে নতুন রীতির প্রবর্তন করলেন। ইঙ্গিতময় বর্ণনা সার্থক নাট্যরস সৃষ্টির পক্ষে যে কতটা সহায়ক হতে পারে—অস্তসূর্যের ম্লান আলোকে উদ্ভাসিত, দেবমন্দির থেকেও উর্ধ্বশীর্ষ উদ্ধতভাবে দণ্ডায়মান যন্ত্রের বর্ণনা পড়ে আমরা তা বুঝতে পারি। সমস্ত নাটকের মধ্যে মানুষের কঠিন-কঠোর হৃদয় এবং দুর্নিবার হীন আকাঙ্ক্ষার প্রতি ভগবানের পুঞ্জিত রোষ যেন বাস্তব রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। পথের মধ্যে মানুষের নিত্যপ্রবহমান স্রোত যেন জীবনস্রোতেরই প্রতীক বলে মনে হয়। এ সমস্ত রূপকের মধ্য দিয়ে একটি অনির্বচনীয় নাট্যরস সৃষ্টি হয়েছে বলে কোন কোন সমালোচক মুক্তধারাকে রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপক নাট্য বলে মনে করেন।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রক্তকরবী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ নাটকের অর্থ

নিয়ে পাঠক-সমাজে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। উৎকৃষ্ট রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক হিসেবে এ নাটকের উৎকর্ষ শেষে স্বীকৃত হলেও এর অভিনয়যোগ্যতা সম্পর্কে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। শেষে 'বহুরূপী' সম্প্রদায় কর্তৃক কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এ নাটক যখন সার্থকভাবে অভিনীত হয় তখন দর্শকের মনে কোন সন্দেহ রইল না যে সমসাময়িক সভ্যতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে এ নাটক মুক্তধারার চাইতেও অনেক বেশী বাস্তব। এ নাটকে যে প্রতীকতার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে তা 'বাস্তবতার চাইতেও অনেক বেশী বাস্তব' বলে কোন কোন সমালোচক মতপ্রকাশ করেছেন। একটি অদ্ভুত পরিবেশে অসহায় শ্রমিক সমাজের উপর বিবেকহীন ও নিষ্ঠুর ধনতন্ত্রী সমাজের নিপীড়নের এরূপ বাস্তব চিত্র বিশ্বসাহিত্যেও খুব বেশী নেই। এরূপ বদ্ধ পরিবেশে নন্দিনীর আবির্ভাব দর্শকের মনের উপর স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দেয়—পাঠক ও দর্শকের মনকে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও মুক্ত প্রাণচেতনার দিকে সবলে আকর্ষণ করে।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ নাট্যরস সৃষ্টির সহায়ক ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও তীক্ষ্ণ বাগ্‌ভঙ্গীময় সংলাপ রচনায় হাত পাকিয়েছেন। রক্তকরবীতে রবীন্দ্রনাথের সংলাপ রচনানৈপুণ্য চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। ইঙ্গিতপূর্ণ সংলাপ মানুষের লোভ এবং বিবেকহীনতাকে যেন মূর্ত করে তুলেছে। এ নৈর্ব্যক্তিক বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার মধ্যেও ব্যক্তিগত আনন্দবেদনার সুর হারিয়ে যায়নি। বর্ণনা যতক্ষণ পর্যন্ত নাটকের বিষয়বস্তুর অনুগত ততক্ষণ বাস্তবতার সুর এতটা উচ্চগ্রামে পৌঁছায় যে অভিনয়ের সময় দর্শকের সমস্ত চেতনা স্তম্ভিত হয়। কিন্তু নাট্যকারের ব্যক্তিক অনুভূতির সুর যখন নাট্যবস্তুর উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন বাস্তবের এ আশ্চর্য অনুকৃতি বাষ্পময় রোমান্টিকতার কুহেলিতে আচ্ছন্ন হয়ে নাটকের অর্থকে অস্পষ্ট করে তোলে। রক্তকরবী নাটকের মূল সুরের অস্পষ্টতার কারণ খুঁজতে হবে এখানে। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে অস্পষ্ট হলেই শিল্পকর্ম উৎকর্ষ হারায় না।

বরং আধুনিক শিল্পতাত্ত্বিকদের মতে অস্পষ্টতাই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের অন্যতম লক্ষণ।

রক্তকরবী নাটকে রবীন্দ্র নাট্য-প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটেছে—এ কথা স্বীকার করে নিলেও যে কোন নিবিষ্ট পাঠকের দৃষ্টিতে এ নাটকের কয়েকটি বড় রকমের ত্রুটি চোখে পড়বেই। নাটকের শেষ দৃশ্যে এ শিল্পগত ত্রুটি অত্যন্ত উৎকটভাবে দেখা দিয়েছে। এ দৃশ্যে দেখা গেল রাজার লৌহবেষ্টনীর দ্বার উন্মুক্ত হতেই নন্দিনীর প্রিয়তম রঞ্জনের রক্তাক্ত মৃতদেহ। তার হাতে তখনও রক্তকরবীর কুঁড়ি—যে কুঁড়ি নন্দিনী কিশোরের হাত দিয়ে রঞ্জনকে উপহার পাঠিয়েছে। এ নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখে নন্দিনী বেদনায় ভেঙে পড়ে রঞ্জনকে জেগে উঠবার জন্যে করুণ আবেদন জানাল। মুহূর্তের জন্য সমস্ত দৃশ্যটি একটি গভীর ট্রাজেডির বেদনায় স্পন্দিত হয়ে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তে এ বেদনাময় স্পর্শের সুগভীর আলোড়ন কেন্দ্রচ্যুত হল—যখন রঙ্গমঞ্চের দর্শক সবিস্ময়ে দেখল রাজার বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনতা জাগ্রত হয়ে তুমুল কোলাহল শুরু করেছে, বিদ্রোহীদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছেন রাজা নিজে—এবং তাঁর সঙ্গিনী হল নন্দিনী। একনায়কত্বের সে বিধ্বংসী পরিবেশে ভেসে এল ফসল কাটার গান—যে গানের কথায় নিহিত রয়েছে সমস্ত নাটকের মর্মবাণী।

এ অপ্রত্যাশিত ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটকের আকস্মিক পরিসমাপ্তির কোন যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। দর্শকের করুণা ও ভীতি উৎপাদনের পর রোমান্টিক ভাবালুতা এবং লিরিক উচ্ছ্বাসের মধ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি শুধুমাত্র দর্শকের মনকে বিস্মিত করে না—সমস্ত ট্রাজেডির বেদনাকে যেন ম্লান করে দেয়। একথা অবশ্যস্বীকার্য যে এ নাটকে বাস্তবতার সুর দীর্ঘস্থায়ী না হলেও দর্শকের মনকে বহুক্ষণ পর্যন্ত উদ্দীপ্ত করে রাখে।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর অসামান্য

নাট্যচেতনা কিরূপে অভিব্যক্তি লাভ করেছিল তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। এখন জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী হবার পক্ষে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতা কতখানি সে প্রশ্নের আলোচনায় আসা যাক।

সাধারণতঃ নাটকের উৎকর্ষ নির্ভর করে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-যোগ্যতার উপর—একথা পূর্বেও বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ এতই ক্ষীণ ছিল যে তাঁর নাটকের অভিনয় সহৃদয় সামাজিক মনের উপর কি প্রভাব বিস্তার করে—সে পরীক্ষার সুযোগই বেশী হয়নি। সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর গৃহপরিবেশে ও শান্তিনিকেতনে নিজের উদ্ভাবিত নতুন ধরনের মঞ্চসজ্জার মধ্যে তাঁর নাটকের অভিনয় করাতেন। এরূপ বিচ্ছিন্ন পরিবেশে অভিনীত হবার ফলে রবীন্দ্রনাটকের আবেদন নাট্যামোদী সমাজের মনে বহুদিন পৌঁছায়নি। জীবনের বাস্তবতাকে শিল্পরূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবার অন্যতম উপায় নাটক। কিন্তু জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন অবকাশে নাটকের বাস্তবতার বিকাশ সম্ভব নয়। তার জন্য চাই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের জীবনধর্মী উল্লেখযোগ্য নাটকের বিকাশ হয়েছে রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে এসে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের সাহিত্য ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে থেকেও নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে কেন জড়াতে চাননি—তা এক পরম রহস্য। এ বিচ্ছিন্নতার জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের নাটকগুলি বাস্তবতার সঙ্গে স্পর্শহীন হয়েছে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে বাংলাদেশের নাট্যামোদারা ততই অনুভব করছেন যে—তাঁর শেষ পর্যায়ের নাটকগুলি যদিও কবির ব্যক্তিগত প্রেরণায় লিখিত এবং তাঁর নিজের প্রযোজনায় স্বতন্ত্র রঙ্গমঞ্চে অভিনীত—তথাপি সে নাটকগুলির মত জীবনধর্মী নাটক

বাংলা সাহিত্যে খুব কমই লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা বিচারে এ রহস্যেরও কোন সীমা নির্ণয় করা যায় না।

নাটকে নতুন জীবনচিন্তা এবং অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত naturalism, realism, symbolism, expressionism প্রভৃতি প্রায় সকল টেক্‌নিক্‌ নিয়েই সার্থকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'রাজা'র মত নাটকে মানবাত্মার অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ দিতে গিয়ে তিনি আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করেছেন। রক্তকরবী-র মত নাটকে তাঁর রূপকসৃষ্টি যখন সব চাইতে বেশী জটিলতা প্রাপ্ত হয়েছে তখনই তাঁর বাস্তবধর্মিতাও চরমে উঠেছে। রবীন্দ্র-নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে এও এক বিরাট বিস্ময়!

আবার প্রথম পর্যায়ের নাটকে রবীন্দ্রনাথের রচনার বাহন ছিল পদ্য। একমাত্র জনতার দৃশ্য ছাড়া এ পর্যায়ের নাটকে তিনি গদ্য প্রায় ব্যবহারই করেন নি। এ পর্যায়ে নাটক-রচনায় তিনি সেক্সপীয়রের আদর্শের অনুবর্তী হয়েছিলেন। নাট্যরচনার শেষ পর্যায়ে কিন্তু তিনি সংলাপ রচনায় গদ্যের বাহনের আশ্রয় নেন। নাট্যপ্রয়াসের শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এ রীতিকে ত্যাগ করেননি। জাতকবি হয়েও এ গদ্যের বাহনেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি রচনা করেন। এত অর্থব্যঞ্জনাময় গদ্যসংলাপ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙ্গালী নাট্যকারদের মধ্যে খুব কম নাট্যকারই ব্যবহার করতে পেরেছেন। নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অনন্যতার আর একটি লক্ষণ হল এখানে।

রবীন্দ্র-নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকৃতির লক্ষণ থাক বা না থাক সমসাময়িক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মননশীল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে—এ সত্য সন্দেহাতীত। যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে একটা বিরাট ভাঙাগড়ার যুগ। মনুষ্যত্বের পুরনো মূল্যবোধের স্থলে একটি অভিনব মূল্যবোধ তখন বিশ্ববাসীর মনে নতুন আদর্শচেতনা নিয়ে জাগ্রত হয়ে উঠছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাট্যকর্মের মধ্যে মননশীল নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ এ নতুন মূল্যের অনুসন্ধান করেছেন।

সেজন্যে সমস্ত রবীন্দ্র-নাটকের মধ্যে ভাবজাত সংঘর্ষ অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ নৈর্ব্যক্তিক ভাবাদর্শের অনুসন্ধান করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথের লিরিক উচ্ছ্বাস কোন কোন স্থলে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করায় প্রকৃত নাটকের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাট্য-প্রতিভার যথাযোগ্য স্থান নির্ধারণে এ রহস্যও কম বাধার সৃষ্টি করে না।

রবীন্দ্র নাটকে নাট্যকারের ব্যক্তিত্বে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এ দ্বন্দ্ব নাট্যকারের সঙ্গে ভবিষ্যদ্‌বক্তার দ্বন্দ্ব। এ দুই ধরনের ব্যক্তিত্ব একই নাট্যকারের মধ্যে স্বয়ম্প্রকাশ হলেও অনেকস্থলে তার সুষ্ঠু সমন্বয় হয়নি। এ ছাড়া রবীন্দ্রব্যক্তিত্বে আরও একটি দ্বন্দ্ব পূর্বাপর বিদ্যমান—সে দ্বন্দ্ব মিষ্টিকের ও মানবতাবাদীর। রবীন্দ্রনাটকে এ ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বও আত্মপ্রকাশ করেছে। এ ছাড়া অতীত ও বর্তমানের দ্বন্দ্ব তো আছেই। যখন এ মিষ্টিক ও মানবতাবাদী, কবি ও ভবিষ্যদ্‌বক্তা এবং বর্তমান ও অতীতের মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমন্বয় হয়—রবীন্দ্র নাটক তখনই স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু এ রকম সমন্বয় রবীন্দ্রনাটকে খুব কমই দেখা যায়। নাট্যকর্মে এ সমন্বয়ের অভাব রবীন্দ্রনাথের বহু নাটককে সমুন্নত নাট্যাদর্শ থেকে বিচ্যুত করেছে। তা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে রবীন্দ্রনাটকের মধ্যে আমরা একটি বৃহৎ মনঃশক্তির পরিচয় পাই—যে শক্তি সমসাময়িক জগতের জটিল সমস্যা নিয়ে রূপসৃষ্টি নিরত এবং বিক্ষুব্ধ মানবচিত্তের দ্বন্দ্বকে রূপ দিতে স্থিরলক্ষ্য।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাট্যপ্রতিভা বিচারে আবার টি. এস. এলিয়টের কথায় ফিরে আসা যাক। প্রথম শ্রেণীর নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথের

complete competence ছিল কিনা তা বিচার করবার সময় বোধ হয় এখনও উপস্থিত হয়নি। নাটকসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ছিল যেমন সমসাময়িক বাঙালী নাট্যকারদের চাইতে অগ্রগামী তেমনি নাটকের এবং রঙ্গমঞ্চের টেকনিক সৃষ্টিতেও তিনি গতানুগতিক দেশীয় রীতির স্থলে একটি নতুন আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাঁর নাটকের স্বতন্ত্র ভাবাদর্শ, রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্য পরিকল্পনা, রূপসজ্জা ও আবহসৃষ্টির অদ্ভুত টেকনিক যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মননশীল ও রুচিশীল দর্শকের মনে নাট্যরস সৃষ্টি করতে পারে—রবীন্দ্রনাথ তা নিজে শুধু প্রমাণ করেননি—আমাদের সমসাময়িক কালের কোন কোন রুচিশীল নাট্যসংস্থাও তা প্রমাণ করেছে। যতই দিন যেতে থাকবে, আমাদের দেশের শিক্ষিতরুচি যতই উৎকর্ষ লাভ করবে ততই রবীন্দ্র নাট্য-প্রতিভার প্রকৃত মুল্য নির্ধারিত হবে। নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথের complete competence ছিল কিনা—তা বিচার করবে ভবিষ্যৎ কাল।

রবীন্দ্র উপন্যাসের ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক ভাবকল্পনার পথ বেয়েই বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। সেজন্যে প্রথম পর্যায়ের রবীন্দ্র উপন্যাসে লেখকের স্বাতন্ত্র্য তেমন দীপ্যমান হয়ে ওঠেনি। সমসাময়িক কাব্য রচনায় যেমন উপন্যাস রচনায়ও তেমনি রবীন্দ্রনাথ এ যুগে সমাজসচেতন মনের পরিচয় দিতে পারেন নি। কবি যেন একটি অস্পষ্ট ভাবময় জগতে বিচরণ করছিলেন এ সময়ে। তাই ভাবদ্বন্দ্বই মুখ্যত রূপ পেয়েছে তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে। মধ্যযুগীয় সমাজতান্ত্রিক সমাজাদর্শকে পশ্চাতে ফেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাদেশে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগরণ ঘটছিল সে নবজীবনের ছায়াপাতে জীবন্ত হয়ে উঠেনি তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাস। বঙ্কিমের মত তাঁর এ যুগের উপন্যাসের পটভূমিকায় রয়েছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। সে সমাজের অস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে ইতিহাসে। সে ছায়াচ্ছন্ন ইতিহাসের জগৎকে কল্পনার রঙে রঙীন করে তিনি উপস্থিত করলেন উপন্যাসে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র (১৮৮৩) পটভূমিকায় স্বাধীন যশোরের ইতিহাস, আর 'রাজর্ষি'র (১৮৮৬) পটভূমিকায় স্বাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস। উভয় উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস ও জীবন সমালোচনা অত্যন্ত সহজ, চরিত্রগুলি শুধুমাত্র দোষ বা গুণের প্রতীক। চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় বা বিরোধী আদর্শের সমন্বয় প্রায় দেখাই যায় না। খুড়ো মহারাজ ও গোবিন্দমাণিক্য কবির আদর্শ জগতের মানুষ। ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত হয়েও তাঁরা নিস্পৃহ। উপন্যাসের সমস্ত বিরোধ-বিক্ষোভকে অতিক্রম করে দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে তাঁদের উদার হৃদয়ানুভূতি। মানবতার আদর্শ

সম্পর্কে তাঁদের সংস্কারমুক্ত মনোভাব রবীন্দ্রনাথেরই আদর্শানুভূতির রঙে রঞ্জিত। পারিপার্শ্বিক জীবন সংঘাতের মধ্যেও তাঁরা যে জগতে বিচরণ করেন তা একটা সূক্ষ্ম অনুভবক্ষম ভাবের জগৎ। অবশ্য লোভ হিংসা ক্রূরতা ভোগলোলুপতাময় জীবনের স্থূল দিকটাকেও কবি উপস্থিত করেছেন এ দুই উপন্যাসে। কিন্তু সে বাস্তব সংঘাত-মুখর জীবন কবির আদর্শাভিমুখী চিত্তের প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হয়েছে।

বিরোধী চিত্তবৃত্তির সংঘাতে রাজর্ষির রঘুপতি চরিত্র অবশ্য খুবই জীবন্ত। কিন্তু রঘুপতির অনমনীয় মনোভাবের চাইতে জয়সিংহের দ্বিধাকম্পিত চিত্তই আকর্ষণ করেছে কবির অন্তহীন সহানুভূতি। তেমনি বৌঠাকুরাণীর হাটের বলিষ্ঠ চরিত্র প্রতাপাদিত্যের চাইতে উদয়াদিত্য বা বিভা-জীবনের সকরুণ মাধুর্যই কবির মনকে স্পন্দিত করেছে বেশী।

প্রথম স্তরের দুটি উপন্যাসে ঘটনা-নির্ভরতা প্রাধান্য লাভ করলেও বিশ্লেষণধর্ম একেবারে অনুপস্থিত বলা চলেনা। তবে ঘটনাকে গতিশীল করে তোলবার জন্যে বিশ্লেষণকে টেকনিক হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি পরবর্তী উপন্যাসের মত—এ কথা অবশ্যস্বীকার্য।

প্রকৃতি ও প্রকরণের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় উপন্যাস 'চোখের বালি'র সঙ্গে প্রথম দুইখানি উপন্যাসের আকাশ পাতাল তফাৎ। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ অনেক ছোট গল্প লিখেছেন। মানুষের জীবনের ছোটখাট সুখ দুঃখ তাঁর সামাজিক মনকে জাগ্রত করেছে। কাব্য-জীবনেও 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে প্রবেশ করেছেন তিনি বিরোধ বিক্ষুব্ধ মানবলোকে। কড়ি ও কোমল এবং মানসী থেকে কল্পনা ও নৈবেদ্য কাব্যের সুরের পার্থক্য স্পষ্ট। গল্প উপন্যাসেও কাব-মনের বিবর্তন তেমনি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। ছোটগল্পের পরিণতিতে প্রকৃতি চেতনা, অতিপ্রাকৃত চেতনা, সামাজিক সম্পর্কবৈচিত্র্য প্রভৃতি

জীবনের বিচিত্র স্তরকে অতিক্রম করে কবি প্রবেশ করলেন মানব-মনের গোপন রহস্যজগতে। প্রবল দুঃসাহসিকতার সঙ্গে অবচেতন মনের রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করলেন তিনি 'নষ্টনীড়' নামক বড় গল্পে।

নষ্টনীড় রচনার সময়েই রচিত হয় চোখের বালি উপন্যাস (১৩০৮)। এ উপন্যাসের মেজাজ পূর্ববর্তী উপন্যাস দুখানি থেকে একেবারে আলাদা। কালের দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত এ উপন্যাসখানি ভাবের দিক দিয়েও সৃজনধর্মী রচনার জগতে নবযুগের শঙ্খধ্বনি শুনিয়েছে। ইতিহাসের স্বপ্নাচ্ছন্ন সামন্তজগৎ থেকে কবি প্রবল প্রত্যয়ে প্রবেশ করেছেন সমকালীন স্বচ্ছল উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজ জীবনে। সে জীবনের চিন্তাহীন অবকাশে যে প্রেম-বিরহের ফুল ফোটে, যে ঈর্ষাদ্বন্দ্ব ঘনায়িত হয়, যে লালসাময় কামনা ফণা বিস্তার ক'রে জীবনের শান্ত ছন্দকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে—তারই জীবন্ত রূপ স্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে। কাহিনীর পটভূমিকা-কল্পনায় যেমন লেগেছে অভিনবত্বের ছাপ, তেমনি কাহিনী বিন্যাসেও গ্রহণ করা হয়েছে নতুন টেকনিক। কাহিনীটা এখানে প্রধান নয়—সন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে জীবন্ত মনের পরিচয় দানই এখানে কাহিনীকারের মুখ্য প্রয়াস। ফলে কাহিনীতে ঘটনার বিদ্যুৎগতি অনুপস্থিত। সর্পিল গতিতে অগ্রসর হয়েছে মানসিক দ্বন্দ্বসংঘাতপূর্ণ সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান।

চোখের বালি সমাজাশ্রিত বাস্তবধর্মী উপন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন। সূক্ষ্ম মনঃসমীক্ষার সাহায্যে মানব মনের গুহায়িত রূপ বিশ্লেষণে এত নির্ভীক প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনাপরিণতি সৃষ্টিতে এ নতুন টেকনিক পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের সামনে খুলে দিল এক অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য জগতের দ্বার। বাস্তবধর্মী সামাজিক উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত এ রীতি এখনও অনতিক্রান্ত। সে হিসেবে চোখের বালি বিংশ শতাব্দীর একটি প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস। দ্বিতীয়ত, নৈতিকতার

প্রভাবহীন নিছক জীবন-চিত্র অঙ্কনে এ উপন্যাসখানি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সৃষ্টি করল একটি নতুন আদর্শ। উৎকৃষ্ট শিল্প-সৃষ্টিই এখানে উপন্যাসিকের মুখ্য প্রয়াস। সৌন্দর্য সৃষ্টিতে এ সচেতন প্রয়াসের ফলে শিল্পীর কঠোর সংযম আর্টের সীমাকে লঙ্ঘন করে জীবনের ক্লেদাক্ত রূপ উদ্‌ঘাটন করেনি কোথাও। চোখের বালি রবীন্দ্রনাথের মহৎ সৃষ্টির পর্যায়ে না পড়লেও উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টি হিসেবে চিরদিনই আদৃত হবে সন্দেহ নেই।

চোখের বালির তিন বৎসর পরে রচিত হয় 'নৌকাডুবি' উপন্যাস (১৯০৬)। সমালোচক বুদ্ধদেব বসু সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন, পৃথিবীর উপন্যাস সাহিত্যে এমন পশ্চাদ্‌বর্তনের নজীর খুব বেশি দেখা যায় না। প্রথম স্তরের স্বপ্নাচ্ছন্ন ইতিহাসের জগৎ থেকে রবীন্দ্রনাথ সবলে প্রবেশ করেছিলেন চোখের বালিতে মানুষের বাস্তববিক্ষুব্ধ মনোজগতে। এ বাস্তব জগৎ থেকে নৌকাডুবিতে আবার রোমান্টিক ভাবতরলতায় প্রত্যাবর্তন একটু আশ্চর্য লাগে বৈকি! এ উপন্যাসের সমস্ত কাহিনী যেন কতগুলি আকস্মিক ঘটনার তরঙ্গাভিঘাতে আবর্তিত হয়েছে। ঘটনার চকিত-চমক সৃষ্টির দ্বারা পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টিই যেন এখানে লেখকের মুখ্য প্রয়াস। বিশ্লেষণের সাহায্যে মানব-মনের গভীরে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টিচেতনা এ উপন্যাসে সাময়িক ভাবে অন্তর্হিত। জনৈক রবীন্দ্র সমালোচক বলেছেন, উপযুক্ত রচনার অভাবে নিজের সম্পাদিত পত্রিকার পৃষ্ঠা পূরণের তাগিদেই নাকি নৌকাডুবি উপন্যাসখানি লেখা হয়েছিল। তাই এ উপন্যাসে পূর্ব উপন্যাসের ঘনসংসক্তি দেখা যায় না। শিল্পসৃষ্টি হিসেবে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বাক্ষর না থাকলেও সমসাময়িক সমাজ-জীবনের নিখুঁত চিত্র হিসেবে এ উপন্যাসখানি পরম উপভোগ্য।

এ পর্যন্ত রবীন্দ্র উপন্যাস প্রেমানুভূতিকেন্দ্রিক। এর পর মননশীল শিল্পী রবীন্দ্রনাথ প্রবল প্রত্যয়ে প্রবেশ করলেন সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার মর্মমূলে। তাঁর স্মরণীয় 'গোরা' (১৯০৯) উপন্যাসে স্নিগ্ধ প্রেমানুভূতি আছে। কিন্তু পূর্ববর্তী বা পরবর্তী উপন্যাসের মত এ অনুভূতি উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্রে বর্তমান থেকে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেনি। বরং জীবনসংঘাতে প্রেম জেগে উঠেছে মহিমান্বিত দীপ্তি নিয়ে। রবীন্দ্রানুভূতিতে সে প্রেমই প্রকৃত প্রেম, যে প্রেম শুধু প্রাণোচ্ছল তরুণ তরুণীকে চাঁদের স্বপ্নে উন্মত্ত করে পারিপার্শ্বিককে ভুলিয়ে দেয় না—বিরোধবিক্ষুব্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়ে সে প্রেম সার্থকতা লাভ করে একটি মহৎ জীবনের উপলব্ধিতে। গোরার প্রেমে আছে প্রবল প্রচণ্ডতা—যে প্রেম আন্দোলিত হয়েছে তাঁর উদ্বেল দেশপ্রীতি ও নারী-হৃদয়ের সুকুমার মাধুর্যের মধ্যে। সে বিরাট প্রেম যখন মহৎ পরিণতি লাভ করে তখন পাঠকের অন্তর ভরে উঠে সীমাহীন প্রশান্তিতে।

শুধু প্রেমের মহৎ উত্তরণের দিক দিয়ে গোরা বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় উপন্যাস নয়। যে উদ্দীপ্ত স্বদেশপ্রীতি, যে গভীর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা এবং মানবমাহাত্ম্যবোধের যে সমুচ্চ আদর্শ ভাবকেন্দ্রে বর্তমান থেকে উপন্যাসটিকে বিপুল বিস্তৃতি দান করেছে, তাতে মানব সচেতন কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কবির এই চিন্তাপ্রধান শিল্প-কীর্তি 'মহৎ সাহিত্য' বলে চিরদিনই শ্রদ্ধার আসন পাবে। আজ সমাজ ও ও রাষ্ট্রচিন্তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সত্ত্বেও গোরা উপন্যাসের আবেদন আমাদের কাছে ফুরিয়ে যায়নি। এর কারণ সংকীর্ণ জাতীয়তার সংস্কারমুক্ত যে উদার মানবপ্রেমের রবীন্দ্রমনকে এ উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল—সে স্বপ্ন এখনও বর্তমান পৃথিবীতে বাস্তবে রূপলাভ করেনি। আর যতদিন না মানব জীবনের এ মহৎ আদর্শ এ যুগের স্বদেশপ্রেমিককে বিশ্বসমাজ গঠনের জন্য সক্রিয় করে তুলবে ততদিন বিশ্বকবির এ মহৎ শিল্প-কীর্তি শুকতারার দীপ্তি নিয়ে

দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষের সামনে সুদুর প্রসারিত সত্যপথের দিকে নীরবে ইঙ্গিত করবে। এ হিসেবে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে গোরা শুধু মহৎ সাহিত্য নয়—'চিরন্তন সাহিত্যে'র মর্যাদা পাবে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনায় যেমন ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে তেমনি উপন্যাস রচনায়ও। 'গোরা' ও তার পরবর্তী উপন্যাস 'চতুরঙ্গে'র (১৯১৩) ব্যবধান শুধু আঙ্গিকবৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে নয়, ভাবের উপস্থাপনায়ও সে ব্যবধান স্পষ্ট। উপন্যাসের বৃহৎ পরিধি এখানে সঙ্কুচিত, ঘটনা সংক্ষিপ্ত, বিশ্লেষণও বিস্তৃত নয়। সমস্ত কাহিনীটি ধারণা করে নিতে হয় পাঠককে নিজের বুদ্ধি ও কল্পনা দিয়ে। এমন তথ্যবিরল ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে রচনা করেন নি। গদ্যকাহিনীতে জীবনচেতনার রূপ দিতে গিয়েও লেখক এখানে আশ্রয় নিয়েছেন কাব্যোচিত দ্যোতনার, ভঙ্গিতেও এসেছে দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য। গঠন প্রকরণ ও অন্তর্নিহিত ভাববস্তু উভয় দিক দিয়েই চতুরঙ্গ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

উপন্যাস রচনায় এ অভিনবত্ব চমক লাগিয়ে দিল বাঙালী পাঠককে। একশ্রেণীর পাঠক এ ব্যঞ্জনাময় উপন্যাসের ভিতর দেখতে পেলেন রবীন্দ্র-প্রতিভার এক নবতর রূপ। স্বাগত জানালেন এ উপন্যাসকে বাংলা সাহিত্যের যুগান্তরকারী উপন্যাস বলে। জীবনের অনুভূতি যেখানে গভীর জীবনের প্রকাশও সেখানে রহস্যময়। বিভিন্ন দিক থেকে এ রহস্যময় জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন লেখক এই সংকেতধর্মী উপন্যাসে। উপন্যাসে শাশ্বত মনের রহস্যময় উপলব্ধি নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সমসাময়িক সমাজ-জীবনের তরঙ্গোৎক্ষেপ যেখানে শিল্পীর মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেনা, সেখানে উপন্যাসকে কাব্যোৎকর্ষপ্রধান বললেও বোধ হয় বাস্তবনিষ্ঠ বলা চলে না। সেজন্যে আধুনিক কোন কোন সমালোচক চতুরঙ্গকে অভিহিত করেছেন আংশিকত্বের

লক্ষণাক্রান্ত (Fragmentary) উপন্যাস বলে। বাস্তবিকই পূর্ববর্তী গোরা উপন্যাস বা পরবর্তী 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করলে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে লেখকের চিন্তাবিলাসের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। মনে হয় গোরা উপন্যাসে বিস্তৃত জীবন ও মননের রাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণের পর রবীন্দ্রনাথ সাময়িকভাবে বিশ্রাম খুঁজেছেন মানুষের অন্তর্লোকে প্রবেশ করে। অনুভূতিনির্ভর মানস-রাজ্য পূর্বাপর রবীন্দ্র-মনের স্বচ্ছন্দ বিহারের স্ব-ক্ষেত্র। এ কুহেলিঘেরা জীবন-রাজ্যে বিচরণ করে রবীন্দ্রনাথের রহস্যসচেতন মন পেয়েছে অপার তৃপ্তি। এ তৃপ্ত অন্তর নিয়ে অতঃপর রবীন্দ্রনাথ সবলে প্রবেশ করলেন সমকালীন রাষ্ট্রচিন্তার জগতে 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে।

সমকালীন রাজনীতিচেতনা ও চিরকালীন জীবন নীতিবোধের মিশ্রণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ঘরে বাইরে-র প্রধান চরিত্রগুলি। বস্তুতপক্ষে খণ্ডকালের পটভূমিকায় মোহগ্রস্ত মনের সঙ্গে চিরন্তন মনের দ্বন্দ্বে মানুষের জীবনের যে সত্য পরিচয় ফুটে উঠে তারই নিপুণ বিশ্লেষণের স্বাক্ষর রবীন্দ্রনাথের বহু কাব্য নাটক উপন্যাস। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে বাঙালীর ভাবজীবনে যে আলোড়ন এসেছিল তার তরঙ্গধ্বনি এসে পৌঁছেছিল উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তঃপুরেও। সমাজসচেতন মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেয়েছিলেন সে উদ্বেলিত ভাবজীবনের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। সে উদ্দীপ্ত স্বদেশপ্রেমের বিপুল আবেগ শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাবধর্মী মনকে স্পর্শ করেনি, তাঁর সচল জীবনকেও সবলে আকর্ষণ করেছিল জাতির মুক্তিযজ্ঞের প্রবল উন্মাদনার মধ্যে। কিন্তু সে মহৎ জীবনযজ্ঞ অনুষ্ঠানে তিনি কোন কোন কর্মীর ভিতর এমন স্বার্থান্ধ রূপ দেখলেন যাতে তাঁর শুচিশুদ্ধ আদর্শবাদী অন্তর প্রবলভাবে আলোড়িত হয়ে উঠল। দেশাত্মবোধের ভেকধারী

ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাকামী কোন কোন স্বদেশনেতার উগ্র ব্যক্তিত্বপ্রভাব শুধুমাত্র বাইরের কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, লালসার সহস্র শিখা বিস্তার করে অন্তঃপুরের বিশুদ্ধতা গ্রাস করতেও উদ্যত হয়েছিল। 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ চরিত্র এরূপ ছদ্মবেশী স্বদেশ-প্রেমিককে উপলক্ষ্য করেই রচিত। এ চরিত্র সৃষ্টিতে অতিরঞ্জনপ্রয়াস যে একেবারে নেই একথা বলা চলে না কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাকামী স্থূল প্রবৃত্তির লোক দুষ্ট ক্ষতের মত সমাজদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সামাজিক সকল মহৎ উদ্যমকে যে নষ্ট করে দিতে পারে তারই ইংগিত দিয়েছেন লেখক এই সুচিন্তিত উপন্যাসে। উপন্যাসের বিভিন্ন স্তরে স্থূল ভোগলালসার পরিচয় দিতে গিয়েও শিল্পীর সংযম লঙ্ঘন করেননি কোথাও লেখক।

দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দাম্পত্য প্রেমের স্থান কি অন্তঃপুরে স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত প্রণয়গুঞ্জনে, না বহির্জীবনের কর্মান্দোলনে নারীর পূর্ণ জাগরণের মধ্যে—এ নিয়েও উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। সামাজিক-বন্ধনহীন স্বদেশপ্রেমের উগ্র উত্তেজনা নারীকে জীবনের সহজ বিকাশের পথ থেকে বিচ্যুত করে যে সর্বনাশা মোহের পথে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে তারও সংকেত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে। আবার বাৎসল্যের স্নেহরস যে স্বাতন্ত্র্যকামী মোহগ্রস্ত নারীকে জীবনের 'মহতী বিনষ্টি' থেকে রক্ষা করে দাম্পত্যপ্রেমের মহান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে—সে ব্যঞ্জনাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঘরে বাইরে উপন্যাসে।

রাজনীতি ও সমাজনীতিবোধের এ সমস্ত পরিণত উপলব্ধিকে নব প্রচলিত উজ্জ্বল ভাষাভঙ্গি (চলিত ভাষা) ও নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে জীবন্ত রূপ দিয়ে উপন্যাস সাহিত্যে এক নবদিগন্তের সন্ধান দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে উপন্যাসে। এ দীপ্ত ভাষাভঙ্গিকে বাহন করেই মানব-হৃদয়রহস্যের বিভিন্ন চাবিকাঠির অনুসন্ধান করেছেন লেখক পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে।

গল্প উপন্যাস রচনার মাধ্যমে সমাজচিন্তার বন্ধুর ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সার্থক ভাবে পদচারণা করলেও রবীন্দ্রনাথের মন ছিল আসলে মানব-চিত্তের রহস্য অনুসন্ধানী শিল্পীর মন। শিল্প রচনায় বহির্জীবন থেকে অন্তর্জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনেই তাঁর স্বাভাবিক আনন্দ। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার বিচরণক্ষেত্র মুখ্যত বহু মননশীল প্রবন্ধ। শিল্প রচনায় সামাজচিন্তাকে আশ্রয় করতে গিয়ে বারে বারে ক্লান্তি অনুভব করেছেন সৌন্দর্য-সচেতন শিল্পী। এ ক্লান্তি তাঁর শিল্প রচনাকে অবশ্য হতশ্রী করেনি কোথাও। বরং সমাজ সমস্যার অসমতল ক্ষেত্র থেকে মানুষের হৃদয়-রহস্য জগতে প্রবেশ করে তাঁর শিল্পীমন অনুভব করেছে নিত্যনতুন সৃষ্টির আনন্দ। 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাসে স্বদেশচেতনার দীর্ঘপথ ভ্রমণক্লান্ত শিল্পীপুরুষ আবার প্রত্যাবর্তন করলেন মানুষের আলোছায়া ঘেরা অন্তর-রাজ্যে। অতঃপর রবীন্দ্র-রচিত উপন্যাস প্রধানত ব্যক্তিপ্রেমনির্ভর। শুধু একবার তাঁর শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়ে' সমসাময়িক রাষ্ট্রআন্দোলনের একটি রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে। সেও অবশ্য রচিত হয়েছে ব্যক্তিপ্রেমের পটভূমিকায়।

ঘরে বাইরের বার বছর পরে রচিত হয় 'যোগাযোগ' উপন্যাস (১৯২৯)। এ উপন্যাস সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় যখন প্রকাশিত হয় তখন প্রথমে নাম ছিল 'তিনপুরুষ'। যে বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে এ উপন্যাসের রচনা শুরু হয় উপন্যাসের নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে পরিকল্পনাও সংক্ষিপ্ত রূপ লাভ করে। বর্তমান আকারে 'যোগাযোগ' নামে যে উপন্যাস আমরা পাই তারও প্রধান উপজীব্য বিবাহোত্তর ব্যক্তি-প্রেমের স্বরূপ নির্ণয়। এ উপন্যাসে নারীপ্রেমের যে বলিষ্ঠ রূপ তিনি কল্পনা করেছেন, নারীর ব্যক্তিত্বকে যে সম্ভ্রমপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন তা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কাব্যে বা প্রবন্ধে সুলভ হলেও রবীন্দ্র-উপন্যাসে প্রায় দুর্লক্ষ্যই বলা চলে। বস্তুত 'মহুয়া' কাব্যে স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধিত নারীকণ্ঠে যে ব্যক্তিত্বপ্রতিষ্ঠার বাণী উৎসারিত

হয়েছে অগ্নিগর্ভ ভাষায়, তার একটা স্নিগ্ধোজ্জ্বল অথচ অনমনীয় দৃ রূপ দেখতে পাই যোগাযোগ-এর 'কুমু' চরিত্রে। প্রভুত্বকামী স্ব' সুকুমার প্রেমমাধুর্যহীন স্থূল দেহলালসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে মধুসূদনের বিদ্রোহিনী স্ত্রী কুমুদিনী—ভাবী যুগের নারী-স্বাতন্ত্র্যবোধের চেতনা যেন স্পষ্ট রেখায় রূপ পেয়েছে এ স্মরণীয় চরিত্রে। কল্যাণী নারীর প্রতি আজন্ম শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথের কুমু-চরিত্রে একটি আদর্শের ছায়াপাত ঘটেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ আদর্শায়িত দৃষ্টিই রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রেমানুভূতিকে স্থাপন করেছে জীবনের সমস্ত আবিলতার উর্ধ্বে—এ প্রসঙ্গে এ সত্যটিও স্মরণীয়। যোগাযোগ-এর পরিসমাপ্তি আকস্মিক হলেও ইঙ্গিতময়। রুচিবিকৃতি ও হৃদয়হীনতার জন্যে স্বামী যতই অনভিপ্রেত হোকনা কেন, আর্থিক পরাধীনতার জন্যে সন্তানের জননী নারীর স্থান স্বামী গৃহেই—এ বেদনাময় সত্য উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ-এর বিরোধ-বিক্ষুব্ধ ঘটনাবলীর উপর হয়েছে অন্তিম যবনিকাপাত।

যোগাযোগ উপন্যাসের বাক্যবিন্যাসে ঘরে বাইরের ঝলকিত দ্যুতি নেই—কিন্তু আছে অনুভূতিশীল কবি হৃদয়ের অন্তস্তব্ধ সঙ্গীত। উচ্চ কবিকল্পনার স্পর্শে যোগাযোগ-এর বহু বর্ণনা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বহির্দ্বন্দ্বের চাইতে অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে। বিলম্বিত লয়ে অগ্রসর হয়েছে গতিমন্থর ঘটনাগতি—মনে হয় কাহিনীটি একটি 'মহা-উপন্যাস'-এর ভূমিকা মাত্র। পটভূমিকায় একদিকে রয়েছে বাংলাদেশের ক্ষীয়মান জমিদার বংশ—যে বংশ বিত্তকৌলীন্যে ক্ষীয়মান, কিন্তু প্রকৃত আভিজাত্যবোধে ও মনুষ্যত্বের সাধনায় শ্রদ্ধেয়। পটের অপরদিকে বিরাজ করছে নবযুগের অহংকৃত বণিক সভ্যতার একজন প্রতিনিধি— বিত্তে ক্রমস্ফীত কিন্তু মনুষ্যত্ববোধহীন, স্থূলরুচি ও উৎকট ভোগলালসার পংকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে আত্মিক প্রেরণায় সেতুবন্ধন করতে গিয়ে নিষ্পাপ নিরপরাধ শুদ্ধাত্মা নারী লাঞ্ছিত ক্ষতবিক্ষত। শুধু একটি ক্রান্তি

যুগের বাস্তব চিত্র হিসেবে নয়, গভীরতর জীবনবোধের উপলব্ধিতে যোগাযোগ রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারী। এ উপন্যাস সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনার শক্তি হয়েছে প্রায় অন্তর্হিত।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী উপন্যাসগুলির পরিধি-বিস্তার যেমনি সীমাবদ্ধ তেমনি ভাববস্তুও প্রায় একমুখী। এ পর্বের উপন্যাসে সুগভীর দেশাত্মবোধের প্রেরণা অনুপস্থিত, কবির রসপিপাসু শিল্পীমন ক্রমাগত আবর্তিত হয়েছে ব্যক্তিপ্রেমের রহস্য অনুসন্ধানে। বস্তুতপক্ষে উত্তরকালে বাঙালী ঔপন্যাসিক যে আত্যন্তিক রসচর্চাকেই উপন্যাস রচনার একমাত্র উপজীব্য বলে গ্রহণ করেছিলেন তার মূল প্রেরণাও ছিল রবীন্দ্রনাথের এ পর্বের প্রেমসমস্যামূলক উপন্যাসগুলি। উপন্যাসের আঙ্গিক বিচারে এ পর্বের উপন্যাসগুলিকে ঠিক উপন্যাসও বলা চলেনা। ঘটনা-বিস্তারহীন এ লিরিকধর্মী কাহিনীগুলি অনেকটা ছোটগল্পের বর্ধিত সংস্করণের মত। উপন্যাসের আঙ্গিকবৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে রক্ষিত হোক বা না হোক, এ কাহিনীগুলিতে দ্যুতিময় বাগ্‌ভঙ্গি ও নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে ব্যক্তিপ্রেমের যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে— তাতে সে যুগের পাঠক রবীন্দ্রনাথের সর্বাধুনিক শিল্পকৃতির পরিচয় পেয়ে চমকিত ও বিস্মিত হল।

এ পর্বের প্রথম উপন্যাস 'শেষের কবিতা' শুধু সে যুগের কেন, প্রেমসমস্যামূলক উপন্যাস হিসেবে এ যুগেও আধুনিক বলে বিবেচিত হবার যোগ্য। এ উপন্যাসে বাগ্‌বৈভবের যে দীপ্তি তা প্রায় অননুকরণীয়। তাই রবীন্দ্র পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের উপর সে বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত ভঙ্গির প্রভাব বিশেষ কার্যকরী না হলেও এ উপন্যাসে কবি যে মুক্ত প্রেমের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন উজ্জীবিত করেছে পরবর্তী অনেক কথাসাহিত্যিককে সার্থক ও অসার্থক বহু প্রেমোপাখ্যান রচনায়। কিন্তু কথা উঠে শেষের কবিতা কী শুধু ঈঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতিকামীর

অবসরকালীন প্রেমবিলাসের চিত্র? না, এ উপাখ্যানে অন্তস্তব্ধ প্রেমবেদনা হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে পাঠকের অন্তরেও স্থায়ী রসসঞ্চার করে? যে লীলা-বিলাসের মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসে প্রেমচর্চার শুরু কাহিনীর পরিণতিতে দেখি সে চপলতা ঘটনার আকস্মিকতায় অলক্ষ্যে হয়েছে অন্তর্হিত— আর সে জায়গায় জেগে উঠেছে প্রেমের অন্তর্গূঢ় বেদনার বাণী— যে বাণীর আবেদন মানব হৃদয়ে চিরন্তন। বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের খেলায় বুদ্ধির ঘটেছে চরম পরাজয়—চিরদিনের এ সত্যবাণী হাসিকান্নার মধ্য দিয়ে চমৎকার রসরূপ লাভ করেছে এ উপখ্যানে। 'চোখের বালি'র পরে যদি রবীন্দ্রনাথের আর কোন গল্পোপন্যাস পরবর্তী বাঙালী ঔপন্যাসিকের উপর অনতিক্রমনীয় প্রভাব বিস্তার করে, সে হল শেষের কবিতা— এ সম্পর্কে বোধ হয় দ্বিমতের অবকাশ নেই।

রবীন্দ্রনাথের শেষ তিনখানি উপন্যাসকে (দুইবোন ১৯৩২; মালঞ্চ—১৯৩৩, চার অধ্যায়—১৯৩৪) আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য বিচারে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না। এ উপন্যাসগুলিতে লেখকের পরবর্তী উপন্যাসের ভাবগভীরতাও অনেকাংশে অনুপস্থিত। এ পর্বের প্রথম দুইখানি উপন্যাস প্রধানত অবসরপুষ্ট অর্থশালী নাগরিক-জীবনকেন্দ্রিক। সে জীবনের সঙ্গে দেশ বা বৃহত্তর সমাজের যোগাযোগ শুধু ক্ষীণ নয়—নেই বললেও চলে। এ উপন্যাস দুটির নায়ক নায়িকা যেন রোমান্টিক জগতের মানুষ, নিত্য নতুন প্রেমের স্পর্শে তাদের চিন্তাহীন জীবনকে তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত হতে দেবার জন্যে যেন তারা আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে। যে বিস্তৃত ও গভীর জীবনবোধ লেখকের পূর্ববর্তী কোন কোন উপন্যাসকে ক্লাসিক সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছে সে জীবনবোধের প্রেরণা যেন এ পর্বে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা থেকে বিদায় নিয়েছে। শিল্পরচনায় দেশ ও সমাজচিন্তার স্থান গ্রহণ করেছে এখানে ব্যক্তিপ্রেম-নির্ভর হৃদয়চর্চা।

সমসাময়িক কাব্য ও প্রবন্ধে রবীন্দ্র-মন যখন বিশ্বজীবন ও বিশ্বমনের স্পর্শলাভের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে তখন উপন্যাসে সমাজচিন্তা-নিরপেক্ষ নিছক ব্যক্তিপ্রেমচর্চার প্রাধান্য দেখে পাঠক একটু বিস্মিত হয় বৈকি !

কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার সাধারণ ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, স্বদেশ বা বিশ্বজীবন চিন্তায় কবিমন যখন ক্লান্তি অনুভব করেছে তখনই কবি প্রত্যাবর্তন করেছেন মানুষের হৃদয়রাজ্যে। এ হৃদয়রাজ্যের রহস্য অনুসন্ধান করেছেন শিল্পী কখনও দেশকালের সীমায়, আবার কখনও বা দেশকাল-নিরপেক্ষ নিছক ব্যক্তিপ্রেমের পরিধিতে। 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চে' দেশকাল-সীমোত্তীর্ণ সে ব্যক্তিপ্রেমের জটিল গ্রন্থিমোচনের চেষ্টা, আর চার অধ্যায়ে' দেশের অগ্নিযুগের পটভূমিকায় ব্যক্তিপ্রেমের যথার্থ স্থান নির্ণয়ের প্রয়াস। তিনটি কাহিনীতেই রবীন্দ্রনাথ নিছক শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। 'দুইবোন' কাহিনীটি রচিত হয় কবির একটি প্রিয় আইডিয়াকে রূপ দেবার জন্যে এবং আইডিয়াটি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে কাহিনীর নামকরণের মধ্যে। কাহিনীর নায়িকা শর্মিলা কবি-কল্পিত মায়ের জাতের প্রতীক। এ কল্যাণী নারীর অতিলালনপুষ্ট প্রেমের ভিতর শশাঙ্ক প্রাণের মুক্তি খুঁজে পায়নি। এর কারণ সে প্রেমে নারী অন্তরের প্রীতিক্ষরিত মাধুর্য থাকলেও মোহিনী নারীর আবেগমত্ততা ছিল না। প্রিয়ার সে আবেগ-উষ্ণ অন্তর খুঁজে পেল শশাঙ্ক শর্মিলারই বোন ঊর্মির ভিতর—আর সে মোহিনী নারীর তপ্ত অন্তরের উন্মাদ স্রোতে ঐরাবতের মত ভেসে যাবার উপক্রম হল স্বভাবদুর্বল শশাঙ্ক। মানবপ্রবৃত্তির জটিল রহস্য অনুসন্ধানে এ পর্যন্ত শিল্পী সবল চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে দুর্বলচিত্ত নায়ক কল্যাণী নারীর আদর্শ প্রেমকে অমর্যাদার ধূলিপ্রান্তরে নিক্ষেপ করে পলায়ন করবে—আদর্শবাদী শিল্পীর অন্তর তাতে সায় দেয়নি। সেজন্যে যে কাহিনী ধাপে ধাপে অনিবার্য ট্রাজিক পরিণতির দিকে

অগ্রসর হচ্ছিল সে কাহিনীকে জোড়াতালি দিয়ে লেখক পরিণত করেছেন একটি মিলনাত্তক কাহিনীতে। শশাঙ্কের হৃদয় পরিবর্তনে যদি প্রেমের উত্তরণের আভাস থাকত তা হলে দুইবোন-এর পরিণতিকে হয়ত দুর্বল বলা চলত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিরশুচি অন্তরের আদর্শ প্রেরণা এ কাহিনীর পরিণতিকে যে অস্বাভাবিক করে তুলছে শিল্পবিচারে এ সত্য বোধ হয় অস্বীকার করা যাবে না। দুইবোন-এর শর্মিলার প্রেমে যে মাতৃস্নেহের দাক্ষিণ্য আছে 'মালঞ্চে'র নীরজার প্রেমে সে ঈর্ষাহীন অবারিত উদারতা নেই। নীরজা সংসারের অপর দশজন নারীর মত ঈর্ষা-সন্দেহকাতর সাধারণ নারী। যে স্বামীকে জীবনের দশ বৎসর সে গোপন হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে উৎসর্গ করেছে, নিজের কঠিন পীড়ার সময় সে স্বামীর নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য এবং যৌবনোন্মত্তা অপর নারীর প্রতি অন্ধ রূপমোহ সে ক্ষমার চোখে দেখতে পারেনি। নারী মনস্তত্ত্ব বিচারে এ ক্ষমাহীনতার মধ্যে অসঙ্গতির কোন পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু শিল্পীর হাতে এ স্বাভাবিক ঈর্ষাকাতর নারীর যে নির্মম ট্রাজিক পরিণতি ঘটেছে তাতে কাহিনী-সমাপ্তিতে পাঠকের মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। মনে হয় নিরপরাধ নীরজা আদিত্য-সরলার উৎকেন্দ্রিক প্রেমের নিষ্ঠুর বলি। এ ভাগ্যবঞ্চিতা নারী শিল্পীর সহানুভূতি-বঞ্চিত। শেষের কবিতার স্তর থেকেই যে মুক্তপ্রেমের স্বপ্ন কবি অন্তরে বাসা বেঁধেছিল সে স্বপ্ন বিভিন্ন ভাবনায় বিকেন্দ্রিত হয়েছে পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে। শর্মিলার প্রেমে ব্যাপ্তি আছে। তাই মনে হয় শর্মিলা কবি-অন্তরের সহানুভূতিস্পর্শে মহীয়সী। কিন্তু নীরজার প্রেম ঈর্ষাকাতর, তাই নীরজার পরিণতি নিষ্করুণ—মালঞ্চের বেদনাঘন ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে এমন মন্তব্য সঙ্গত কিনা তা পাঠকের বিবেচ্য।

চার অধ্যায়ে প্রেম চরিতার্থতা লাভের সুযোগ খুঁজেছে প্রবল বিরুদ্ধ প্রতিবেশের মধ্যে। নাটকীয় সংকেতধর্মী এ কাহিনীর ভিতর রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন তা চিরকালীন শিল্পীমনের

প্রশ্ন—বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মনে এ প্রশ্ন জাগ্রত হয়েছে। বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে হয়ত শিল্পীর এ প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদ ও সাহিত্য এক বস্তু নয়। অতএব শিল্প চর্চার দিক থেকে এ প্রশ্ন গ্রাহ্য। চার অধ্যায়ে যে প্রশ্ন শিল্পী-হৃদয়কে আলোড়িত করেছে সে প্রশ্ন এই: যে বিভীষিকাময় গোপন রাজনৈতিক কার্যকলাপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ব্যাহত করে এবং সহজ হৃদয়-ধর্মের দাবিকে অস্বীকার করে, জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি সাধনায় সে বিপ্লবের মূল্য কতখানি? সন্ত্রাসবাদীরা শিল্পীর সঙ্গে একমত না হলেও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল এ গোপনচারী রাজনৈতিক বিপ্লব ব্যক্তিবিশেষকে স্ব-ধর্ম বিচ্যুত করে। শুধু তাই নয়, যে আদর্শপ্রেরণায় বিপ্লবীরা আত্মবিধ্বংসী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে আদর্শেরও পরাজয় ঘটে।

সন্ত্রাসবাদী জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে অপূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে বিপ্লবের পটভূমিকায় প্রেমোপাখ্যানকে স্থাপন করায় অস্পষ্টতা অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য এসেছে চার অধ্যায়ের স্থানে স্থানে। কিন্তু ভাষার শাণিত দীপ্তি, সংলাপে কাব্যোচিত উচ্ছ্বাস, নাটকীয় ঘটনা ও ভাবসংঘাতে রবীন্দ্রনাথের শিল্পকীর্তি এ উপন্যাসে এক নতুন চেতনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। একটি বিরাট জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রেমোপাখ্যানকে স্থাপন করে কাহিনীকে বিস্তৃতি দেবার এরূপ চেষ্টা গোরা উপন্যাসের পরে আর দেখা যায় নি। সে হিসেবে চার অধ্যায় রবীন্দ্র উপন্যাসের জগতে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বশেষে একটি কথা স্মরণযোগ্য: কবির অধিকাংশ রচনার মত তাঁর কোন কোন উপন্যাসও ভাবধর্মী। কল্পনার যে objectivity উপন্যাসকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করে রবীন্দ্রনাথের বহু উপন্যাসে সে দৃষ্টি অনুপস্থিত। Abstraction-এর প্রতি প্রবল প্রবণতার ফলে তাঁর অধিকাংশ

উপন্যাস কাব্যধর্মী। তাঁর প্রেমকেন্দ্রিক কাহিনীগুলি লিরিক কবিতার সুরেলা ছন্দে অণুরণিত। আত্যন্তিক রোমান্সপ্রবণতাও রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাসের দুর্বলতার মূলে। এ কাব্যধর্ম ও ভাববিহ্বল রোমান্স চেতনা এক কালে রবীন্দ্র উপন্যাসকে আদর্শস্থানীয় করেছিল লেখক মহলে, আর জনপ্রিয় করেছিল পাঠক মহলে। কিন্তু আপেক্ষিক বাস্তববোধের অভাবের ফলেই রবীন্দ্র উপন্যাস আধুনিক লেখক বা পাঠকের কাছে জনপ্রিয়তা হারাতে চলেছে। জীবন্ত দেশ ও পরিবর্তমান কালের পটভূমিকায় মহৎ উপন্যাস রচনার অসামান্য ক্ষমতা রবীন্দ্র প্রতিভায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাঁর কল্পনাবিলাসী শিল্পীমন বার বার তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে কঠোর বাস্তবভূমি থেকে আলোছায়াঘেরা প্রেমজগতের কুহেলিরাজ্যে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রধান উপন্যাস পূর্ণচন্দ্রালোকে আলোকিত আর মননশীল উপন্যাস মধ্যসূর্যের আলোকে দীপ্ত।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে : আর্ট ও জীবন

রবীন্দ্রনাথের সৃজনী প্রতিভার আশ্চর্য নিদর্শন ছোট গল্প। কাব্য কবিতা নাটক উপন্যাস প্রবন্ধ সাহিত্য রচনায় ভাব ও রূপের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। অবশ্য এ ধরনের সাহিত্যকর্মকে পূর্ণশ্রীমণ্ডিত করবার প্রচেষ্টায় তিনি পূর্বসূরীদের সাধনভিত্তির উপর দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ছোটগল্প সৃষ্টির বেলায় এমন সুযোগ তিনি পাননি। বস্তুতপক্ষে বাংলাসাহিত্যে নবাগত শিল্পপ্রকরণ—ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রতিভাস্পর্শেই সর্বপ্রথম জন্মলাভ করে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেন :

> Before I had written these short stories there was not anything of that type in Bengali literature. No doubt Bankimchandra had some stories, but they were of a romantic type ; mine were full of the temperament of the village people. There was the rural atmosphere about them.
>
> [শ্রীসুদর্শনকে কথিত ॥ ১৯৩৬ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের Forward পত্রে প্রকাশিত।]

রবীন্দ্র-মন আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেছে রবীন্দ্রজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা কবিকে নিত্য নতুন সৃষ্টিকর্মে প্রবর্তনা দিয়েছে। জন্মসূত্রে কবি খাঁটি কলকাতার নাগরিক। সেখানে থেকে প্রকৃতির সংস্পর্শে এসেছেন তিনি কালে-ভদ্রে। অথচ রূপরসময়ী প্রকৃতি ও প্রকৃতির নিকট সান্নিধ্যের সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর অন্তরের আকর্ষণ ছিল সহজাত। বিচিত্র প্রকৃতি ও নতুন ধরনের মানুষের সঙ্গে কবির

নিবিড় পরিচয় ঘটল ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করে তাঁকে যখন যেতে হল উত্তরবঙ্গে। পদ্মানদীর উন্মুক্ত প্রসার, বেলাভূমির উদাস বিস্তার, উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন নদীপ্রান্তবর্তী গ্রাম, গঞ্জ, ছোটবড় অসংখ্য গৃহের বিচিত্রধর্মী মানুষের জীবনের সঙ্গে নব পরিচয়— তাঁর মানবচরিত্র রহস্যসন্ধানী মনকে উত্তীর্ণ করে দিল এক নতুন আনন্দবেদনার জগতে। এ সময়কার কবি-মানসের আনন্দময় অভিব্যক্তি ঘটেছে ছিন্নপত্রের পত্রগুচ্ছে। ছিন্নপত্রে যা বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তার বহু অংশ পরবর্তী কালে গল্পগুচ্ছের অনবদ্য ছোটগল্পগুলিতে শিল্পরূপ পেয়েছে। সেজন্য কোন কোন রবীন্দ্র সমালোচক ছিন্নপত্রকে গল্পগুচ্ছের ভূমিকা বলে মন্তব্য করতেও দ্বিধা করেন নি।

পদ্মাপ্রকৃতির নিবিড় সাহচর্য কালে রবীন্দ্রনাথ রচনা করে চলেছেন গভীর ভাব ও রসসমৃদ্ধ সোনার তরী, চিত্রা এবং চৈতালির কবিতাগুলি। এ সমস্ত কাব্যধারায় রবীন্দ্রনাথের অনির্বাণ সৌন্দর্যপিপাসা সহস্র রবিরশ্মির মত অসাধারণ দীপ্তি লাভ করেছে। কিন্তু এ পরিপূর্ণ সৌন্দর্যসম্ভোগের জগতে বাস করেও মানবপ্রেমিক কবি-আত্মা সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেনি। নিতান্ত আড়াল আবডাল থেকেও তিনি পল্লীর মানুষের জীবনে যে অবর্ণনায় দুর্দশার চিত্র দেখেছেন তাতে তাঁর সহানুভূতিশীল কবি-চিত্ত বেদনায় আর্তনাদ করে উঠেছে। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা এ সময়কার কবি অন্তরের দীর্ঘশ্বসিত বেদনার প্রকাশে অনন্যসাধারণ শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। কল্পনাসৃষ্ট রূপজগৎ থেকে সুখদুঃখ পরিপূর্ণ মানব জগতে প্রত্যাবর্তন করবার জন্যে যে অন্তর্বিদীর্ণ হাহাকার এ কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে তার তুলনা রবীন্দ্র কাব্য-সাহিত্যে বিরল।

জমিদারী পরিচালনা ব্যাপারে আজীবন সহরবাসী বিদগ্ধ রবীন্দ্রনাথ প্রথম বারের জন্য পল্লীর মানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেন। কিন্তু এরূপ ব্যবহারিক সম্পর্কের ভিতর মানুষের অন্তর্জীবনের

পরিচয় পাওয়া যায় কতখানি? বাস্তবদৃষ্টির সাহায্যে মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায় সে পরিচয় খণ্ড। মানুষকে পরিপূর্ণভাবে দেখবার জন্যে চাই বাস্তবদৃষ্টির সঙ্গে কল্পনা-দৃষ্টির সামঞ্জস্যময় সম্মিলন। রবীন্দ্রনাথের গল্পসমষ্টি সে সম্মিলিত দৃষ্টির এক আশ্চর্য উদাহরণ। এ অনন্যসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ স্বল্পরেখায় মানবজীবন ও মনের রহস্যময় রূপকে যে সৌন্দর্যের সীমায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তা একমাত্র শিল্পীর তুলিতেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কল্পনাবিলাসী কবি হয়েও ছোটগল্পের ক্ষুদ্র ফ্রেমে মানুষের জীবন ও মনের বিচিত্রধর্মী রূপকে এত নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুললেন কি করে— এ প্রশ্ন মনে আসা অস্বাভাবিক নয়। বস্তুতপক্ষে যে সচল সজীব পল্লীর প্রাণপ্রবাহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ শিল্পসুন্দর কাহিনী রচনা করেন তাঁর সে পল্লীজীবন-অভিজ্ঞতা কতখানি অকৃত্রিম—এ নিয়েও কবিকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল একদিন। এ অভিযোগের জবাব দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৬ সালে বাঁকুড়ার জনসভায় অভিনন্দনের উত্তরে কথিত ভাষণে। সে ভাষণে তিনি বলেন:

> অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়। যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানেনা ফুলকে। জানে, বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মত শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লোকই এই রসবোধের চোখে বাংলা দেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লী পরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোন বাঁধাবুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। সেই পল্লীর প্রতি একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মুখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আজও তা যায়নি।…
>
> ১৮ ফাল্গুন, ১৩৪৬

রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠক মাত্রই জানেন জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে

আধুনিকতম বিষয়বস্তু ও ভঙ্গীর সাহায্যে গল্প রচনা করে রবীন্দ্রনাথ অতি-আধুনিক লেখকদেরও তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি তাঁর প্রথম যৌবনের আনন্দবেদনা-রোমাঞ্চিত কাহিনীগুলির সাহিত্যিক মূল্য পরবর্তী গল্পগুলির মূল্যের চাইতে বেশী বলে বর্ণনা করতে কুণ্ঠিত হন নি। শ্রীসুদর্শনের জিজ্ঞাসার উত্তরে ১৯৩৬ সনে তিনি বলেন :

> At first I was quite unfamiliar with the village life as I was born and brought up in Calcutta and so there was an element of mystery for me. My whole heart went out to the village people as I came in close contact with them.···My earlier stories have this background and they describe this contact of mine with the village people. They have the freshness of youth. There is a note of universal appeal in them for man is the same everywhere. My later stories have not got that freshness, that tenderness of earlier stories.

একই সময়ে শ্রীচন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে ছোটগল্প-বিষয়ক আলাপচারীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনের ছোটগল্পগুলির উৎকর্ষ সম্পর্কে আরো জোরের সঙ্গে বলেন :

> My later stories have not got that freshness, though they have greater psychological value and they deal with problems. Happily I had no social or political problems before my mind when I was quite young. ···During my youth whatever I saw appealed to me with pathos quite strong, and therefore my earlier stories have a greater literary value because of their spontaniety. But now it is different. My stories of the later period have got the necessary technique but I wish I could go back once more to my former life.
> —Forward, 23 February 1936. (অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' থেকে উদ্ধৃত)।

উত্তরবঙ্গের পল্লীপ্রকৃতি ও মানুষ রবীন্দ্র সাহিত্যে সোনার ফসল ফলিয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তারও বহু আগে থেকেই কৈশোরোত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথ গল্প বলার জন্য একটা প্রবল প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে প্রথম যৌবনের উদ্যমে ভারতীর পৃষ্ঠায় তিনি 'ভিখারিণী' নামক যে অকিঞ্চিৎকর গল্পটি লেখেন তার বর্ণনা দিয়েছেন কবি 'ছেলেবেলায়'। তারপর পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মকথনমূলক কাহিনী বলার ভঙ্গীকে অনুসরণ করে গল্প রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কুণ্ঠিত পদক্ষেপ ঘটে ১২৯১ সনের ভারতী ও নবজীবনে প্রকাশিত 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' নামক গল্পদ্বয়ে। ১২৯২ সনে প্রকাশিত 'মুকুট' অনেকটা উপন্যাসধর্মী বলে রবীন্দ্রনাথ কোন গল্পসংগ্রহে উহার স্থান দেন নি। ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা লিখবার (রচনাকাল ১২৯১) সাত বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৯৮ (ইং ১৮৯১) সন থেকে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি স্বকীয় রীতিতে ছোটগল্প লেখা শুরু করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিশ বৎসর বয়স থেকে শুরু করে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনা করে গেছেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরলে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার পরিধিকাল সুদীর্ঘ সাতান্ন বৎসর। ১৮৯১ থেকে সার্থক গল্প রচনা কাল ধরলেও সে কালের পরিধি দাঁড়ায় সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর। এ সুদীর্ঘ কালপরিধির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পল্লী ও নাগরিক জীবনের বিচিত্র রূপ নিয়ে সৌন্দর্যের যে চিত্রশালা রচনা করে গেছেন তা তাঁর সৃজনীপ্রতিভার অন্যতম স্বাক্ষর।

এ সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কালব্যাপী সময়ে জীবনের বিচিত্র দিক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের যে ইন্দ্রজাল রচনা করে গেছেন তার কোন প্রস্তুতি-পর্ব ছিল কী? এ প্রশ্ন যে কোন রবীন্দ্র-গল্প-পাঠকের মনকে আলোড়িত করে। রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে গল্পের প্লট তৈরী করবার আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন

হেমেন্দ্রকুমার রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বনফুল, রাণী চন্দ, মমতা দাসগুপ্ত এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু মুখে মুখে গল্প বানানো এক কথা আর ছোট গল্পের টেক্‌নিক অনুযায়ী আর্টসম্মত গল্প রচনা অন্য কথা। রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনার প্রয়াস বেশী লক্ষিত না হলেও সাহিত্যশিল্প হিসেবে ছোটগল্প উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য দেশে বিশেষ করে ফরাসি দেশে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। গী দ্য মোপাসাঁ ছিলেন সে সময় ফরাসি ছোটগল্প রচয়িতাদের মধ্যমণি। রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারী কার্য উপলক্ষে উত্তরবঙ্গে বসবাস করছেন তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধু লোকেন পালিত মাঝে মাঝেই তাঁর সাহচর্যে কিছুদিন কাটিয়ে যেতেন। লোকেন পালিত ছিলেন দক্ষ ফরাসি ভাষাবিদ্। তিনিই শিল্পীবন্ধু রবীন্দ্রনাথকে ফরাসি ছোটগল্পের দিকে আকর্ষণ করে থাকবেন—এটা কিছু আশ্চর্য নয়। নিত্যনতুন শিল্প প্রকরণের দিকে রবীন্দ্রনাথ আবাল্য তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতেন—এ সত্যও রবীন্দ্রজীবনী পাঠকের অজানা নয়। সুতরাং গল্প রচনার প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু লোকেন পালিতের পরামর্শে ফারসি ছোটগল্পের টেকনিক আয়ত্ত করবার জন্যে মনোযোগী হয়েছিলেন—এমন অনুমান অহেতুক নয়। কেউ কেউ মনে করেন, ফরাসি ছোটগল্পের ভক্ত প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ছোটগল্প রচনার দিকে আকর্ষণ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭১, পৃষ্ঠা-৪০৭)। আবার হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন, ছোটগল্পের আদর্শ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ইংরেজি, ফরাসি ও রুশ গল্পের আদর্শ দেখেছিলেন। (দ্রষ্টব্য, বেতার জগৎ, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা)। ছোটগল্পের সচেতন টেকনিক চর্চার প্রত্যক্ষ ফল হিতবাদী, সাধনা, ভারতী, বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য ছোটগল্পগুলি— এরূপ ধারণাও অযৌক্তিক নয়। ১২৯৯ সনে সোনার তরীর অন্তর্গত

'বর্ষা যাপন' কবিতায় কবি ছোটগল্পের টেকনিক সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণাকেও ব্যক্ত করেছেন দেখা যায়। সুতরাং ছোটগল্প রচনার দিক থেকে দীর্ঘ নিস্ফলা সাতটি বৎসর (১২৯১-১২৯৮) কবি যে ছোটগল্পের টেকনিক আয়ত্ত করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এরূপ অনুমান সঙ্গত বলেই মনে হয়। ১২৯৮ সনে ছয় সপ্তাহ ব্যাপী বিচিত্র গল্প সম্ভার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন হিতবাদীর পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করেন তখন সকল প্রকারের অনুকরণের মোহ ও দ্বিধাসঙ্কোচ কাটিয়ে তিনি নতুন শিল্পসৃষ্টিতে স্ব-প্রতিষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের প্রতি সহানুভূতিশীল কল্পনাপ্রিয় কবি। সুতরাং লোকজীবনের সান্নিধ্যে এসে তিনি যে সাধারণ মানুষের আনন্দ বেদনার মধ্যে অপরূপ সৌন্দর্যলোকের সন্ধান পাবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। না পেলেই বরং আশ্চর্য হবার কারণ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্র-সৃষ্ট এ নব প্রকরণের শিল্প-জিজ্ঞাসায় যে বৈশিষ্ট্য পাঠকের দৃষ্টিকে প্রথমেই আকর্ষণ করে সে হল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার উপযোগী ভাষা। এ শিল্পসম্মত ভাষা ছিল রবীন্দ্রপূর্ব কথা সাহিত্যে অনাবিষ্কৃত। রবীন্দ্রনাথের গল্পের ভাষা রবীন্দ্রনাথের অনন্য শিল্প প্রতিভার অত্যাশ্চর্য উদাহরণ। বর্ণনায় সংলাপে এবং ব্যঞ্জনায় স্বভাবশিল্পী রবীন্দ্রনাথ নিপুণ ভাস্করের মত ভাষাকে যেরূপ ভাবপ্রকাশের বাহন করে তুলেছেন তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। বহু বৎসরের অনুশীলনের ফলে এ শতাব্দীর শেষাব্দে এসে ছোটগল্পের ভাষা যে অসাধারণ দীপ্তি ও গতি লাভ করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের গল্পের ভাষার সমালোচনা করা সহজ। কিন্তু অধুনাতন গল্পরীতির তুলনায় রবীন্দ্রনাথের গল্পরীতির উৎকর্ষ নিরূপণ করতে গেলে বিচারের চাইতে অবিচারই হবে বেশী। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপচারীতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

তোমরা আমার ভাষার কথা বল, বল যে গদ্যেও আমি কবি। আমার

ভাষা যদি কখনও গল্পাংশকে অতিক্রম ক'রে স্বতন্ত্র মূল্য পায়, সেজন্য আমাকে দোষ দিতে পার না। এর কারণ, বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরী করতে হয়েছে আমাকে।... গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্পপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যে সব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরী ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কি দশা হত জানিনে।

যে নিপুণ ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পর্যায়ের গল্পসমষ্টিতে আধুনিক রীতির দীপ্তিময় ভাষা ব্যবহারে ঐন্দ্রজালিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন অধিকাংশ গল্প রচনায় তিনি কৃত্রিম সাধুভাষা ব্যবহার করতে গেলেন কেন—এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত সাহিত্য একাদেমী কর্তৃক ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *Rabindra Centenary Volume* এর *Rabindranath's short stories* নামক প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন, লোকপ্রচলিত ভাষায় স্বীয় কাব্যকে আধুনিক রূপ দিতে গিয়ে কবিগুরু দান্তে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সে একই সমস্যায় বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছের ভাষা সৃষ্টিতে। দান্তের মতই রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর গল্পের ভাষাকে যদি চরিত্রানুযায়ী বাস্তব রূপ দিতে হয় তাহলে তাঁকে অন্ততঃ আধ ডজনেরও বেশী উপভাষা ব্যবহার করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ একাধিক কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভাষাকে সাহিত্যের দরবারে প্রাধান্য দিতে চান নি। তার মধ্যে একটি কারণ বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশের স্কুল সমূহে শিক্ষারীতি সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর এ কমিটি সিদ্ধান্ত করেন যে যেহেতু শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি সাধু ভাষায় লিখিত ও সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ সেহেতু তারা শিক্ষার্থীদের মনে সহজে রেখাপাত করতে পারে না। সেজন্য কমিটি এ মত ব্যক্ত

করেন যে শিক্ষণীয় বিষয়কে শিক্ষার্থীর মনে সঞ্চারিত করে দিতে হলে প্রথমে পাঠ্য বইগুলি লিখতে হবে ইংরেজী ভাষায়। তারপর উত্তর, পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন উপভাষায় তাদের অনুবাদ করে দিতে হবে। এ সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার সাহায্যে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রেরা সহজেই শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হবে। এ প্রস্তাবের ভিতর বাংলা দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মানুষকে বিচ্ছিন্ন করবার যে প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা আছে তার তীব্র বিরোধিতা করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি মনে করেছিলেন, যে সার্বভৌম ভাষারীতির মাধ্যমে বাঙালী এত দিন জাতীয় ঐক্য অনুভব করত—বিভিন্ন বাগ্‌রীতিকে প্রাধান্য দিতে গেলে সে ঐক্য ব্যাহত হবে। এতে জাতি দুর্বল হয়ে পড়বে। ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপভাষা প্রচলিত থাকলেও সাহিত্যে সে দেশের উপভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। তাঁর এ সুচিন্তিত মতকে কার্যকরী রূপ দেবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল সাহিত্য সৃষ্টির অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য সাধুভাষাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

যে স্বজাতিপ্রীতির সুগভীর প্রেরণায় স্বভাবশিল্পী রবীন্দ্রনাথ পল্লী বাংলার সুখ-দুঃখ-আন্দোলিত প্রাণপ্রবাহকে গল্পগুচ্ছের বিচিত্র চিত্রপটে মৃত্যুঞ্জয় রূপ দিয়েছেন সে একই প্রেরণায় বাংলা গদ্যের সর্বজনগ্রাহ্য সাধুরূপকে তিনি কাহিনী বর্ণনার প্রধান বাহন রূপে গ্রহণ করেছেন। এদিক থেকে বিচার করলে গল্পগুচ্ছের ভাষারীতির বিরুদ্ধে সমালোচকের সমস্ত সমালোচনাই স্তব্ধ হয়ে যায়।

প্রয়োজনের খাতিরে গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্পে সাধু গদ্যরীতিকে প্রাধান্য দিলেও ভাষা ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ যে গোঁড়া ছিলেন না 'পয়লা নম্বর' গল্পে দৈনন্দিন জীবনের ভাষা ব্যবহারই তার প্রমাণ। তাঁর শেষ পর্যায়ের গল্পগুলিতে নাগরিক জীবনের সুমার্জিত ভাষা যে কী উজ্জ্বল দীপ্তি লাভ করেছে—তা রবীন্দ্র গল্পপাঠকের অজানা নয়।

এর পরে আসে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বাস্তবনিষ্ঠার কথা। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি এবং কবিতার মাধ্যমেই তিনি মানবজীবনের বিচিত্র রহস্যকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এ প্রচেষ্টায় যে তিনি বহুল পরিমাণে সাফল্য লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রকাব্যের কালজয়ী জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। কিন্তু বিপুলপ্রসার কাব্যসাহিত্যে তিনি সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ আনন্দবেদনার যে বাণীকে ভাষা দিতে পারেননি সে বিচিত্র বাণীকে সার্থক শিল্পরূপ দিয়েছেন তাঁর ছোটগল্পে। সামগ্রিক জীবনসাধনার দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রবীন্দ্র-কাব্যের পরিপূরক। ১৩৪৭ সনে শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন তাঁর আগে মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনীকে কেউ এত সার্থকভাবে সাহিত্যের দরবারে হাজির করেননি :

> এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিলনা, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন।
>
> কবিতা ॥ আষাঢ়, ১৩৪৮

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকেরা যখন সুদূর ইতিহাসের রাজকীয় জীবনের বা সমসাময়িক জমিদার জীবনের ঐশ্বর্যময় কাহিনী নিয়ে রোমান্টিক স্বপ্নসৌধ নির্মাণে ব্যাপৃত, ধনীর দুলাল রবীন্দ্রনাথ তখন অতলান্ত সহানুভূতির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্র সুখ দুঃখ আশা নিরাশা প্রেম বিরহ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও অনির্বচনীয় বেদনার চিত্র। এ কী করে সম্ভব হল? বিভিন্ন রবীন্দ্রসমালোচক এ নব্যধর্মী সাহিত্য প্রকরণের উৎস হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর জোর দিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও চিঠিপত্রে তাঁর স্বজীবনের অভিজ্ঞতাকে

কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের উৎস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমন পোষ্টমাস্টার, ছুটি, সমাপ্তি প্রভৃতি গল্প। গিন্নি, কঙ্কাল, কাবুলি-ওয়ালা, আপদ, বোষ্টমী প্রভৃতি কল্পনাপ্রধান গল্পের পটভূমিকায়ও বাস্তবতার ছায়াপাত আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু গল্পগুচ্ছের শতাধিক গল্পে রবীন্দ্রনাথ মানবমনের রহস্যময় গোপন প্রদেশের যে চাবিকাঠি উন্মুক্ত করেছেন, মানবজীবনের বিচিত্র কর্মধারার যে কৌতুককর কাহিনী সংযোজিত করছেন—তা সমস্তই যে কবির অভিজ্ঞতাসঞ্জাত এমন মনে করবার মত ভ্রান্তি আর কিছুই নেই। বাস্তবিকপক্ষে পাশ্চাত্ত্য দেশের যে সমস্ত কথাশিল্পী সার্থক ছোটগল্প রচনা করে সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন তাদের মত বিভিন্ন স্তরের মানুষের সম্পর্কে আসা আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কখনও সম্ভব হয়নি—হওয়া সম্ভবও ছিলনা। তাহলে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে এত বাস্তব অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হল কী করে ?

এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পাঠক মাত্রই পরম বিস্ময় অনুভব করেন। এখানে এসে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গের সৃজনীপ্রতিভার অভ্রচুম্বী গৌরবকে স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকেনা। বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে জীবনের যে স্তরে পৌঁছাতে তিনি সক্ষম হননা সার্বভৌম মানবিক সহানুভূতি ও সুদূরপ্রসারী কল্পনার সাহায্যে অপরিজ্ঞাত মানবমনের সে সমস্ত রহস্য অনায়াসেই তিনি উদ্‌ঘাটিত করেন।

কবি-কল্পনাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কোন কোন ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে। এ ধরনের ছোটগল্প কাব্যসুরভি-মণ্ডিত। লিরিক কবিতার মত কথা শেষ হয়ে গেলেও এ পর্যায়ের কাহিনীর সুরের রেশ বহুক্ষণ পর্যন্ত পাঠকমনে অনুরণিত হতে থাকে। অনেক রবীন্দ্রসমালোচক গল্পগুচ্ছকে গীতধর্মী বা লিরিক্যাল বলে মন্তব্য করে ছেড়ে দিয়েছেন। ১৯৪১ সনে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলাপচারীতে রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের সমালোচনার

প্রতিবাদ করলেও 'ক্ষুধিত পাষাণ' বা 'কঙ্কাল' জাতীয় গল্পকে নিজেও গীতধর্মী বলে স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর অধিকাংশ গল্প যে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণে রচিত এ সত্য জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে তিনি দ্বিধা করেননি। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুকে তিনি বলেন :

> আমার অবাক লাগে তোমরা যখন বল যে, আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। এক সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা, যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুর বাড়ী গিয়ে ওর কী না জানি দশা হবে। কিংবা ধর একটা ক্ষ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গান জাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনও ঘটেনি। ...গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে।
>
> বুদ্ধদেব বসুর সহিত আলোচনার অনুলিপি ॥ প্রবাসী ॥ আষাঢ়, ১৩৪৮

এ ছাড়া আরো বহু চিঠিপত্রেও রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছের প্রেরণা হিসেবে স্বজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে দৈনন্দিন ঘটনার যথাযথ প্রতিরূপকে কবি রবীন্দ্রনাথ কখনও বাস্তব বলে স্বীকার করেন নি। সাহিত্যের সত্য তাঁর নিকট ছিল বস্তুজীবনের সত্যের চাইতে অনেক বড়। ১৩৩৮ সনে হেমন্তবালা দেবীকে তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন :

> একটা কথা মনে রেখো, গল্প ফোটোগ্রাফ নয়। যা দেখেছি যা জেনেছি তা যতক্ষণ না মরে গিয়ে ভূত হয়, একটার সঙ্গে আর একটা মিশে গিয়ে পাঁচটায় মিলে পঞ্চত্ব পায় ততক্ষণ গল্পে তাদের স্থান হয় না।
>
> রবীন্দ্রনাথ ॥ পত্রধারা ॥ প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩

এটাই হল গল্পগুচ্ছের বাস্তবনিষ্ঠা সম্পর্কে আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথের চরম কথা। বহু দিনের বহু টুকরো কথা টুকরো অভিজ্ঞতা শিল্পীমনের সান্নিধ্যে এসে ধীর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যখন অনুভবগ্রাহ্য সৌন্দর্যমূর্তি ধারণ করে তখনি হয় সে অভিজ্ঞতার নবজন্ম। গল্পগুচ্ছের বিচিত্রধর্মী কাহিনীতে বহুদিনকার বহু বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা জীবনপ্রেমিক কবির শিল্পীমনের স্পর্শে যে সজীবসুন্দর রূপ লাভ করেছে তা চিরদিনই রসিক সমাজে পরম আস্বাদ্য বস্তুরূপে সমাদৃত হবে।

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি পড়তে শুরু করলে প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্য পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে সে হল অজস্র বিচিত্রধর্মী চরিত্র। কত বিভিন্ন স্ত্রী পুরুষ গল্পগুচ্ছের প্রশস্ত অঙ্গনে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ একের সঙ্গে অপরের মিল নেই। সকলেই বিভিন্ন প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও চেতনা নিয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পরিচয় দিয়েছে। রবীন্দ্র নাটকে এমনকি রবীন্দ্র উপন্যাসেও কোন কোন চরিত্র একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে বারে বারে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেছে। কিন্তু ছোটগল্পে এমন কোন টাইপ চরিত্র দেখা যায় না যা পুনঃপৌনিক আবির্ভাবের দ্বারা পাঠক মনকে পীড়িত করে। গল্পগুচ্ছে আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথের মানব চরিত্রাভিজ্ঞতা যেমন ব্যাপক শিল্পনিষ্ঠাও তেমনি গভীর। গল্পগুচ্ছের চরিত্র সৃষ্টিতে কবি যে শিল্প-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা অন্যত্র দুর্লভ। ধর্মজ্ঞই হোক, মর্মজ্ঞই হোক, উচ্ছৃঙ্খলই হোক, সংযতই হোক, ভণ্ডই হোক বা তপস্বীই হোক, বালক যুবক বৃদ্ধ, বালিকা কিশোরী যুবতী বৃদ্ধা, সতীরমণী বেশ্যা— এমন কোন প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির লোক নেই যারা রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত সহানুভূতির স্পর্শে সেখানে জীবন্ত হয়ে উঠেনি। গল্পগুচ্ছের বিচিত্র চিত্রশালায় পল্লীপ্রকৃতির মানুষ কবির সহৃদয় সহানুভূতি স্পর্শে অনন্যসাধারণ গৌরব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু নাগরিক নরনারীর চরিত্র চিত্রণেও তিনি আর্টিস্টের

সহানুভূতির ভাণ্ডারকে সংকুচিত করেন নি বা চিত্র অঙ্কনে কম রঙ্ ব্যবহার করেননি। এ সার্বভৌম সহানুভূতির ফলেই গল্পগুচ্ছের সকল শ্রেণীর চরিত্রই এত উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে।

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি কি কবির অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা মিশানো কাহিনী মাত্র? শুধুমাত্র তাই যদি হত তা হলে গল্পগুচ্ছের আবেদন আধুনিক মনের নিকট এত আকর্ষণীয় হত না নিশ্চয়ই। বস্তুতপক্ষে গল্পগুচ্ছ আধুনিক গল্পপাঠকের নিকটও প্রিয় তাদের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের জন্য। সমাজশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে ব্যক্তিত্বের অবক্ষয় বা বিকাশ, প্রেমের জন্য আত্মনাশী প্রবৃত্তি, মানুষের স্নেহপ্রীতির অপ্রতিরোধনীয় আকর্ষণ, নরনারীর সম্পর্কবৈচিত্র্য, সামাজিক কুসংস্কার, বিদেশী রাজশক্তির উদ্ধত অবিচার প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার শিল্পসম্মত রূপায়ণে গল্পগুচ্ছের অনেক গল্প বিশিষ্ট মূল্য অর্জন করেছে। পরবর্তী কালের পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের এ শ্রেণীর গল্পগুলির রঙ্ একটু ফিকে হয়ে এলেও ভবিষ্যৎ পাঠকের নিকট জাতীয় ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য দলিল রূপে তাদের মূল্য চিরদিনই স্বীকৃত হবে সন্দেহ নেই।

গল্পগুচ্ছের আর এক শ্রেণীর গল্পে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আবিষ্কারে যে অনন্যসাধারণ মৌলিকতা দেখিয়েছেন তার উৎকর্ষ চিরদিনই পাঠক সমাজে স্বীকৃত হবে। এ ধরনের জীবনবোধের শিল্পময় প্রকাশে হয়তো বা কবির আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে। কিন্তু যে বিশিষ্ট জীবনসত্যকে রবীন্দ্রনাথ এ পর্যায়ের ছোটগল্পে মহৎ গৌরব দান করেছেন তা রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখকদের দরবারে অমরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। কবির অতিপ্রিয় জীবনানুভূতি— সুগভীর মর্ত্যপ্রীতি কল্পনার স্বর্ণপাখায় ভর করে গল্পগুচ্ছের আর এক পর্যায়ের গল্পকে যে সমুচ্চ পরিণতি দান করেছে তার তুলনা আধুনিক গল্পসাহিত্যেও বিরল।

সর্বোপরি সর্ব যুগের পাঠকের নিকট পরম বিস্ময় ও বেদনার বাণী বহন করে আনে রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত পর্যায়ের ছোটগল্পগুলি। কত অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, কত অপরিপূর্ণ কামনা, কত অনাস্বাদিত বেদনা, কত সুখ দুঃখ মিলন বিরহের স্মৃতি-গুঞ্জরণে এ শ্রেণীর গল্পগুলি পাঠকমনে কল্পলোকের সৌন্দর্য এনে দেয়। লেখক এত সুকৌশলে সে কল্পলোকের সৌন্দর্যকে জীবনের অতি-প্রত্যক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন যে পাঠক হঠাৎ বুঝে উঠতে পারেন না কোনটি অতি-প্রাকৃত লোকের সামগ্রী আর কোনটি বাস্তবলোকের। বস্তুতপক্ষে কোন কোন রবীন্দ্র-সমালোচক এ পর্যায়ের গল্পকে অতি-প্রাকৃতের কোঠায় ফেলতেই নারাজ। (দ্রষ্টব্য : প্রমথনাথ বিশী ।। রবীন্দ্রনাথে ছোটগল্প ।। পৃষ্ঠা ৭২-৭৪)। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী এ পর্যায়ের তিনটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প—কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ এবং মনিহারা-কে সার্থক রসোত্তীর্ণ গল্প বলে অভিহিত করেছেন। শুধুমাত্র মাষ্টারমশাই গল্পের প্রথমাংশকে তিনি 'যথার্থ অতিপ্রাকৃত রসের উদাহরণস্থল' বলে মনে করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের উক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের গল্পগুলি পাঠকদের নিকট এত সুপরিচিত যে আলোচনায় তাদের নামোল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করা হয়নি।

কোন কোন ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় অনাগত যুগের ভাবধারাকে যে দুঃসাহসিক সবল রূপ দিয়েছেন তা সে যুগে প্রবল সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে 'স্ত্রীর পত্র' স্মরণযোগ্য। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণীর বেদনাসুন্দর কাহিনী রচনায় তিনি যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন সমাজের অত্যন্ত নিম্নস্তরের জীবনচিত্র বর্ণনায়ও সমান নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন (এক সঙ্গে ঠাকুরদা ও শাস্তি পঠিতব্য)। গল্পকার রবীন্দ্রনাথের বাস্তববোধ কত ব্যাপক ও কত গভীর ছিল সমাজের সর্বস্তরের লোকের প্রতি তাঁর বিস্তৃত সহানুভূতিই তার প্রমাণ।

ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ সত্যিকারের আর্টিস্ট্। এ নতুন প্রকরণের সাহিত্যসৃষ্টিতে তিনি সুগভীর বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন সত্য কথা। তথাপি এ ধরনের সাহিত্যকে উপভোগ্য শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত করবার প্রয়াসেও তিনি অক্লান্ত উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন। ছোটগল্পের সৃষ্টিলীলায় সর্বত্রই যে তিনি সমান কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন একথা জোর করে বলা যায় না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি যে প্রশ্নাতীত সাফল্য অর্জন করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিল্পকে সৌন্দর্যলোকে মুক্তি দেবার প্রয়াসে বিভিন্ন গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন তা যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে শ্রেণীর গল্পে কবি-অনুভূতির প্রাধান্য সে শ্রেণীর গল্পে দেখি চরিত্র বা ঘটনার ভিড় নেই। কবি-হৃদয়ের অব্যক্ত-সুন্দর রাগিণী এ পর্যায়ের ছোটগল্পকে চমৎকার কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত করেছে। পোষ্টমাষ্টার, একরাত্রি, শুভা, শুভদৃষ্টি, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ এ পর্যায়ের গল্প। এ শ্রেণীর ছোটগল্প মুখ্যত আবেগপ্রধান।

আর একশ্রেণীর ছোটগল্পে কাহিনী বিন্যাসের আশ্চর্য কৌশল লক্ষণীয়। আবেগ এখানে অনেকাংশে সংযত। কাহিনীকারের গল্প বলার আনন্দ পাঠকের গল্প শোনার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। শিল্পীর সুকৌশল কাহিনী-বিন্যাসের ফলে পাঠক একদিকে যেমন মানবজীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দলাভ করেন তেমনি আপনার অগোচরে মানবমনের অন্তর্দেশে প্রবেশ করে বিস্মিত হন। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ, দালিয়া, দান-প্রতিদান, সমস্যা-পূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, অধ্যাপক, দৃষ্টিদান, কর্মফল, নষ্টনীড় প্রভৃতি এ ধরনের গল্পের উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের গল্পে আবেগ ও গল্প-রসের প্রাধান্য। শেষ জীবনের গল্পগুলিতে দেখা যায় এ দুই প্রবৃত্তিকে

সংযত করে লেখক তত্ত্ব ও চিন্তার জগতে প্রবেশ করেছেন। হালদার গোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র, বোষ্টমী, অপরিচিতা, পয়লা নম্বর, পাত্র ও পাত্রী, নামঞ্জুর গল্প, সংস্কার, বলাই, চোরাই ধন প্রভৃতি এ পর্যায়ের গল্পের দৃষ্টান্ত। ব্যক্তি এবং সমাজের সমস্যাচিন্তাই যেন এ পর্যায়ে রবীন্দ্র-মনকে গল্প রচনায় উদ্দীপ্ত করেছে।

মানবিক সহানুভূতির অসামান্য বিকাশ, গল্প বলার আশ্চর্য কৌশল রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্যায়ের ছোটগল্পগুলিকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু অলঙ্কারবাহুল্য, ভাবপ্রকাশে অযথা কাব্যোচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথের বহু ছোটগল্পে দুর্বলতার কারণ ঘটিয়েছে। বাহুল্য ভয়ে উদাহরণ সংযোজিত না করলেও রবীন্দ্রনাথের গল্প পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন গল্প বলতে গিয়ে লেখক বহু স্থলে কাহিনী বর্ণনা সাময়িকভাবে বন্ধ করে ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পভাষা মদালসা যুবতীর চলার মত গতিমন্থর—উনবিংশ শতাব্দীর অবসরপুষ্ট রোমান্টিক সৌন্দর্যমুগ্ধ মনেরই যেন বহিঃপ্রকাশ। সাম্প্রতিক কালে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে বুর্জোয়া মনোভাবের অভিযোগ আনা হয় সেটা খুব সম্ভব এ গতিমন্থর অলংকৃত ভাষা ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। না হলে ছোটগল্পের বিষয়বস্তুতে তিনি লোকজীবনের আনন্দবেদনাকে যেভাবে আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন তাতে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আনার কোন মানে হয়না।

মাস্টারমশাই, পণরক্ষা, কর্মফল, পুত্রযজ্ঞ প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে করুণ রস সৃষ্টি করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তরল ভাবালুতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। এটাও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সৃষ্টির দোষ বলে বিবেচিত হবে নিশ্চয়ই। কোন কোন ছোটগল্প সাময়িকপত্রের তাগিদে আবার কোন কোন গল্প বন্ধুর ফরমায়েসে অতি দ্রুত লিখিত হয়েছিল বলে লেখক ছোটগল্পের শিল্পোৎকর্ষের দিকে যথেষ্ট

মনোযোগ দিতে পারেননি। বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে রচিত সদর ও অন্দর, উদ্ধার, দুর্বুদ্ধি, ফেল, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ প্রভৃতি এ ধরনের দুর্বল গল্পের দৃষ্টান্তস্থল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুলপ্রসার গল্পসাহিত্যে যে অপূর্ব রূপ ও রস জগতের সৃষ্টি করেছেন তার তুলনায় এ সমস্ত দোষদুর্বলতা অতি নগণ্য বলে বিবেচিত হবার যোগ্য।

পুরাতন অভ্যাসের নির্মোক পরিত্যাগ করে নতুন অভ্যাসের বশবর্তী হওয়া যৌবনের সচলতার ধর্ম। স্বভাবশিল্পী রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে সৃজনধর্মী সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রীতির ক্ষেত্রে অভিনব নতুনকে অভ্যথনা জানিয়ে যৌবনের সচলতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৯১ থেকে ১৯৩৬ সন পর্যন্ত সুদীর্ঘ পয়তাল্লিশ বৎসর কাল সময় একই ধারায় ছোটগল্প রচনা করে ১৯৩৭ সনে যে গল্পকাহিনী নিয়ে সাহিত্যের দরবারে তিনি আবির্ভূত হলেন তার অভিনবত্ব দেখে রবীন্দ্র-পাঠক অবাক হল। ১৯৩৭ সনে প্রকাশিত 'সে' একটি অদ্ভুত রসাশ্রিত কাহিনী। কাহিনীর সূত্রে একটি ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। মুখ্যত ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য লিখিত হলেও বয়স্করাও এ ধারাবাহিক গল্পকাহিনী থেকে উপভোগ ও চিন্তার খোরাক পাবেন। কবির খেয়ালী কল্পনা শেষ বয়সের কোন কোন উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টিতে যেভাবে ব্যঙ্গপরায়ণ হয়ে উঠেছিল 'সে' কাহিনীতে সে কল্পনাই সৃষ্টিধর্মী রূপ নিয়ে অদ্ভুত চরিত্র রচনায় অগ্রসর হয়েছে। যে সাধারণ মানুষের কথা রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের সাহিত্যে অসাধারণ গৌরবদীপ্তি লাভ করেছে 'সে' গল্পগ্রন্থে সে সাধারণ মানুষের কথাই অদ্ভুত রসের সাহায্যে বিবৃত হয়েছে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'গল্পসল্প' গদ্যপদ্যে রচিত। কবিতাগুলিতে গল্পের ভাবধারাকে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ষোলটি গল্প নিয়ে এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ। গল্পগুলি কবির বাল্যস্মৃতির স্মৃতিগুঞ্জরণে

ভরপূর। এ গল্পগুলি মুখ্যত শিশুদের জন্য লেখা হলেও পরিণত কবিমনের মননশীলতায় উজ্জ্বল। শুধুমাত্র গল্প বলাতে কবির যেন আর রুচি নেই। নানা ইঙ্গিতের সাহায্যে জীবনসত্যকে রূপ দেবার দিকেই এখন কবির ঝোঁক।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত (১৯৪০) 'তিনসঙ্গী' রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনা-প্রতিভার এক অত্যাশ্চর্য উদাহরণ। গল্প বলার এতকাল অবলম্বিত রীতি ও বিষয়বস্তুকে পরিত্যাগ করে এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তিনটি গল্পে তিনি সম্পূর্ণ নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ছোটগল্প রচনার দিক থেকে যে সমস্ত নব্যপন্থী কথা-শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে সেকেলে বলে মনে করতেন এ গল্পগুলি সাময়িকপত্রে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আবিষ্কার করলেন ভাববস্তু ও প্রকাশরীতি—উভয় দিক দিয়েই রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতম। তিনসঙ্গীর প্রকাশরীতির অভাবনীয় তীক্ষ্ণতা, গতিশীলতা ও উজ্জ্বল দীপ্তি সমসাময়িক গল্পসাহিত্যে পাওয়া যায় না। গল্পভাষা যেন হীরকের দ্যুতিতে, ঝক্‌মক্ করছে। সংলাপ ও বর্ণনাভঙ্গীতে যে সাবলীলতা ও সুমার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত ঔজ্জ্বল্য দেখা যায় তা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। বহুকালের অনুশীলনের ফলে আর্টিস্ট হিসেবে নতুন ভঙ্গীপ্রিয় রবীন্দ্রনাথের এখানে নবজন্ম ঘটেছে। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের নতুন রীতির উপন্যাস 'শেষের কবিতা' যেমন আধুনিক উপন্যাস শিল্পীদের নতুন আদর্শের উপন্যাস লিখবার প্রেরণা জুগিয়েছে তেমনি 'তিন সঙ্গী'র অভিনব স্টাইলের গল্পগুলিও আধুনিক লেখকদের সামনে আধুনিকোত্তম গল্পরীতির আদর্শ স্থাপন করছে। 'তিন সঙ্গী'তে রবীন্দ্রনাথের বাণীশিল্প উৎকর্ষের এত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তা সাধারণ শক্তিমান শিল্পীর পক্ষে অনুকরণের অতীত।

তিন সঙ্গীর গল্পগুলির যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই পাঠক মনকে তড়িতাহত করে সে হল অভিনব জীবনদৃষ্টির চমক। এরূপ চমকের

জন্যে রবীন্দ্রনাথের গল্পপাঠক পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিলেন না। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের বহু গল্পে নাটকে উপন্যাসে কোন কোন নারী চরিত্র প্রচলিত সামাজিক ও পারিবারিক প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় হয়েছে। কিন্তু কোন চরিত্রই ভারতীয় নারীর সতীত্ব-সংস্কারকে অতিক্রম করে স্বামীর আদর্শটাকেই বড় করে দেখবার দুঃসাহস দেখায়নি। পয়লা নম্বর গল্পের অনিলা, স্ত্রীর পত্র গল্পের নায়িকা মৃণাল নারীত্বের জয়ধ্বজা উড্ডীন করবার জন্য স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছে কিন্তু ল্যাবরেটরি গল্পের নায়িকা সোহিনীর মত কেউ সতীত্বের সংস্কারকে অবাস্তর মনে করেনি। সোহিনী নিজের কন্যার কাছে নিজের দ্বিচারিণীত্ব প্রচার করতে কুণ্ঠিত হয় না, নিজের কন্যাকে নিজের আদর্শ সিদ্ধির অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে কোন সঙ্কোচ অনুভব করে না—পরপুরুষের কণ্ঠলগ্ন হয়ে চুমু খাওয়া তো সামান্য জিনিষ। কিন্তু এসব কেন? নিশ্চয়ই অসংযত কামনা প্রবৃত্তির তাড়নায় নয়। স্বামীর যে অবিসংবাদিত মহৎ আদর্শ ল্যাবরেটরি নামক বস্তুটিকে আশ্রয় করে রূপ লাভ করেছে সে আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে সোহিনী লোকপ্রচলিত সংস্কারকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এ যে ভারতীয় সংস্কারের দুর্গপ্রাকারে কত বড় আঘাত গল্পের সোহিনী বুঝতে না পারলেও রবীন্দ্রনাথের গল্প পাঠক তা ভাল করে বুঝতে পারেন।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের এ অভিনব আদর্শ অন্বিষ্টা স্বজীবনের অভিজ্ঞতার ফলেই প্রাপ্ত বলে বর্ণনা করেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' নামক গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থের ১২৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন: '১৯৩৭-এর ব্যাধির অভিজ্ঞতায় অবচেতনলোকের সহিত মুখোমুখি হইবার পরে উভয় মনের সিংহদ্বার খুলিয়া যাওয়াতে তিন সঙ্গীর গল্পগুলিকে পাই। এই নূতন অভিজ্ঞতার চরম সোহিনী-চরিত্রে।—প্রান্তিক কাব্যে যাহার নির্গুণতত্ত্ব, ল্যাবরেটরি গল্পে তাহার সগুণ মূর্তি।'

জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে রবীন্দ্রনাথ সোহিনী চরিত্র-সৃষ্টিতে নারী-মনের অবচেতন লোকের সিংহদ্বারে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—অধ্যাপক বিশীর এ অনুমান কষ্টকল্পিত বলেই মনে হয়। আসলে জগতের অপরাপর মহৎ জীবনশিল্পীর মত রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যদ্‌ দ্রষ্টা। পাশ্চাত্ত্য দেশের নারী-প্রগতির প্রভাব যেভাবে ভারতীয় নারী মনকে একটি সর্বসংস্কারমুক্ত ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে দ্রুত আকর্ষণ করছিল—জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ তা সচেতন বুদ্ধি ও দৃষ্টি দিয়ে ভালভাবে অনুভব করছিলেন। সোহিনী-চরিত্রে লেখক কল্পনা-দৃষ্টির সাহায্যে সে ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠাকামী নারীকেই দেখেছিলেন। সোহিনী অনাগত যুগের ভারতীয় নারী। এ চরিত্র সৃষ্টিতে শিল্পীর দুঃসাহসিকতা আছে এবং একথা মনে রাখা দরকার নতুন সমাজদ্রষ্টা মাত্রই দুঃসাহসিক। সোহিনী চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় নারীর সম্ভাব্য ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন।

'শেষকথা'য় রবীন্দ্রনাথ নারী মনস্তত্ত্বের অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছেন কোন যুক্তির সাহায্যে নয়—সহৃদয় ও সহজ সহানুভূতির সাহায্যে। কুমারী জীবনে প্রথম প্রেমের আবির্ভাব এত সর্বগ্রাসী যে জীবনের কোন অবস্থায় সে প্রভাবকে সে অতিক্রম করতে পারে না। জীবনের যে মোহমদির মুহূর্তে অচিরা ভবতোষকে হৃদয় সমর্পণ করেছিল সে মুহূর্তটি তার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল। আই. সি. এস হবার পর ভবতোষ অপর নারীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে অচিরার নিষ্কলুষ প্রেমের অমর্যাদা করেছে। তাই বলে অচিরা বৈজ্ঞানিক নবীনমাধবের প্রেমকে চরম মর্যাদা দিয়ে তাঁকে স্বামী রূপে গ্রহণ করতে পারেনি। নবীনমাধবের প্রতি তার স্বাভাবিক আসক্তিকে সে অভিহিত করেছে বন্য প্রাকৃতিক পরিবেশে আদিম অন্ধ প্রাণশক্তির আক্রমণ বলে। অচিরা ভারতীয় নারীর মত ভালবাসার আদর্শকে পূজার জিনিষ বলে মানে। তার মতে এ আদর্শটাই সতীত্ব। 'সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিষটা বনের

প্রকৃতির নয়, মানবীর'। অচিরা বলে পুরুষের সম্পদ জ্ঞানে আর মেয়েদের হৃদয়ে। মেয়েরা সব সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলেও এ হৃদয়-সম্পদ থেকে কেউ তাদের বঞ্চিত করতে পারে না। প্রণয়াস্পদ থেকে চরম অবহেলা পেয়েও অচিরা সে হৃদয়সম্পদকে হারায়নি। সেজন্য নবীনমাধবের মুগ্ধ ভালবাসার অঞ্জলিকে ফেলে লোকালয়ে ফিরে যেতে তার বাধেনি।

যে সমস্ত রবীন্দ্র সমালোচক সোহিনীর আদর্শপ্রীতির মধ্য দিয়ে সতীত্বের এক অভিনব রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, অচিরার প্রেমাদর্শের ভিতর ভারতীয় সংস্কারের পুনরাবির্ভাব দেখে হয়ত তাঁরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। আসলে সমসাময়িক বুদ্ধিচর্চার যুগে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার দিক থেকে সতীত্ব বস্তুটির মূল্য নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। এ জটিল সমস্যা সমাধানে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগে তাঁর জীবনসায়াহ্নে যে দুটি অবিস্মরণীয় স্ত্রী-চরিত্র অঙ্কিত করেছেন রবীন্দ্র-গল্পসাহিত্যে তাদের অনন্যতা অনস্বীকার্য।

'রবিবার' গল্পের নায়ক নাস্তিক অভীককুমারও রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত সৃষ্টি। ভালবাসার স্মৃতি তার নিকট মূল্যহীন। ভগবানের অস্তিত্বে ওর বিশ্বাস নেই। দেশের লোক তার চিত্রশিল্পের সম্যক মর্যাদা দেয় না বলে দেশের বিরুদ্ধে ওর অভিযোগ সীমাহীন। অভিমানের বোঝা নিয়ে সে দেশ ছেড়ে বিদেশে যাত্রা করেছে। কিন্তু যে নারী পিতার পুণ্যস্মৃতি বক্ষে নিয়ে অভীকের দুর্দান্ত প্রেমের নিকট আত্মসমর্পণ করেনি অভীককুমার নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে পাবার ব্যাকুলতা শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেনি। বিলাত যাত্রার পথে অভীককুমার বিভাকে যে পত্র লিখেছে তাতে বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিতর্কের বেড়াজাল অতিক্রম করে সে প্রেমের সহজ কল্পলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'তিন সঙ্গী'র ল্যাবরেটরি গল্পের সোহিনী চরিত্র ছাড়া অপর দুটি গল্পের নায়িকারা জীবনের যে পথে বিচরণ

করেছে তার উপর রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব সুস্পষ্ট। কেবল পটভূমিকা সৃষ্টি বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ রচনা উজ্জ্বল বর্ণনা ও রচনা কৌশলের অভিনবত্বই এ গল্পগুলিকে আধুনিকতার পাদপীঠের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শুধুমাত্র বিভিন্ন রবীন্দ্র-সমালোচক কেন রবীন্দ্রনাথ নিজেও মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্বে তাঁর শেষ পর্যায়ের ছোটগল্পের টেক্‌নিক্ ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের বিশেষ মূল্যের কথা বলেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও স্বীকার করেছেন তাঁর প্রথম দিককার ছোটগল্পের সজীবতা ও সুকুমার মাধুর্য তাঁর শেষ পর্যায়ের ছোটগল্পে নেই। শেষ পর্যায়ের ছোটগল্পে শিল্পকৌশলী রবীন্দ্রনাথ নতুন পটভূমিকা, নতুন বক্তব্য, নতুন সংলাপরীতি, কাহিনীগ্রন্থনের অভিনব পদ্ধতির সাহায্যে যে অভিনব সৌন্দর্য জগত সৃষ্টি করেছিলেন তাব জন্য তিনি সমসাময়িক কথাশিল্পী ও সমালোচকদের নিকট প্রচুর অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। কিন্তু যৌবনে যে অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতির সাহায্যে জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের অতি-পরিচিত সর্বস্তরের নরনারীর আনন্দবেদনা-স্পন্দিত জীবনচিত্রকে শিল্পসুন্দর রূপ দিয়েছেন—জীবনের শেষ প্রান্তে উপনাত হয়ে সে হৃদয়প্রধান জীবনচেতনার যুগে ফিরে যেতে পারছেন না বলে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন (দ্রষ্টব্য : Forward, 23rd Feb, 1936)।

রবীন্দ্রনাথের মত প্রথম শ্রেণীর শিল্পসমালোচকের দৃষ্টির আলোকে তাঁর যৌবনের ছোটগল্পগুলির উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাই বলে পরিণত জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পর্যায়ের ছোটগল্পে যে অভাবনীয় রূপ ও রসজগতের দ্বার উন্মোচন করেছেন তা আমাদের দৃষ্টিকে একটি নতুন সৌন্দর্যজগতের দিকে আকর্ষণ করে—এ সত্য স্বীকার করতেও আমাদের কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য

কাব্যে নাটকে গল্পে উপন্যাসে সঙ্গীতে চিত্রশিল্পে জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ মানব-অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন। এ সমস্ত প্রকাশরীতির মাধ্যমে মানবসত্যকে তিনি যে সৌন্দর্য ও মঙ্গলদীপ্তির আলোকে উদ্‌ভাসিত করে তুলেছেন তা তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষর। কিন্তু প্রখর মনস্বিতা, মানবিক সহানুভূতি এবং ধ্যানগভীর উপলব্ধির প্রভাবে কবির বহুমুখী ব্যক্তিত্ব কোথাও যদি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে —সে তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যকে একজন জগৎ-বিখ্যাত লেখকের মনন এবং চিত্তজাত ফসল মাত্র মনে না করে সর্বযুগের পূর্ণতা-প্রয়াসী ব্যক্তিত্বের বহিপ্র্রকাশের স্মারক বলে মনে করাই বোধ হয় সঙ্গত।

ব্যক্তিত্ব যেখানে বিচিত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে একটি পরম ঐক্যের অভিমুখী হয় তখন তার প্রকাশও ঘটে নিত্যনতুন ভাব ও রূপের জগতে। রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনাও সর্বমানব প্রকৃতি ও ভগবানের সঙ্গে একটি অন্তর্গূঢ় ঐক্য উপলব্ধির সাধনা। এ জটিল সাধনার পথে রবীন্দ্রনাথ স্বজীবনে বহু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। কখনও সে অভিজ্ঞতা এসেছে অমূর্ত ভাবসাধনার পথে, কখনও ব্যক্তিগত জীবনের অবস্থান্তরের ফলে, আবার কখনও বা দেশ জাতি কাল ও বিশ্বজীবন প্রবাহের অতিবাস্তব আলোড়ন এবং আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এ কারণে পাঠক রবীন্দ্রনাথের বিপুল-প্রসার প্রবন্ধ-জগতে প্রবেশ করে দিশেহারা হয়ে যান। হঠাৎ বুঝতে পারেন না কোথায় পাওয়া যাবে প্রকৃত রবীন্দ্রনাথের পরিচয়?

সে পরিচয় কী কবির সাহিত্য সম্পর্কীয় আলোচনায় সীমাবদ্ধ? সে পরিচয় কী এ সমাজসচেতন লেখকের সমাজ শিক্ষা ও রাষ্ট্র সম্পর্কীয় আলোচনায় অনন্যনিরপেক্ষ? সে পরিচয় কী এ ভাবধর্মী লেখকের সুগভীর অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন রচনায় একান্তভাবে বিধৃত?

নিজের আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটনে রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন খণ্ড বিছিন্ন সৃষ্টিকর্মের মধ্যে পাঠক তাঁর পরিপূর্ণ কবি-ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাবেন না। তাঁর অখণ্ড অবিভাজ্য কবি-পরিচয় অনুস্যূত হয়ে আছে তাঁর সামগ্রিক কাব্যপ্রবাহের মধ্যে। স্বীয় কবিপরিচয় প্রসঙ্গে পরিণত বয়সে বরীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। সুদীর্ঘ আশী বৎসরের বয়ঃসীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। মাত্র পনের বৎসর বয়সে সে রচনার শুরু। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্ত সে রচনা কাল বিস্তৃত। এ দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত গদ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন তার প্রসার যেমন বিপুল ভাব-গভীরতাও তেমনি অপরিমেয়।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলির কথাই ধরা যাক্।

বিশ্বসাহিত্যের অতি মনোযোগী পাঠক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কীয় আলোচনা-সমালোচনাগুলি যে নিটোল রস নিবিড়তা লাভ করেছে বর্তমান নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্যমান নির্ণয়ের যুগেও তাদের উৎকর্ষ সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকট স্বীকৃত হবে। এ শ্রেণীর প্রবন্ধ-রাজ্যে প্রবেশ করলে মনে হয়— এই বুঝি প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্ব-ক্ষেত্র। সহৃদয় অনুভূতির প্রকাশে, কবিকল্পনার বিদ্যুৎ-স্ফুরণে, দেশ-বিদেশের সাহিত্যকর্মের রূপ ও রীতি বিশ্লেষণে, সাহিত্যে চিরযুগের আদর্শ অনুসন্ধানে রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় প্রবন্ধে যে অতিসূক্ষ্ম ও সরস অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা আমাদের সমালোচনা সাহিত্যে দুর্লভ।

রবীন্দ্রকাব্যের মত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধেরও ক্রমবিকাশের স্তর আছে। পথ পরিবর্তনের চিহ্নও দুর্লক্ষ্য নয়। ১২৮৩ সনে প্রকাশিত 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর সরোজিনী' ও 'দুঃখ সঙ্গিনী'র সমালোচনা ও ১৩৩৯ সনে প্রকাশিত 'আধুনিক কাব্য' সমালোচনা একই সমালোচকের লিখিত হলেও এ উভয় সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রকাশরীতির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। ১৮৭৭ সনে 'মেঘনাদ বধ কাব্য সমালোচনা'য় কবি-মনের যে অহেতুক উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছিল পরবর্তীকালে সাহিত্যের রীতি নীতি ও গভীরতর প্রবৃত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে সে উগ্রতা স্তিমিত হয়ে এসেছে। সে যায়গায় আত্মপ্রকাশ করেছে সাহিত্যে সৌন্দর্য-সন্ধানীর রসগ্রাহী মন। সে মন ভারতের চিরায়ত সাহিত্য থেকে অমূল্য মনিমুক্তা আহরণ করেছে অনুভূতিশীল চিত্ত ও কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে। এ প্রসঙ্গে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থ স্মর্তব্য। রামায়ণ, মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, কাদম্বরী চিত্র, কাব্যের উপেক্ষিতা, ধম্মপদং প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রাচীন সাহিত্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণে কবি ভাব ও ভাষার যে অপূর্ব রূপজগৎ সৃষ্টি করেছেন তার সুকুমার সৌন্দর্য চিরদিন পাঠকমনকে আকর্ষণ করবে। এ কী শুধুমাত্র অতীত যুগের মানসিকতা বিশ্লেষণ? এ কী শুধু ক্লাসিক সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ? এ যে নতুন সৃষ্টি! সমালোচক চিত্তের অমৃত রসায়নে এ যে অভিনব স্বর্গ আবিষ্কার! শুধুমাত্র সৌন্দর্য আস্বাদনেই যদি কবি-প্রয়াস সীমাবদ্ধ হয়ে থাকত তাহলে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার এত মূল্যসমৃদ্ধি ঘটতনা নিশ্চয়ই। সাহিত্যের সৌন্দর্য সম্ভোগের সঙ্গে এখানে মিলিত হয়েছে লেখকের সমুচ্চ সাহিত্যাদর্শ। কালিদাসের বনামে লেখক বারে বারে ঘোষণা করেছেন—যে সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গলাদর্শ জড়িত নয়—সে সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী। সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধে এমন কি অত্যাধুনিক সাহিত্য আলোচনায়ও রবীন্দ্রনাথ এ

কথাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরবর্তী কালে বারে বারে নানাভাবে বলেছেন।

একই বৎসরে (১৯০৭) প্রকাশিত তিনজন লেখকের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ যে অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর গভীর ও ব্যাপক সাহিত্যধর্মেরই পরিচায়ক। বঙ্কিম সঞ্জীব ও বিহারীলালের সাহিত্যিক কৃতিত্ব নির্ধারণে তিনটি প্রবন্ধে তিনি যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন তা পরবর্তী কালে সমালোচকদের পথনির্দেশ করেছে। কৃষ্ণচরিত্র রাজসিংহ ফুলজানি আষাঢ়ে মন্দ্র প্রভৃতি পুস্তক সমালোচনায় তিনি সমালোচন-রীতির যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন তা বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বঙ্কিম-যুগকে অতিক্রম করে নতুন যুগের আগমন বার্তা ঘোষণা করল। ১৩০১ থেকে ১৩০৫ সনের মধ্যে 'ছেলে ভুলানো ছড়া' 'কবি সঙ্গীত' ও 'গ্রাম্য সঙ্গীত' নামক প্রবন্ধ-ত্রয়ীতে লোক-সাহিত্যের অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্যের প্রতি কবির প্রবল আকর্ষণ দেখে পাঠকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। যে রসগ্রাহী লেখক অনন্যসাধারণ বৈদগ্ধ্যের সাহায্যে সংস্কৃত ক্লাসিক কাব্য, প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যের মর্মমূলে অনায়াসে প্রবেশ করেন তিনিই আবার সহৃদয় রসগ্রাহিতার সাহায্যে মেয়েলি ছড়া, গ্রাম্য সাহিত্য ও কবি-সঙ্গীতের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেন। যিনি বিপুল কিরণে সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত করেন তিনিই আবার শিশিরটুকুকে ধরা দিয়ে তাকে ভালোবাসতে পারেন। একেই বলে প্রতিভার সার্বভৌমত্ব। সাহিত্য সমালোচনায় এ দিক্ পরিবর্তনের মধ্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার সে সার্বভৌম ঐশ্বর্য ধরা পড়েছে।

সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার দিক থেকে ১৯০৭ সন রবীন্দ্র-জীবনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বৎসরে শুধুমাত্র প্রাচীন সাহিত্য, লোক সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য প্রকাশিত হয় নি—প্রকাশিত হয়েছে 'সাহিত্য'—যে প্রবন্ধ সমষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ যুক্তিসম্মত

উপায়ে সাহিত্যের মূলনীতি নির্ধারণ করে সাহিত্য সম্পর্কীয় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তী লেখকগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় সাহিত্যের নীতি-নির্ধারক একটি সাহিত্যতত্ত্ব যে খাড়া করা না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সে সাহিত্যতত্ত্বে ছিল সমাজ-নীতির প্রাধান্য। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য সাহিত্যের মূলনীতি নির্ধারণে সমাজ মঙ্গলের সঙ্গে সৌন্দর্যসৃষ্টিকেও সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাহলেও সৌন্দর্যসৃষ্টিই সাহিত্য রচনার পরম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে কোন দ্বিধা ছিল না। 'সাহিত্য' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই তিনি রচনার চরম লক্ষ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিষয়ের চাইতে 'বিষয়ী'র গৌরবকে :তিনি কম মর্যাদা দেননি। দেশ বিদেশের কালজয়ী সাহিত্য আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে বিষয়ের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। সেজন্য সাহিত্যে সীমাবদ্ধ বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উপস্থাপনা পাঠক-মনে ক্লান্তি আনে। সে ক্লান্তি দূর করতে পারে একমাত্র লেখকের প্রকাশ-বৈচিত্র্য। রচনায় এ প্রকাশবৈচিত্র্য আনা সম্ভব চিত্র সঙ্গীত ধ্বনিময় অলংকার এবং সরস বাগ্‌ভঙ্গীর সাহায্যে। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে প্রথম গদ্য-লেখক যিনি আকর্ষণীয় গদ্য সৃষ্টির উপায় হিসেবে ভঙ্গী বা স্টাইলের উপর জোর দিলেন বেশী। অপর কথায় বলা যায় রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্টাইলিস্ট্‌ প্রবন্ধ লেখক। 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্যের তাৎপর্য' 'সাহিত্যের সামগ্রী' 'সাহিত্যের বিচারক' 'সৌন্দর্যবোধ' 'বিশ্বসাহিত্য' 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' 'সাহিত্য সৃষ্টি' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রবন্ধে সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কীয় বক্তব্যকে বিশদ করবার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ সমস্ত প্রবন্ধে লেখকের নিশ্ছিদ্র যুক্তি ও মতপ্রকাশের বলিষ্ঠতা লক্ষণীয়।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে পাশ্চাত্যের নবতর সাহিত্যাদর্শ ও

সাহিত্যপ্রকরণের অনুসরণে অত্যাধুনিক নামধারী বাঙালী লেখক যখন সাহিত্যে বাস্তবতা প্রতিষ্ঠায় অধীর উত্তেজনা প্রকাশ করছিলেন প্রবীণ প্রবন্ধলেখক রবীন্দ্রনাথকে তখন সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে মত প্রকাশের জন্য আবার কলম ধরতে হল। সে যুগের অভিনবত্ব প্রয়াসী লেখকদের আক্রমণের লক্ষ্য থেকে রবীন্দ্রনাথও বাদ ছিলেন না। তাঁদের আক্রমণের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৪ সন থেকে ১৩৩৯ সন পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কীয় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 'বাস্তব' 'কবির কৈফিয়ৎ' 'সাহিত্য' 'তথ্য ও সত্য' 'সৃষ্টি' 'সাহিত্য ধর্ম' 'সাহিত্যে নবত্ব' 'সাহিত্য বিচার' 'আধুনিক কাব্য' 'সাহিত্য তত্ত্ব' 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রভৃতি এ কালসীমায় রচিত সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সাহিত্যের পথে' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়।

এ গ্রন্থের কোন কোন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বাস্তববাদী অভিনবত্বপ্রয়াসী লেখকদের বাস্তবতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। ভারতীয় সাহিত্যের ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে যাঁরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুকরণে বে-আব্রুতা সৃষ্টির পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁরা সত্যকেও মানেন না নিত্যকেও অস্বীকার করেন। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রেসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অজুহাতই আর্টের পৌরুষ।

পাশ্চাত্ত্যের ধার করা বাস্তবতা নিয়ে যাঁরা ওরিজিন্যাল হতে চান তাঁদের প্রতি ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে :

> আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি, তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে

স্থানে অস্থানে ডিগ্‌বাজি খেলিয়ে পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ।

সমকালীন সাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ তীক্ষ্ণ মন্তব্য আধুনিক মহলে যে সমালোচনার ঝড় তুলেছিল তার বিবরণ দেওয়া হবে পরিশিষ্টে। এ সমস্ত তর্ক বিতর্কের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রূপে আধুনিক বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্য-ভাবনা স্পর্শে যে অমূল্য রত্ন লাভ করল তা তুলনাহীন। 'সাহিত্য' 'সাহিত্যধর্ম' 'সাহিত্য বিচার' 'সাহিত্য তত্ত্ব' 'সাহিত্যের তাৎপর্য' 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-আলোচনাকে নন্দন-তাত্ত্বিক আলোচনার পর্যায়ে উন্নীত করলেন। সাহিত্যের বিশ্বভূমিক পটভূমি নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপক দৃষ্টির পরিচয় দিলেন তাও ছিল ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় অভূতপূর্ব।

সাহিত্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত রসবাদী। বাস্তবকে অস্বীকার বা অতিক্রম করে নয়—বাস্তবকে অঙ্গীকার করে একটি অনির্বচনীয় রসাস্বাদনের জগতে উত্তীর্ণ হওয়া রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার মূল প্রেরণা। অনির্বাণ সৌন্দর্য ও রসানুভূতির প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের কোন কোন প্রবন্ধকে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত (১৮৯৪) এবং বিচিত্র প্রবন্ধের (১৯০৭) রচনাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চভূতের রচনাগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসরপুষ্ট কৌতুকপ্রিয় মনের রসসিক্ত প্রকাশে উজ্জ্বল। এ গ্রন্থের বুদ্ধিদীপ্ত রচনাগুলি অনেকটা পূর্বসূরী বঙ্কিমের কমলাকান্তের রচনাধারারই অনুবর্তন বলে মনে হয়। তাই বলে স্বাতন্ত্র্যবর্জিত নয়। বিভিন্ন চরিত্রের লঘু-গুরু মজলিশী আলোচনার মাধ্যমে সাহিত্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ এখানে সাহিত্য, সমাজ, সৌন্দর্য, মনুষ্য-প্রকৃতি এমন কি বৈজ্ঞানিক বিষয়কেও যে উপভোগ্য রূপ দিয়েছেন সমস্ত রবীন্দ্র-প্রবন্ধে তার তুলনা নেই। নাটকীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষের জ্ঞানের ও ভাবের বিষয়কে আস্বাদনীয়

রূপ দিতে হলে যে সুস্থ মানসিকতার প্রয়োজন বিংশ শতাব্দীর সমস্যাপীড়িত মানুষ সে সহজ ও স্বাভাবিক রসানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এ কারণে ইদানীংকালে বাংলা প্রবন্ধ রসবর্জিত হয়ে শুধুমাত্র জ্ঞানের প্রকাশে স্বতন্ত্র মূল্য অর্জন করেছে। পঞ্চভূতকে সেজন্যে আধুনিক প্রবন্ধের মাপকাঠিতে বিচার না করে বিগত শতাব্দীর অবকাশপুষ্ট রসবাদী সাহিত্যের শেষ স্মারকচিহ্ন বলে মনে করাই উচিত।

প্রবন্ধকে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করবার প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীতেও কম উদ্যমের পরিচয় দেননি। বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭) ও লিপিকা সে উদ্যমের মূল্যবান ফসল। রচনাকে আস্বাদ্য শিল্পকর্মে মণ্ডিত করবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র প্রবন্ধের বিচিত্রধর্মী রচনাগুলিতে পঞ্চভূতের নাটকীয় রীতি পরিত্যাগ করেছেন। সে যায়গায় আত্মপ্রকাশ করেছে সৌন্দর্যদ্রষ্টা শিল্পীর অনুভূতিশীল কবি-চিত্ত। বিচিত্র প্রবন্ধের স্বল্পায়ত ভূমিকায় প্রবন্ধগুলির জাতি নির্ণয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'এই গ্রন্থের পরিচয় আছে 'বাজে কথা' প্রবন্ধে। অর্থাৎ ইহার যদি কোন মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনার রসসম্ভোগে'। বিচিত্র প্রবন্ধের প্রবন্ধগুলি পড়তে গেলে বিষয়বস্তুগৌরবী রচনার যে সাক্ষাৎ না মেলে এমন নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে সে ধরনের রচনা গৌরবকে এখানে বড় করে দেখেন নি। এ গ্রন্থের যে রচনাগুলিতে রসসৃষ্টির প্রাচুর্য রয়েছে সে নতুন প্রকরণের রচনাগুলির দিকেই আসলে তিনি এখানে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। নব্যধর্মী রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্যকে বিশদ করে বলবার চেষ্টা করেছেন 'বাজে কথা'য়। এ রচনায় তিনি বলেছেন, মানুষের ব্যক্তিত্বে থাকে প্রকাশের সুস্পষ্ট দুটি দিক: প্রথমত, প্রয়োজনের জগতে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে কাজের কথা বলে। সে প্রকাশে মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধি হয় সত্যি কথা কিন্তু সে প্রকাশের ভিতর

সৌন্দর্য নেই আনন্দ নেই। মানুষের অতি সাধারণ কথাও সৌন্দর্যে বিলসিত হয়ে উঠে যখন সে কথা প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করে অন্তরের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশে মুখর হয়। এ ধরনের কথাকেই রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন 'বাজে কথা'। কবির মতে বাজে কথার সব চাইতে বড় দৃষ্টান্ত ভাবপ্রবণ ও সৌন্দর্যপ্রিয় কালিদাসের 'মেঘদূত'। মেঘদূতে কবি কালিদাস যে সমস্ত কথা বলেছেন :

> তাহা ধর্মের কথা নহে, কর্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন-অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায়, ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশ্বাসে তুলিয়া লন, তবে তখনি ফেলিয়া দিবেন। ইহা নিটোল মুক্তা, এবং ইহাতে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন কিছু লাগিয়াছে, কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না।

বিচিত্র প্রবন্ধের 'বাজে কথা' জাতীয় রচনায় কবি নিজের খেয়ালী কল্পনাকে প্রকাশের বিচিত্র ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছেন। সে কাব্যসুন্দর হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ আর যাই হোক প্রলাপ নয়। সর্বত্র একটি ভাব-সামঞ্জস্য রয়েছে—যে সামঞ্জস্যের সুন্দর অভিব্যক্তিতে এ শ্রেণীর রচনাগুলি নিটোল মুক্তার মত ঝল্‌মল্‌ করছে। বিচিত্র প্রবন্ধের 'পাগল' 'কেকাধ্বনি' 'আষাঢ়' 'নববর্ষা' 'পরনিন্দা' 'বসন্ত যাপন' 'রুদ্ধগৃহ' 'পথপ্রান্তে' প্রভৃতি এ পর্যায়ের রচনা।

উক্ত রচনাগুলির স্থানে স্থানে সৌন্দর্যস্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক ভাবোচ্ছ্বাস এত প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যে তাতে গদ্যরীতির স্বাভাবিক ঋজুতা অন্তর্হিত হয়েছে। সে যায়গায় জেগে উঠেছে নানা রূপে রঙে রসে বিলসিত নানা সৌন্দর্যের ছবি—চিত্র সম্পদে যা অপরূপ। আবার সঙ্গে সঙ্গে নানা সুর লয় তানের গীতোৎসবেও আনন্দমুখরিত হয়ে উঠেছে সে সৌন্দর্য জগৎ। 'আষাঢ়'

রচনাটির প্রথম ভাগে বর্ষাঋতুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার সমস্ত যুক্তি-নিষ্ঠাকে অতিক্রম করে উপসংহারে কবি উপস্থিত হয়েছেন সে রূপজগতে যে জগতে শুধু বন্ধনমুক্তির আনন্দ, সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ দীপ্তি আর সঙ্গীতের অপর্যাপ্ত সমারোহ ঃ

> …কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নবঘনশ্যাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এসো এসো জগতের যত অকর্মণ্য, এসো এসো ভাবের ভাবুক, রসের রসিক,—আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ঐ বাজিল, এসো সমস্ত খেপার দল, তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে—জাতীপুষ্প সুগন্ধি বনান্ত হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল—কোন্ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা।

কিংবা 'বসন্ত যাপন' নামক রচনার উপসংহারে কর্মজগৎ থেকে ভাবময় সৌন্দর্যজগতে উত্তরণপ্রয়াসী কবি যখন মন্তব্য করেন ঃ

> হায় রে সমাজদাঁড়ের পাখি! আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখ দুটির মত স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মতো নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মতো চঞ্চল, তবু তোর পাখা দুটো আজ বদ্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিতেছে—এই কি মানবজন্ম।

তখন পাঠকের ভ্রান্তি হয় এ কী বাস্তবিকই গদ্য? না এ সমস্ত অংশ গদ্যের আকারে সৌন্দর্যমুগ্ধ কবির অনবদ্য কবিতা!

শুধু উপরি উদ্ধৃত অংশগুলিতে নয় রবীন্দ্রনাথের রচনার বহু স্থানে লেখকের কবি-ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ ঘটেছে। ফলে তাঁর এ পর্যায়ের গদ্য হয়ে উঠেছে অলংকৃত কাব্যোচ্ছ্বাসে ভরপুর। গদ্য পদ্যের সীমারেখা সেখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিশুদ্ধ গদ্যরীতি বিচারে রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের গদ্যরীতি দুর্বল সন্দেহ নেই। কিন্তু এ দুর্বলতার মধ্যেও যে মাধুর্য শতধারায় উচ্ছ্রিত তা সংবেদনশীল পাঠক-

অন্তরকে রসাভিসিক্ত করে। গদ্যরীতি যে শুধুমাত্র যুক্তিতর্ক কণ্টকিত জ্ঞানের বিষয় প্রকাশের বাহন মাত্র নয়—সে রীতিকে যে রসসৃষ্টির কাজেও স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায় বিচিত্র প্রবন্ধের এ শ্রেণীর রচনাগুলি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। যে সমস্ত গোঁড়া সমালোচক ইউক্লিডের জ্যামিতির সূত্রগুলিকে নির্ভরযোগ্য গদ্যরীতির একমাত্র নিদর্শন বলে মনে করেন তাঁরা হয়ত রবীন্দ্রনাথের এ রসসমৃদ্ধ গদ্যকে গদ্য বলেই স্বীকার করতে চাইবেন না। কিন্তু ভাষা নিয়ে বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা ও রসসমৃদ্ধ সাহিত্য বিচার এক কথা নয়।

অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু *Rabindra Centenary Volume* (১৯৬১) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাঁর *Rabindranath Tagore and Bengali Prose* নামক প্রবন্ধে একটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেছেন রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গদ্য রচনা যেমন ভাবোচ্ছ্বসিত অলংকারবহুল এবং কাব্যধর্মী তেমনি তাঁর কোন কোন কবিতাও উপদেশাত্মক ও বর্ণনাধর্মী প্রবন্ধের মত। রবীন্দ্রনাথের এ শ্রেণীর গদ্য এবং কোন কোন কবিতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> Is his prose prolix? His verse is not less so. Ornate? Effusive? Imprecise? Each of these terms is applicable to his verse of some period or other. Just as his prose piece *Basantayapan* (Passing the Spring) is really a poem in the essayistic form, so are poems like *Ebar Phirao More* (Make me return) or *Basundhara* (The World) didactic or descriptive essays in verse.

একই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন কাব্যধর্মী গদ্য বা গদ্যধর্মী কবিতা রবীন্দ্র-রচনার দোষ হতে পারে। কিন্তু উক্ত পর্যায়ের কোন রচনাকেই আমরা রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে বাদ দিতে পারিনা। এর

কারণ রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে এ উভয় পর্যায়ের রচনায় :

> We could blame him for using verse and prose for the same and similar purposes. We could even say that in certain cases, where he writes prose in the poetic manner and uses prose matter in hundreds of lines of verse, he has done justice to neither, but can we for these reasons, ever leave him aside ? ......A Tagore freed from his faults would not be Tagore at all ; therefore even while quarelling with much of his doings, we accept him just as he is, and accept him whole.

ফরাসি কবি মালার্মে (Mallarmé) যখন ছন্দোস্পন্দযুক্ত ভাষা মাত্রকেই কবিতা বলে অভিহিত করেন তখন সে মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রবল ঝড় উঠেছিল। অধ্যাপক বসু মনে করেন সমস্ত সাহিত্যের ইতিহাসে এ মতবাদকে যদি কেউ কার্যকরী রূপ দিয়ে থাকেন তিনি মালার্মে বা তদ্‌শিষ্য ভালেরি (Vale ry) নন—তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। ছন্দোস্পন্দ সৃষ্টির সাহায্যে অধিকাংশ গদ্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে গীতোৎসবের আয়োজন করেছেন সে দিক থেকে বিচার করলে অধ্যাপক বসুর উক্ত মন্তব্য অসার্থক বলে মনে হয় না। প্রবন্ধ রচনায় এ গীতোচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য শুধুমাত্র বিচিত্র প্রবন্ধের উক্ত রচনাগুলিতে নয়—প্রাচীন সাহিত্যে, সাহিত্যে, ছন্দে, স্বদেশ ও শিক্ষা সম্পর্কীয় রচনায়, শান্তিনিকেতন-এর অধ্যাত্মবিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে, 'পথে ও পথের প্রান্তে' এবং সর্বোপরি 'লিপিকা'র রচনাগুলিতে অতি-প্রত্যক্ষ। লিপিকার রচনাগুলি গদ্যের ফর্মে লিখিত হলেও সেগুলি যে আসলে কবিতা বহুকালের দ্বিধা কাটিয়ে উঠবার পর রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন। অনির্বাণ সৌন্দর্যতৃষ্ণা কবিত্ব এবং সঙ্গীতপ্রীতি যখন রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক

ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত-মিশ্রিত তখন তাঁর গদ্য প্রবন্ধেও যে কাব্যিকতা প্রশ্রয় পাবে এতে আশ্চর্য কী?

তাই বলে বিচিত্র প্রবন্ধের কোন কোন রচনায় কবি-ভাবের সঙ্গে ভাবনা যুক্ত হয়ে সেগুলিকে যে বিষয়গৌরবী করে তোলেনি একথা বলা চলে না। 'নানা কথা', 'রুদ্ধ গৃহ', 'পথপ্রান্তে', 'লাইব্রেরী', 'মা ভৈঃ', 'পরনিন্দা', 'মন্দির' প্রভৃতি রচনার আবেদন শুধুমাত্র রসসম্ভোগে—একথা বলা যায় কী? মানব জীবন বিশ্ব-প্রকৃতি দেশ কাল প্রভৃতি সম্পর্কে মনীষী লেখকের সুগভীর চিন্তাধারা এ সমস্ত প্রবন্ধে যেভাবে প্রবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে এগুলি বিষয়গৌরবী রচনা বলে মনে করতে কোন বাধা দেখা যায় না। আসলে কোন কোন সমালোচক যেমন রচনাকে 'বিষয় গৌরবী' ও 'আত্মগৌরবী' বলে সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন কোঠায় ভাগ করে থাকেন—রবীন্দ্র-প্রবন্ধকে সে ধরনের কোন একান্ত শ্রেণী-বিভাগে বিন্যস্ত করা যায় না। রবীন্দ্র-প্রবন্ধে যেখানে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য সেখানে প্রকাশের সৌন্দর্য কোথাও ম্লান হয়নি। আবার যেখানে 'বাজে কথা'র আসর সাজিয়ে রবীন্দ্রনাথ মনের কথাকে রস-রচনার পর্যায়ে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট সেখানেও 'মননশীল কবি'র জগৎ ও জীবন-ভাবনা অতর্কিতে আত্মপ্রকাশ করে সে রচনাকে মূল্যসমৃদ্ধ করে তোলে।

রবীন্দ্র-মনের বিকাশে সব চাইতে বেশী সহায়তা করেছে কবির সহজাত সৌন্দর্যদৃষ্টি, অনন্যসাধারণ কল্পনাশক্তি এবং দুর্লভ সৃজনী প্রতিভা। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য কবির সাহিত্য সম্পর্কীয় আলোচনা সমালোচনায় এবং সৃজনধর্মী রচনায় যে আত্মপ্রকাশ করবে তাতে বিস্ময়ের বিষয় কী আছে? উনবিংশ শতকের শেষার্ধে যে কলাকৈবল্যবাদী আন্দোলন শিল্পী-সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, সে শিল্পাদর্শ তরুণ শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মনের উপরও কম প্রভাব

বিস্তার করেনি। এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস ছিল কবি ও শিল্পীদের অবস্থান সংঘাতপূর্ণ ধূলিমলিন বাস্তব সংসারের উর্ধ্বে। স্বপ্নচারী কল্পনার সাহায্যে রূপ ও রসজগতের সৃষ্টিই তাঁদের পরম অন্বিষ্ট। প্রথম যৌবনের কাব্যে-নাটকে এমনকি প্রবন্ধ সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের স্বপ্নচারিতার পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের বয়ঃসন্ধিকালের সাহিত্যসৃষ্টি সৌন্দর্যে অনুপম এবং উপভোগ্যতায় রসসংবেদ্য হলেও জীবনের সুকঠোর বাস্তবতার দিক থেকে অনেকটা দূরবর্তী নক্ষত্রদীপ্তির মত।

সৌভাগ্যক্রমে পিতার আদেশে জমিদারী কর্ম দেখতে গিয়ে স্বপ্নচারী রবীন্দ্রমনের মোহমুক্তি ঘটল। পল্লীবাসী অসহায় অশিক্ষিত জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশা কবির শিল্পচেতনাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করল বাস্তব জীবনসমস্যার দিকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগও রবীন্দ্র-চিত্তকে বাস্তবমুখী করতে কম সহায়তা করেনি। কল্পনাকুশলী শিল্পী রবীন্দ্রনাথের এ বাস্তব-সমস্যাচেতনা তাঁর ছোট গল্প ও উপন্যাসে যে তাৎপর্যময় শিল্পরূপ লাভ করেছে তার আলোচনা করা হয়েছে পূর্ববর্তী দুটি অধ্যায়ে। সমকালীন হতভাগ্য পরাধীন স্বদেশের অজস্র সমস্যা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যেও এনে দিল অনিবার্য পরিবর্তন। এ পরিবর্তন শুধু বিষয়বস্তু উপস্থাপনার দিকে স্পষ্ট হয়ে উঠেনি, প্রকাশভঙ্গীর সবলতা ও স্বচ্ছতার দিক থেকেও এ পরিবর্তন লক্ষনীয়। রবীন্দ্রনাথের এ পর্যায়ের প্রবন্ধের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক এবং শিক্ষানীতি সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এ শ্রেণীর প্রবন্ধে রসস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নচারী কল্পনা যেন অতর্কিতে অন্তর্ধান করেছে। সে যায়গায় আত্মপ্রকাশ করেছে স্বদেশের আন্তরিক কল্যাণকামী নেতার নিখাদ যুক্তি এবং সৃজনধর্মী কর্ম-পরিকল্পনা। সমকালীন আত্মপ্রত্যয়হীন দুর্বলচেতা দেশবাসীর সামনে অতীত

ভারতবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্য উদ্‌ঘাটনে কোথাও কোথাও অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস ও কল্পনাপ্রিয়তার সহায়তা যে তিনি একেবারে গ্রহণ করেন নি তা নয় (যেমন 'স্বদেশ' গ্রন্থে)। কিন্তু স্বদেশের প্রতি যে অপরিসীম মমত্ববোধ তাঁকে কাল্পনিকতার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল সেদিক থেকে বিচার করলে এ ত্রুটি ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ ও মননশীল ব্যক্তিত্বের অভ্রান্ত স্বাক্ষর সমাজ রাষ্ট্র ও শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলি। যে স্বপ্নদর্শী কবি অসামান্য সৌন্দর্যদৃষ্টির সাহায্যে গদ্যপ্রবন্ধেও অপরূপ রসজগৎ সৃষ্টি করতে পারেন তিনিই আবার জীবনে বিষণ্ণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে দেশের জটিল সমস্যাকে যুক্তিনিষ্ঠার সাহায্যে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ এবং মৌলিক সমাধানেরও ইঙ্গিত দিতে পারেন। এতে শুধু বিচিত্রকর্মী সাহিত্য-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ভাবানুযায়ী প্রকাশনৈপুণ্যই সুষ্ঠুভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি— এ প্রচেষ্টায় একজন চিন্তাশীল মনীষীর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব বিকাশও স্পষ্ট রূপলাভ করেছে। কবি তার সৃজনধর্মী প্রতিভার সাহায্যে যে কালজয়ী কাব্য নাটক ছোটগল্প ও উপন্যাস সৃষ্টি করে গেছেন— সে সৃষ্টি যদি তিনি নাও করতেন তথাপি শুধু উক্ত পর্যায়ের মননশীল প্রবন্ধাবলীর জন্যই তিনি বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলি আলোচনার পূর্বে লেখকের মানস-পটভূমির সঙ্গে পরিচিতির প্রয়োজন। মহর্ষি পরিবারের যে আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ আবাল্য বর্ধিত সে আবহাওয়ায় স্বদেশপ্রীতির একটি উষ্ণ প্রবাহ নিত্য প্রবাহিত হত। স্বদেশীয় সংস্কৃতি আচার আচরণ ধর্মাচরণ থেকে শুরু করে এমন কি চিঠিপত্র লেখা এবং কথাবার্তায়ও দেশীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারার উপর মহর্ষি জোর দিতেন। তাই বলে পাশ্চাত্ত্য দেশাগত নতুন শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিও মহর্ষির কোন স্পর্শকাতরতা ছিল না

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'জীবন শিল্পী' গ্রন্থে বলেছেন :

> ঠাকুর পরিবারে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আধুনিক পৃথিবীর সমন্বয় ঘটেছিল। যৌবনারম্ভে মহর্ষি উপনিষদের পৃষ্ঠা কুড়িয়ে পান ও মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তাঁকে Geology গ্রন্থ পড়তে দেখা গেছল।... ধর্মে ও কর্মে, ত্যাগে ও ভোগে, কলায় ও বিদ্যায়, স্বাজাত্যে ও বিশ্বমানবিকতায় ঠাকুর পরিবারে শিক্ষা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল।

স্বদেশীয় গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক জীবনের সচল সবল পরীক্ষিত জীবনসত্যের সমন্বয় প্রয়াস ছিল ঠাকুর বাড়ীর সংস্কৃতি সাধনার মুখ্য অন্বিষ্ট। এ আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়ে রবীন্দ্রনাথও যে একটি সমন্বিত জীবনাদর্শের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে উঠবেন তাতে আশ্চর্য কী? পারিবারিক প্রভাবে গঠিত রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টির পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরও *Towards Universal Man* (১৯৬১) গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন :

> The peculiar status of the family helps to explain the combination of tradition and experiment that charactérised Tagore's attitude to life.

রবীন্দ্রনাথের সমাজ এবং রাষ্ট্রচেতনাও সে tradition এবং experiment-এর উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনসত্য। সে সত্যবোধ রবীন্দ্রজীবনে একদিনে লভ্য হয় নি। দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে এবং তারপরে দূর থেকে সে আন্দোলনের পট পরিবর্তনকে তীক্ষ্ণ মননশীলতার সাহায্যে নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে তবেই তিনি সে সত্যবোধের জগতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধে যে হৃদয়াবেগের বাহুল্য 'সাধনা'র সম্পাদক রূপে লিখিত অনুরূপ প্রবন্ধে সে ভাবাবেগ নেই। সে যায়গায় আত্মপ্রকাশ করেছে স্বদেশের প্রতি প্রীতিশীল মনীষীর যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ। ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি ইংরেজ কর্তৃক দেশবাসীর লাঞ্ছনা ও অপমানকেই বড়

করে দেখেছিলেন এবং দেশবাসীর সৃষ্টিমূলক পরিকল্পনাবিহীন রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু সাধনার ও বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ কি এবং কি উপায় অবলম্বন করলে স্বদেশবাসী প্রকৃত স্বরাজ অর্জনে সমর্থ হবে তার মননশীল সমাধানের পথনির্দেশ করেছেন। 'কালান্তর' গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন : 'সাধনা পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি।'

১৯০৫ সনে 'আত্মশক্তি' প্রকাশের কাল থেকে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের এবং বিশ্বের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বহু আলোচনা-সমালোচনা করেছেন। বিভন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তিনি বহু আপাত-বিচ্ছিন্ন উক্তি ও অভিমত প্রকাশ করলেও তাদের মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র বর্তমান। ১৩৩৬ সনে (১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে) শচীন্দ্রনাথ সেনের *Political Philosophy of Rabindranath* গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোন বাঁধা মত একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোন-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন অংশ গৌন, কোন্‌টা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।
>
> রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত ॥ কালান্তর ॥ পৃঃ ৩৪২

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় চিন্তায় সে সমগ্রতার পরিচয় কী—এ প্রসঙ্গে সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রচনা ও ভাষণে রাষ্ট্রতত্ত্ব বিষয়ক যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা কোন পুঁথিপড়া বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যে উদার ধর্মবোধের প্রেরণায় কবি আজীবন মানুষকে দেখতে অভ্যস্ত সে মানবধর্মই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তিভূমি। রাজকীয় ক্ষমতাদম্ভে স্ফীত হয়ে বিদেশী ইংরেজ আইন এবং শৃঙ্খলার নামে অসহায় ভারতবাসীর উপর অত্যাচারের স্টীম-রোলার চালিয়েছে, শাসনের নামে শোষণ করে চরম বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে—স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাই স্বদেশবাসীর স্বাধীনতাস্পৃহাকে বরাবরই পরম সমাদরে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু যখনই তিনি দেখেছেন, শিক্ষিত ভারতবাসী আধুনিক পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রনীতি-নির্দ্দিষ্ট বাঁধা রাস্তায় অগ্রসর হয়ে মানববৈষম্য দূর করবার কাজে অগ্রসর হয়েছেন অথচ স্বদেশবাসীর জীবনের নানা বৈষম্য ও দুর্বলতা দূর করবার প্রয়াসে একেবারে নিষ্ক্রিয়— তখনি তাঁর সমালোচনার খড়্গ উদ্যত হয়েছে নিজের দেশবাসীর প্রতি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধে তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন ইংরেজের স্বার্থোদ্ধত অবিচার, স্বাতন্ত্র্যগর্ব ও দুর্বল ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার বজ্রদৃঢ় ইংরেজ রাজশক্তিকে একদিন ধ্বংসের সীমায় পৌঁছিয়ে দেবে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের ভেদনীতির বিরুদ্ধে 'সুবিচারের অধিকার' রচনা করে রবীন্দ্রনাথ তীব্র সমালোচনার বাণী উচ্চারণ করতেও দ্বিধা করেন নি।

কিন্তু স্বদেশবাসীর সংগঠনমূলক কাজের প্রতি বীতস্পৃহা এবং শুধুমাত্র পরানুকরণ ও পরনির্ভরতার সাহায্যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে ধিক্‌কৃত করে কিছুকাল পরেই রচনা করলেন তিনি 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' 'স্বদেশী সমাজ' 'সফলতার সদুপায়' 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' 'ব্রতধারণ' প্রভৃতি প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধগুলি 'আত্মশক্তি' নামক

গ্রন্থে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে স্বদেশের অতীত গৌরবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করলেন তিনি। এ প্রবন্ধগুলি হয়ত ঠিক রাষ্ট্রতত্ত্ববিষয়ক নয় কিন্তু যে রাষ্ট্রচিন্তা মানুষকে স্বদেশচেতনায় উদ্দীপ্ত করে—তার যথেষ্ট উপাদান আছে এ প্রবন্ধগুলিতে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রাজা ও প্রজা'র প্রবন্ধগুলিতে [ইংরাজ ও ভারতবাসী (১৩০০), রাজনীতির দ্বিধা (১৩০০), অপমানের প্রতিকার (১৩০১), সুবিচারের অধিকার (১৩০১), কণ্ঠরোধ (১৩০৫), অত্যুক্তি, ইম্পীরিয়ালিজম্ (১৩০২), রাজভক্তি (১৩১২), বহুরাজকতা (১৩১২), পথ ও পাথেয়, সমস্যা] একটি বন্ধনপীড়িত জাতির অন্তঃস্পর্শী মর্মবেদনা নিশ্ছিদ্র যুক্তি ও প্রবল আবেগের সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের 'সমূহ' গ্রন্থের ছয়টি প্রবন্ধও [স্বদেশী সমাজ (১৩১১), দেশনায়ক, সফলতার সদুপায় (১৩১১), সভাপতির অভিভাষণ (১৩১৪), সদুপায় (১৩১৫)] হয়ত ঠিক আধুনিক অর্থে রাষ্ট্রচিন্তা বিষয়ক নয়, কিন্তু এ সমস্ত প্রবন্ধে তিনি স্বদেশবাসীকে যে গঠনমূলক কর্মপন্থা অবলম্বন করবার নির্দেশ দিলেন তা নিঃসন্দেহে স্বরাজ লাভের অন্যতম উপায়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'স্বদেশ' গ্রন্থে দেশের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও বর্তমান অধঃপতিত অবস্থা বর্ণনায় কাব্যিক আবেগ ও উচ্ছ্বাস এবং একই বৎসরে প্রকাশিত 'সমাজ' (১৯০৮) গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে স্বদেশীয় জীবনের দুর্বলতা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য তীক্ষ্ণ মননশীলতার সাহায্যে ব্যক্ত হয়েছে।

উক্ত রাষ্ট্রচিন্তাবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪ সনে (১৯০৭) পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি হিসেবে যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। রবীন্দ্রনাথ যখন এ অভিভাষণ দেন দেশে তখন দুটি বৃহৎ সমস্যা জাতীয় জীবনের

অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সমস্ত জাতির ভবিষ্যৎকে বিমর্ষ ভবিষ্যতের দিকে আকর্ষণ করছিল। তার মধ্যে একটি সমস্যা ইংরেজের সচেতন ভেদনীতিপ্রসূত, আর একটি কংগ্রেসের ভিতর দলাদলি থেকে উদ্ভূত। রবীন্দ্রনাথ এ উভয় সমস্যার একমাত্র সুষ্ঠু সমাধান হিসেবে সংঘশক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন। দ্বিতীয়ত, জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি প্রবল দৃঢ়তার সঙ্গে জোর দেন গণসংযোগের উপর। সে যুগের কংগ্রেস যখন স্বরাজ লাভের জন্য সরকারের নিকট আবেদন নিবেদনের উপর ছিল একান্তভাবে নির্ভরশীল তখন রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দৃষ্টি যে কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল—এ যুগের পরিপ্রেক্ষণীতেও আমরা তার মর্ম ভাল করে উপলব্ধি করতে পারি। পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি রূপে রবীন্দ্রনাথ জাতিগঠনের অন্যতম উপায় হিসেবে সংঘশক্তির উপর যখন জোর দিলেন তখন তাঁর বয়স ৫৩ বৎসর। কিন্তু তারও বাইশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র তেইশ-চব্বিশ বৎসর, তখনও পত্রাকার একটি প্রবন্ধে জাতীয় সংহতির প্রধান উপায় হিসেবে সংঘশক্তির উপরেই গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন তিনি (দ্রষ্টব্য, চিঠিপত্র, ১২৯৪)।

রবীন্দ্রনাথের এ সমস্ত রাষ্ট্রচিন্তা সে যুগের পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণশীল রাষ্ট্রান্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচায়ক সন্দেহ নেই। সে যুগের রাষ্ট্রান্দোলনের মধ্যে যে অনেক ফাঁক ও দুর্বলতা ছিল তা তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি। দেশকে পরাধীনতার গ্লানি মুক্ত করবার প্রয়াসে রাজনীতিতে বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ এমনকি স্বদেশীয় সমস্যা আলোচনায় বিদেশী ভাষার নির্বিচার ব্যবহার তাঁর কাছে ভয়ানক সামঞ্জস্যহীন ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। সেজন্য তিনি রাজনৈতিক সম্মেলনের বক্তৃতা ও আলোচনাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে চালু করবার প্রয়াস পান। রাজসাহী সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথের এ মহৎ প্রয়াস উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের মত রাষ্ট্রনেতারও কঠোর সমালোচনা ও বিদ্রূপের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল।

তারপর ঢাকা কনফারেন্সেও যখন তিনি অনুরূপ চেষ্টা করেন তখন সে যুগের কোন কোন রাষ্ট্রনেতা রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী ভাষায় অধিকারের প্রতি কটাক্ষ করতেও দ্বিধা করেননি। (দ্রষ্টব্য : কালান্তর ॥ ৩৪৫ পৃষ্ঠা)।

সে যুগের রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের এ আড়ম্বরপূর্ণ অথচ অন্তঃসারহীন স্বদেশীয়ানা রবীন্দ্রচিত্তকে যে বিক্ষুব্ধ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এ কারণেই তিনি সে যুগের প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রান্দোলনকে পরিত্যাগ করে স্বাধীনভাবে সংগঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বিচক্ষণতা, দূরদৃষ্টি এবং সর্বোপরি লোকোত্তর সৃজনী প্রতিভার সাহায্যে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন— দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা নির্ভরশীল অকৃত্রিম দেশপ্রেম, আত্মপ্রত্যয়যুক্ত সংগঠনশক্তি এবং স্বার্থবুদ্ধিহীন আত্মত্যাগের উপর। শচীন্দ্রনাথ সেনের *Political Philosophy of Rabindranath* গ্রন্থের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এ মনোভাবকে সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করেন :

> আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয়নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে, এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলিনি; একে অধিকার করতে পারিনি। ···কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশ পরাধীন ব'লেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এমন কথা শোনার যোগ্য নয়। সত্যকার প্রেম অনুকূল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেবার মধ্য দিয়ে স্বতই আত্মত্যাগ করতে উদ্যত হয়। বাধা পেলে তার উদ্যম বাড়ে বই কমে না। আমরা কন্‌গ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি; কিন্তু যে সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধ সংস্কারে

ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা দূর করবার কোন উদ্যোগ করিনি।

কালান্তর ॥ পৃষ্ঠা, ৩৪৭-৪৮

রবীন্দ্রনাথের এ গভীর দেশাত্মবোধ এবং সৃজনধর্মী মনোভাব থেকেই জন্মলাভ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা। ভাব ও কর্মনির্ভর এ সমাজবাদী পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে মহাত্মা গান্ধীর সর্বোদয় পরিকল্পনার পূর্বাভাষ বহন করে। রবীন্দ্রনাথের এ সৃজন-ধর্মী কর্মঃপরিকল্পনার মর্ম অনুধাবন করবার মত স্বদেশপ্রেমিক কর্মী তখন দেশে বেশী ছিল না। মাত্র অঙ্গুলিগন্য কয়েকজন অনুগত সহকর্মী এবং একজন মানবপ্রেমিক বিদেশী মহানুভব ব্যক্তির সহায়তায় তিনি তাঁর এ সমাজবাদী পরিকল্পনাকে পল্লী সমবায়ের ভিত্তিতে কিভাবে কার্যকরী রূপ দেন রবীন্দ্র-জীবনী পাঠকের তা অজানা নয়। কবির সামাজিক-অর্থনৈতিক (Socio-economic) প্রবন্ধগুলিও এ প্রেরণা থেকেই রচিত। সেগুলিকে কেতাবী অর্থে ঠিক রাজনৈতিক প্রবন্ধ বলা না গেলেও স্বয়ং-সম্পূর্ণ জাতীয় জাগরণের পক্ষে সেগুলির মূল্য যে কত বেশী—স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে অর্থনৈতিক জীবনে নিপীড়িত ভারতবাসী আজ তা মর্মে মর্মে অনুভব করছে।

স্বরাজ লাভের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কর্ম পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব অর্পণ করলেও আনন্দহীন যান্ত্রিক কর্মপদ্ধতিকে রবীন্দ্রনাথ কখনও শ্রেষ্ঠত্ব দেননি। এ প্রসঙ্গেই মহাত্মা গান্ধীর চরকা আন্দোলনের সঙ্গে আনন্দবাদী সৃজনধর্মী কর্মী রবীন্দ্রনাথের মতবিরোধ ঘটে। মহাত্মা গান্ধীর চরকা আন্দোলন সম্পর্কে কবি মন্তব্য করেছেন, যে আন্দোলন শুধু মানুষের যান্ত্রিক কর্মপ্রবৃত্তিকে উৎসাহ দেয়, মানুষের চিত্তবৃত্তির জাগরণ ঘটায়না—সে আন্দোলন জাতিকে কখনও

ইঙ্গিত লক্ষ্যের দিকে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না :

> আজ আমাদের দেশে চরকালাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সম্পূর্ণ জড় শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা—এতে চিত্তশক্তির কোন আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোন বাহ্য প্রক্রিয়ার অন্ধ পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন।······
>
> কালান্তর ॥ পৃষ্ঠা, ৩৫০

বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতিই হোক আর স্বরাজ-সাধনাই হোক—সমস্ত কিছুই সমন্বিত এবং পূর্ণ জীবনাদর্শের সাধনা। সে বৃহত্তর জীবনাদর্শ একমাত্র লভ্য জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আনন্দে—এক কথায় কর্মশক্তির সঙ্গে চিত্তশক্তির পরিপূর্ণ উদ্বোধনে। সেজন্যে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় একমাত্র স্বরাজ্য লাভকেই রবীন্দ্রনাথ কখনও প্রাধান্য দিতে পারেন নি। বৃহত্তর মানবসত্যলাভই কবির পরম বাঞ্ছিত। ১৯২৯ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালান্তরে সংযোজিত বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং *Nationalism, Race-Conflict* প্রভৃতি ইংরেজী প্রবন্ধেও তিনি বিশ্ববাসীর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাকে সেদিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন। যে সংকীর্ণ রাষ্ট্রনীতি দুর্বলকে পীড়ন করবার কাজে ব্যবহৃত, যে রাষ্ট্রনীতি মানুষের উদার জ্ঞান ও প্রেম-সমন্বিত মনুষ্যত্ববোধকে বিশুষ্ক করে তোলে, পরিণত ভাবনার সাহায্যে তিনি আধুনিক পৃথিবীর সে বর্বর রাষ্ট্রনীতিকে ধিকৃত করেছেন বারে বারে। মৃত্যুর দিকে এক পা বাড়িয়েও তিনি এ মনুষ্যত্বনাশী রাজনীতির প্রলয়ংকর রূপের ভিতর আধুনিক পৃথিবীর চরম সংকট উপলব্ধি করেছেন—যে উপলব্ধির মহত্তম প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মননশীল রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট'-এ (১৯৪১)। এ আদর্শায়িত মানবতার সাধনাই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রাষ্ট্রনীতি আলোচনার যোগসূত্র।

মুখ্যত সৌন্দর্যস্রষ্টা কবি ও শিল্পী হয়েও রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রচলিত শিক্ষাবিধির ত্রুটি উদ্‌ঘাটনে এবং সংস্কার পরিকল্পনায় যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন—তা তাঁর বহুমুখী প্রতিভারই পরিচয় বহন করে। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যপ্রীতি দেশাত্মবোধ মানবতাবোধ এবং ব্যক্তিত্ববোধের সুমহান প্রকাশ ঘটেছে। এ শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্র-প্রবন্ধ সাহিত্যে বিশেষ মূল্য অর্জন করেছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিধির যান্ত্রিক রূপ তাঁর মুক্তি-প্রয়াসী কবি-মনকে আবাল্য পীড়িত এবং সে শিক্ষাযন্ত্রের প্রতি বিদ্রোহী করে তুলেছিল। এ বিদ্রোহী চেতনার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিতে কখনও প্রলুব্ধ হননি। বরং আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে কি করে জীবনে কার্যকরী রূপ দেওয়া যায় সেদিকেই কবির সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত হয়েছিল। শিক্ষা-সম্পর্কীয় সংস্কার-ভাবনার কালও রবীন্দ্র-জীবনে বহুকাল ব্যাপ্ত। আমাদের প্রচলিত শিক্ষার বহুমুখী ত্রুটি প্রদর্শন করে ১২৯৯ সনে (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে) রচনা করেন তিনি 'শিক্ষার হেরফের'। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র একুশ বৎসর। আর শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কীয় শেষ প্রবন্ধ 'শিক্ষার বিকিরণ' রচনা করেন তিনি ১৩৪০ সনে (১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে)। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বাহাত্তর বৎসর। তাহলে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক চিন্তার পরিধি-কাল অন্যূন ৫১ বৎসর। এ দীর্ঘ কাল-পরিধির মধ্যে শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৌলিক শিক্ষা চিন্তাকে যে বিভিন্ন প্রবন্ধে রূপ দেন সেগুলি সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের গদ্য গ্রন্থাবলীর চতুর্দশ ভাগে 'শিক্ষা' নামে (১৯০৮)। শিক্ষার হেরফের (১২৯৯), ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (১৩১২), শিক্ষা সংস্কার (১৩১৩), শিক্ষা সমস্যা (১৩১৩) জাতীয় বিদ্যালয় (১৩১৩), আচরণ (১৩১৩) এবং সাহিত্য সম্মিলন (১৩১৩) প্রথম সংস্করণের অঙ্গীভূত হয়। 'শিক্ষা'র দ্বিতীয় ও তৃতীয়

সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২১ এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। এ দুটি সংস্করণে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি সংযোজিত হয়: তপোবন (১৩১৬), শিক্ষার বাহন (১৩২২), মনোবিকাশের ছন্দ (১৩২৮), শিক্ষার মিলন (১৩২৮), পত্র, লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য (১৩৩৫), ধ্যানী জাপান (১৩৩৬), বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ (১৩৩৯) এবং শিক্ষার বিকিরণ (১৩৪০)।

কল্পনাকুশলী কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ এ সমস্ত শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধে যে গভীর বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা যে কোন পাঠককে বিস্মিত করে। শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সে বাস্তববোধের পরিচয় কী?

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই সমন্বিত জীবনাদর্শের সাধক। যে শিক্ষা মানুষকে সে সমন্বিত জীবনাদর্শের অভিমুখী করে তোলে না সে শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ কোন মর্যাদা দিতে পারেন নি। উদার শিক্ষার অবারিত আলোকে শিক্ষার্থীর মনের অন্ধকার দূর হবে, আলোকিত স্বচ্ছ মনের অধিকারী হয়ে দেশব্যাপী অজ্ঞানের অন্ধ তমিস্রা দূর করতে সে এগিয়ে আসবে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে, কর্মের যোগে, প্রেমের ও আনন্দের যোগে সে মিলিত হবে—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিনব শিক্ষা পরিকল্পনার পরম অন্বিষ্ট। প্রকৃতিপ্রেমিক কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতেন বিচিত্র প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাহচর্যেই শিশুমনের প্রসার হতে পারে। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, বর্তমান পৃথিবীর আরও কোন কোন মহান চিন্তাবিদ্‌ও শিশু-শিক্ষা পরিকল্পনায় এ প্রকৃতি-সাহচর্যের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, যে বিদেশী ভাষার বাহন এ দেশে শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছে সে বাধাকে অপসারিত করে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সহজ ও সুগম করে তোলাই ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পরিকল্পনার অন্যতম সাধনোপায়। কোন শিক্ষাবিদই বোধ

হয় রবীন্দ্রনাথের এ যুক্তি অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু ইংরেজ রাজার রাজত্বে বাস করে ইংরেজী ভাষায় অধিকার পাকা না হলে ব্যবহারিক জীবনে উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলে রবীন্দ্রনাথের এ আদর্শ শিক্ষা-পরিকল্পনাও সে যুগের সকল শ্রেণীর লোকের সমর্থন পায়নি। তৃতীয়ত, শিক্ষাজীবনের প্রথম পর্যায়ে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের কথা রবীন্দ্রনাথই মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার বহু পূর্বে উত্থাপন করেন এবং তাঁর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে তার সক্রিয় রূপ দেন। যে শিক্ষা জীবনের বাস্তব ক্ষেত্র থেকে শিক্ষার্থীর মনকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র গোলামির মনোভাবকেই জাগিয়ে তোলে প্রচলিত সে শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ কখনও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন নি। জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করে তুলবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাই এত যত্নবান হয়েছিলেন। সে যুগের পক্ষে কতকটা অভিনব রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষা পরিকল্পনা ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় আজ স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে ভারতবাসী তা মর্মে মর্মে অনুভব করছে।

উক্ত পরিকল্পনাকে কার্যকরী রূপ দেবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি উপায়ের নির্দেশ করেছেন তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাদান কার্য অনেকটা ব্যবসায়িক বৃত্তিতে পরিণত হয়েছে বলে শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের মনের নিবিড় সংযোগ সাধারণত হয় না। অথচ শিক্ষার গোড়ার কথাই হল শিক্ষক নিজের মনের আলো দিয়ে শিক্ষার্থীর মনকে আলোকিত করে তুলবেন। যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জীবন ভিন্ন কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে সেখানে এ আলোকাভিসার কী করে সম্ভব? সেজন্যে শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন শিক্ষাকে সম্পূর্ণ রূপ দেবার জন্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর একত্রে আবাসিক বিদ্যালয়ে বাস করা প্রয়োজন। শিক্ষা পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের এ ধারণা যে প্রাচীন

ভারতের ঐতিহ্যজাত—'তপোবন', '*A Poet s School*' প্রভৃতি প্রবন্ধে তার যথেষ্ট পরিচয় আছে। শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ সব চাইতে বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেন শিক্ষকের শিক্ষার উপর। যে গুরু শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানের আলো জ্বালাবেন তাঁর মনে যদি অনির্বাণ জ্ঞানতৃষ্ণা জাগ্রত না থাকে তা হলে সে আলো জ্বালানো হবে কী করে? সেজন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকতা কার্যকে একটি বৃত্তিমাত্র মনে না করে সাধনা হিসেবে দেখবার পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষার উপায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ মত যে কত মূল্যবান স্বাধীন ভারতে শিক্ষকতার জগতে বৈশ্যবৃত্তির মধ্যে বাস করে আজ তা আমরা ভালো করেই উপলব্ধি করছি। এত পরিকল্পনা এত আড়ম্বর এত উপকরণবাহুল্য সত্ত্বেও শিক্ষা আজো যে সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে প্রবেশ লাভের সুযোগ পাচ্ছে না তার অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষকের আদর্শহীনতা ও সাধনার অপ্রাচুর্য। শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ যেন ধ্যানীর দৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যৎ ভারতের এ ব্যর্থতার ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। এবং সে জন্যেই বোধ হয় তিনি শিক্ষকের আদর্শচর্চার উপর এত জোর দিয়েছিলেন।

সর্বোপরি শিক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিকাশ সাধনের জন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ব্যবস্থায় আনন্দের আয়োজনের পক্ষপাতী। অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত-চর্চা, খেলাধূলা, গল্প লেখা, নৃত্যশিক্ষা, ব্যায়ামচর্চা—কোন কিছুকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বাদ দিতে চান নি। অভিনয় সঙ্গীত চিত্রাঙ্কন নৃত্যচর্চা প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনের যে আনন্দময় বিকাশ হয়—এ অভিমতের জন্য রবীন্দ্রনাথ সে যুগে যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হলেও তার অব্যর্থতার কথা এ যুগে শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনায় বিশেষভাবে স্বীকৃত হচ্ছে। রবীন্দ্রজীবনী পাঠকমাত্রই জানেন শিক্ষা ব্যবস্থায় আনন্দের আয়োজনকে রবীন্দ্রনাথ শুধু তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি। স্ব-প্রতিষ্ঠিত আশ্রম বিদ্যালয়ে তিনি বহুকাল পর্যন্ত

এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাফল্যের একটা স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-জীবনে ভাবনা ও কর্ম পরস্পর নিরপেক্ষ নয়—বরং একে অপরের পরিপূরক। কোন সময় জীবন-ভাবনা তাঁকে কর্মের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, আবার কোন সময় কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ে অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি নতুন চিন্তা করেছেন। এ:প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-মনের দ্বৈতরূপও লক্ষণীয়। এক রূপে রবীন্দ্র-মন সমালোচক আর একরূপে স্রষ্টা। সমালোচকের মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি প্রদর্শনে তৎপর হয়েছেন। 'শিক্ষার হেরফের' 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', 'শিক্ষা সংস্কার', 'শিক্ষা সমস্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধে সে সমালোচক-মন নিশ্ছিদ্র যুক্তিতর্কের বর্মে আবৃত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার 'জাতীয় বিদ্যালয়', 'তপোবন', 'মনোবিকাশের ছন্দ', 'শিক্ষার মিলন', 'লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য', 'ধ্যানী জাপান', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', 'শিক্ষার বিকিরণ', 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে প্রসঙ্গত সমালোচকের মন আত্মপ্রকাশ করলেও এ সমস্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা সম্পর্কীয় ব্যাপক গভীর এবং সৃষ্টিধর্মী ধারণাকে প্রবল প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।

শুধু প্রবন্ধ লিখে মতামত ব্যক্ত করেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে তিনি সে সৃষ্টিধর্মী ধারণাকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপ দিতেও সক্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর অনির্বাণ কর্মোদ্যমের ফলে আশ্রম বিদ্যালয় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে উন্নীত হল তখন তিনি তাঁর আদর্শ বিশ্ব-বিদ্যালয়-ধারণাকে ফুটিয়ে তুললেন শিক্ষার মিলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ প্রভৃতি প্রবন্ধে। এ সমস্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষার কার্যক্রমকে সমাজের, দেশের ও বিশ্বের সর্বস্তরে প্রসারিত করে দিয়ে শিক্ষাকে যেরূপে মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের অপরিহার্য বাহন রূপে ব্যক্ত করেছেন—তাতে সর্বযুগের

বিচক্ষণ ও মানবতাবাদী শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অমর আসন সংরক্ষিত হয়ে গেছে। পরিণত জীবনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-মানবের মিলন সাধনার জন্যে নিজের সৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ব্যাপক শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্র-মন আলোচনার একটি অধ্যায়ে। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে লিখিত 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থেও সে মানবতার উদ্বোধক শিক্ষার ইঙ্গিত আছে। পুনরুল্লেখ সম্ভাবনায় এখানে সে সম্পর্কে আর আলোচনা করা হল না।

শিক্ষা সম্পর্কীয় মতামত প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি হয়ত পুনঃপৌনিকতার ত্রুটিকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু বক্তব্যের দৃঢ়তায়, প্রকাশের সবলতায় এবং সহাস্য উজ্জ্বল দ্যোতনায় বক্রোক্তির উচ্চকিত ঝলকে রবীন্দ্রনাথের উক্ত শ্রেণীর প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের গৌরব বলে বিবেচিত হবার যোগ্য।

রবীন্দ্র-প্রবন্ধ জগতে ধর্ম সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলিরও একটি বিশেষ স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ-গুলির উৎসে যেমন কবির ব্যাপক সহানুভূতি ও অভিজ্ঞতা—ধর্মীয় প্রবন্ধগুলির মূল প্রেরণাও তেমনি স্বজীবনে অনুভূত অতি বিস্তৃত ও গভীর মানবানুভূতি ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। রাজনীতি সমাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প যেমন রবীন্দ্রনাথের মহান ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক তেমনি ধর্মবোধও সে ব্যক্তিত্বকে একটি সমুন্নত গৌরব প্রদান করেছে। পিতার শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই উপনিষদের উদার অধ্যাত্মবোধের জগতে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন—এটা সত্য কথা। শান্তিনিকেতনের উপাসনা মন্দিরের আচার্যরূপে বহু ভাষণে তিনি উপনিষদের সংস্কারমুক্ত অধ্যাত্ম-জগতকে কাব্যময় ভাষার সাহায্যে উপস্থিতও করেছেন। কিন্তু তাঁর এ পর্যায়ের ভাষণগুলিকে শুধুমাত্র উপনিষদের ভাবানুবাদ

মনে করলে ভুল করা হবে। ধর্মকে কবি বরাবরই জীবনের মূলোদ্ভূত একটি মহৎ প্রেরণারূপে অনুভব করেছেন। সে প্রেরণাকে কথায় রূপ দান করতে গিয়ে যখনই তিনি উপনিষদের ঋষিদের সমর্থন পেয়েছেন তখনই উপনিষদের অমর বাণীকে প্রবল আবেগের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে তাঁর ধর্ম-সম্পর্কীয় উপলব্ধি প্রচারে উপনিষদ্ সংযত সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত শ্লোকের নির্মোকমুক্ত হয়ে সজীব সরস সাহিত্যধর্মী রচনার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় প্রবন্ধের স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতা।

শুধুমাত্র :উপনিষদের অধ্যাত্মজগৎ নয়—বিচিত্র ও ব্যাপক মানবজগৎ এবং প্রকৃতিজগতও রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় প্রবন্ধের পটভূমিকায় বর্তমান থেকে এ শ্রেণীর প্রবন্ধকে বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য ও সরস মাধুর্য দান করেছে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলি পাঠক-মনে ক্লান্তি সৃষ্টি করার পরিবর্তে সে মনকে একটি সহজ আনন্দ ও উপলব্ধির রাজ্যে উত্তীর্ণ করে। আসলে রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তা ও আচার্য-সত্তার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বকে এক সমুচ্চ পরিণতি দান করেছে। সুগভীর অধ্যাত্মদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের জগৎ ও জীবনবোধকে যেমন অপরিসীম মূল্যসমৃদ্ধ করেছে তেমনি তার প্রকাশের মাধুর্য ও সৌন্দর্যও এক উচ্চ কবি-কল্পনার সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মোপলব্ধি জীবনের গভীর মর্মমূল থেকে উৎসারিত হওয়ায় তার বিবর্তনরেখাটিও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দীপ্যমান হয়ে উঠে।

'শান্তিনিকেতন'-এর উপদেশমালায় রবীন্দ্রনাথের যে ধর্মীয় উপলব্ধি বিমূর্ত ভাবধারায় প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করেছে বৃহত্তর মানবসত্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে 'মানুষের ধর্ম' আলোচনায়

সে উপলব্ধিই স্পষ্টতর রূপ লাভ করেছে। এক কথায় মানব সত্যের গভীরতম উপলব্ধি এবং প্রকাশই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ধর্মীয় আলোচনার যোগসূত্র।

যাঁরা জগতের মায়া মোহকে অতিক্রম করে বিমূর্ত ভাবজগতে ধর্মকে অনুসন্ধান করেন তাঁদের ধর্মচর্চা শুরু হয় সাধারণত একটু পরিণত বয়সে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্মানুভূতি তাঁর ভাবধর্মী জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং অংশ বলে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়স থেকেই তিনি ধর্মালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'ধর্ম' প্রবন্ধটিতে তিনি যে ধর্মানুভূতির রূপ দেন তাতে সাম্প্রদায়িক সংস্কারের কোন চিহ্নমাত্র ছিল না। তারপর তাঁর ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ১৯০৯ থেকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এবং সতের খণ্ডে প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা উল্লেখযোগ্য। 'শান্তিনিকেতনে' সর্বসাকুল্যে ১৫২টি ভাষণ একত্র সংযোজিত হয়েছে। এ সমস্ত ভাষণের মধ্যে কবি উপনিষদের চিরন্তন বাণীকে নিজের মনের মত করে কী সুন্দর ভাষারূপ দিয়েছেন দুই একটি উদ্ধৃতির সাহায্যে তা দেখানো যেতে পারে :

> উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত ! সকাল বেলায় তো ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়— সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা এক মুহূর্তেই ভেঙে যায়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাকার মোহ কে ভাঙাবে ! সমস্ত দীর্ঘ দিনের চিন্তা ও কর্ম হতে উৎক্ষিপ্ত একটা কুহকের আবেষ্টন, তার থেকে চিত্তকে নির্মল উদার শান্তির মধ্যে বাহির করে আনব কী করে ? সমস্ত দিনটা একটা মাকড়সার মতো জালের উপর জাল বিস্তার করে আমাদের নানাদিক থেকে জড়িয়ে রয়েছে— চিরন্তনকে, ভূমাকে একেবারে আড়াল করে রয়েছে— এই সমস্ত জালকে কাটিয়ে চেতনাকে অনন্তের মধ্যে জাগ্রত করে তুলব কী করে ? ওরে, উত্তিষ্ঠত ! জাগ্রত !
>
> উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ॥ শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড

ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের বেদীতে বসে রবীন্দ্রনাথের বন্ধনমুক্তি-প্রয়াসী আত্মা একদিন চকিতে সর্বমানবের মধ্যে যে ব্রহ্মস্বাদ লাভ করেছিল তার পরিচয় আছে 'নবযুগের উৎসব' প্রবন্ধে :

> আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বলব, কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলব না, এই সংকল্প মনে নিয়ে এসেছি। যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখব, আমাদের এই প্রাঙ্গন আজ পৃথিবার মহাপ্রাঙ্গন— এর ক্ষুদ্রতা নেই।
>
> নবযুগের উৎসব ॥ শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং' শ্লোকের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর উদার বিশ্বচেতনাকে তুলে ধরলেন বিশ্ববাসীর সামনে :

> প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখতে পারে না। মহান্তং পুরুষম্— মহান্ পুরুষকে, মহৎ সত্যকে, যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর তো দরজা বন্ধ করে থাকতে পারেন না। এক মুহূর্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্বলোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান; নিত্যকাল তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন; দিব্যধামকে তাঁরা তাঁদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন; আর যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন— সে মূর্খই হোক আর পণ্ডিতই হোক, সে রাজচক্রবর্তী হোক আর দীন দরিদ্রই হোক— অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।
>
> নবযুগের উৎসব ॥ শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ড

এ বিশ্বচেতনা ক্রমশঃ রবীন্দ্র-চিত্তকে আকর্ষণ করল সমগ্র মানব-সমাজের দিকে। তখন থেকে বিশ্বমানবের চিত্তে পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই হল তাঁর ধর্মীয় সাধনার মূলমন্ত্র। 'উৎসবের দিন' প্রবন্ধে কবির এ প্রসারিত অন্তরাবেগ ব্যাকুল প্রার্থনার মধ্যে স্বতোৎসারিত স্নিগ্ধ রূপ পেয়েছে :

> হে ঈশ্বর, তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান করো। বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান করো। আজ উৎসবের দিন শুধুমাত্র ভাবরসসম্ভোগের

> দিন নহে, শুধুমাত্র মাধুর্যের মধ্যে নিমগ্ন হইবার দিন নহে, আজ বৃহৎ সম্মিলনীর মধ্যে শক্তি উপলব্ধির দিন, শক্তি সংগ্রহের দিন…
>
> ধর্ম ॥ মাঘ, ১৩১১

শান্তিনিকেতন-এর দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> মানুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহংকার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়।… পরিবারের চেয়ে সমাজবোধে, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশবোধে একদিকে যতই বড়ো হয় অন্য দিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়। ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে উঠে, ততই তাকে বৃহৎ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে হয়।…
>
> সেই ভগবান সর্বব্যাপী, এইজন্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বগত মঙ্গল। বিভাগের দ্বারা বিরোধের দ্বারা যতই তাকে খণ্ডিত করে জানব ততই সে সর্বগত মঙ্গলকে বাধা দেব।

বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বমানবের মধ্যে এ পরম ঐক্যচেতনা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ধর্মসচেতন প্রবন্ধগুলিতে গভীর আবেগের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। ১৯০৯ এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সংগৃহীত 'ধর্ম' ও 'সঞ্চয়'-এর প্রবন্ধগুলি কবির সুগভীর ধর্মবোধের পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের প্রসারিত ধর্মানুভূতি পরবর্তীকালে মননশীল রূপলাভ করেছে 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে। সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে।

ধর্মবোধের জগতে বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বমানবের পরম ঐক্যানুভূতিকে কঠোর এবং কঠিন সাধনা বলে অনুভব করলেও ধর্মসাধনায় রসহীন বিশুষ্কতাকে রবীন্দ্রনাথ শ্রীহীনতার নামান্তর বলে ঘোষণা করেছেন। পরমেশ্বর যখন বিশ্বজগত এবং বিশ্বজীবনের সঙ্গে রসের যোগে যুক্ত তখন কবির মতে :

> ধর্ম সাধনার চরম পরিচয় যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং

অনির্বচনীয় মাধুর্য ও তার মধ্যে নিত্য-চলনশীল প্রাণের লীলা। শুষ্কতায় অনম্রতায় সৌন্দর্য লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্যের নিত্য বিকাশ।

রসের ধর্ম ॥ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড

এ আত্মিক রসবোধের প্রেরণাতেই কবি বর্ষণমুখর শ্রাবণ সন্ধ্যায় ব্যাকুল বিরহবেদনার মধ্যেও অন্তর্যামীর সঙ্গে একটি অনির্বচনীয় আনন্দের যোগ অনুভব করেন:

আজ কেবলই মনে হচ্ছে এই যে বর্ষা, এ তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণ ধারা। যতদূর চেয়ে দেখি আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহ সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার—তারই দিগদিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্ ঝর্ করে বলছে, 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া।' কিন্তু, তবু এই বেদনা, এই রোদন, এই বিরহ একেবারে শূন্য নয়—এই অন্ধকারের, এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে একটি নিবিড় রস অত্যন্ত গোপনে ভরা রয়েছে; একটি কোন বিকশিত বনের সজল গন্ধ আসছে, এমন একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য যা যখনি প্রাণকে ব্যথায় কাঁদিয়ে তুলছে তখনি সেই বিদীর্ণ ব্যথার ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আসছে।

শ্রাবণ সন্ধ্যা ॥ শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের এবং মানবমনের অন্তর্গূঢ় ঐক্যের উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথের ধর্মানুভূতির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

মহৎ জীবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা যে পরিমাণে বৃহৎ এবং অতলস্পর্শী ছিল সে পরিমাণে তাঁর জীবনীপ্রবন্ধ রচনার অজস্রতা দেখা যায় না। এটা খুবই সম্ভব সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের দিকে

আত্যন্তিক মনঃসংযোগ করায় সংখ্যার দিক দিয়ে এ জাতীয় প্রবন্ধের অপ্রতুলতা ঘটেছিল। তবু স্বল্পসংখ্যক যে কয়েকটি পূর্ণায়ত প্রবন্ধে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন মহান বাঙালীর ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বকে স্বল্পরেখায় উজ্জ্বল রূপ দিয়েছেন তার তুলনা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিরল। বিভিন্ন সময়ে বিদ্যাসাগর, রামমোহন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তুঙ্গস্পর্শী চরিত্রধর্ম এবং প্রবল ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করে তিনি যে তিনটি প্রবন্ধ রচনা করেন বাংলা জীবনী প্রবন্ধের ধারায় সে প্রবন্ধগুলি নতুন পথনির্দেশ করেছিল। সে প্রবন্ধগুলি একত্র সংকলিত হয়ে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'চারিত্রপূজা' নামে। চারিত্রপূজার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ জীবনচরিত রচনার যে উচ্চ আদর্শ ব্যক্ত করেন তার তুলনা সমৃদ্ধ য়ুরোপীয় সাহিত্যেও বিরল। য়ুরোপীয় সাহিত্যে সাধারণত জীবনচরিত রচিত হয় ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বকে কেন্দ্র করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে:

> যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহারই জীবনচরিত সার্থক; যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোন কাজ করিয়াছেন তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরী করিয়াছেন, তিনি কবিতা ও গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই, তাঁহার জীবনচরিতে কাহার কী প্রয়োজন।
>
> —চারিত্র পূজা

জীবনচরিত সম্পর্কে এ সমুচ্চ আদর্শ অধিক সংখ্যক জীবনচরিত রচনায় রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেনি এমন অনুমানও অহেতুক নয়।

জীবনচরিত আলোচনায় জীবনের খুঁটিনাটি কৃতিত্ব বিশ্লেষণকে রবীন্দ্রনাথ তাই প্রাধান্য দেননি। সমস্ত কর্মকৃতির মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তিত্ব দেশের দশের ও সমাজের কল্যাণ সাধনায় সার্থকতার পথ খুঁজেছে তার সামগ্রিক স্বরূপ উদ্ঘাটনই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রধান

লক্ষ্য। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব-নির্ণয়ে অননুকরণীয় ভঙ্গীতে তাই তিনি বলেছেন :

> গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস—শাখাপল্লব-সম্পন্ন সরল মহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে—তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্ম দারিদ্র্য এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।
>
> চারিত্রপূজা ॥ বিদ্যাসাগর চরিত

রামমোহনের অভ্রচুম্বী ব্যক্তিত্ব বিচারে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ও মানবিক, বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী একইসঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে :

> এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন, বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁহাদেরই অগ্রণী…ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনার, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনার, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সাধনার নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়। …তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেননা তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে ; কিন্তু সেই অতীত কালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই। তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে।
>
> চারিত্র পূজা ॥ ভারতপথিক রামমোহন রায়

বিদেশীয়দের মধ্যে কতকটা অখ্যাত হ্যামারগ্রেনের মানব-মাহাত্ম্যের গৌরবকে বহু স্থলে তিনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। যে সমস্ত ইংরেজ লেখকের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বকে রবীন্দ্রনাথ স্বল্প রেখায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন তার মধ্যে ইয়েট্স ও স্টপফোর্ড ব্রুক

উল্লেখযোগ্য। (দ্রষ্টব্য, পথের সঞ্চয়, ১৯৩৯)। স্বদেশীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল এবং সঞ্জীবচন্দ্রের মৌলিক প্রতিভাকে যেভাবে অনবদ্য বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্যে তা তুলনারহিত। বিহারীলালের কাব্যের নতুন সুরকে ভোরের পাখীর কাকলির সঙ্গে তুলনা করে তিনি যে সাহিত্যদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু রাবীন্দ্রিক কল্পনাতেই সম্ভব। তবে তাঁর সৃষ্টিধর্মী কল্পনা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির আশ্চর্য উদ্ভাস আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের আবির্ভাব বর্ণনায়ঃ

> দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মি সমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দিকের নিস্তব্ধ গিরি-পারিষদবর্গের কত ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে। একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে। আধুনিক সাহিত্য ॥ বঙ্কিমচন্দ্র

দুর্ভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্ভেদী মানবিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টির সাহায্যে খুব বেশী সংখ্যক মহামানব ও মৌলিক সাহিত্যস্রষ্টার প্রতিভা নির্ণয়ে অগ্রসর হননি। ফলে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের এ দিকটি এখনও অপুষ্ট থেকে গেছে। তবে একথা অনস্বীকার্য মানুষের সামগ্রিক মহত্ত্ব ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব বিচারে স্বল্প সংখ্যক রচনায় তিনি জীবনীপ্রবন্ধের যে অভ্রান্ত পথনির্দেশ করেছেন তা তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী বহু লেখককে এ ধরনের প্রবন্ধ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সে হিসেবে বিচার করলে চিন্তাধর্মী জীবনী-প্রবন্ধের পথিকৃতের গৌরব রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য।

জীবনীপ্রবন্ধের মত আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ নব্য প্রকরণের স্রষ্টা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়

[বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংকলন, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫০] জীবনস্মৃতি (১৯১২) এবং ছেলেবেলা (১৯৪০) স্মর্তব্য। আত্মপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনের ঘটনাকে প্রাধান্য না দিয়ে তাঁর অন্তর্জীবনের কাহিনীকে যে ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের ছবি শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে চমৎকারভাবে গ্রথিত করেছেন। বিভিন্ন বহির্ঘটনা এবং সমসাময়িক ভাবনার আশ্রয়ে একটি ব্যক্তিত্ব ক্রমশঃ কিভাবে আত্মবিকাশের দিকে অগ্রসর হয়েছে তার অনবদ্য ছবি জীবনস্মৃতির বিচিত্র চিত্রপটগুলি। অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ডে সঙ্গত ভাবেই মন্তব্য করেছেন : "যদি কোন একটি রচনাকে রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যের প্রতিভূ বলিতেই হয় তবে সে জীবনস্মৃতি।" (দ্রষ্টব্য, ঐ, ৪৭৪ পৃষ্ঠা)। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ছেলে বেলা'তেও কবির বাল্যজীবনের স্মৃতি অনবদ্য প্রকাশভঙ্গিমায় রেখায়িত। এ স্মৃতিচিত্রণ জীবনস্মৃতির পরিপূরক। ছোটদের জন্য লেখা হলেও বয়স্করাও এ গ্রন্থের রসসম্ভোগ করে তৃপ্তিলাভ করেন।

রবীন্দ্রজীবনের বিচিত্র স্মৃতি তাঁর অজস্র পত্রসাহিত্যেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। বক্তব্যের আটসাঁট বাঁধুনি এবং আদি মধ্য ও অন্ত সমন্বিত প্রকাশকে যাঁরা প্রবন্ধ সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন বলে মনে করেন তাঁরা হয়ত রবীন্দ্রনাথের নানা রসব্যঞ্জনায় প্রকাশিত পত্রাকার রচনাগুলিকে প্রবন্ধ বলতে অস্বীকার করবেন। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য, জীবনের নানা ভাব ও ভাবনাকে পত্র-প্রবন্ধের অভিনব ও সরস রীতিতে উপস্থাপিত করে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করলেন। রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের প্রবন্ধের মধ্যে য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১২৯২), চিঠিপত্র (১২৯২), জাপানযাত্রী (১৯১৯), যাত্রী (১৯২৯), রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), জাপানে, পারস্যে (১৯৩৬) এবং ১৯১২

খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ছিন্নপত্র' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছিন্নপত্রের পত্রগুচ্ছে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাবনা, সৌন্দর্যদৃষ্টি এবং সৃষ্টি-বেদনা একই সঙ্গে মনের আকাশে ভিড় করে যেন ঝল্‌মল্‌ করছে। এ সমস্ত পত্রপ্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশরীতির স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের ডায়ারি জাতীয় রচনাকেও রীতিমত প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। কিন্তু এ জাতীয় রচনা-প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ উপভোগ্য সরস রীতিতে তাঁর বক্তব্যকে পাঠকের নিকট পরম আস্বাদ্য করে তুলেছেন। অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তৃতীয় খণ্ডের ৪৭৫ পৃষ্ঠায় ডায়ারিকে 'পত্রাকার প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধাকার পত্রের মাঝামাঝি' বলে নির্দেশ করেছেন। ১৯২৪-২৫ সনে লিখিত 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' এ পর্যায়ের প্রবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের পত্রপ্রবন্ধ ও ডায়ারিতে কবি-মনের ও ব্যক্তিত্বের অনেক অব্যক্ত দিক রসঘন প্রকাশের মাধুর্যে উজ্জ্বল দীপ্তিলাভ করেছে।

লঘু ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ রচনায়ও রবীন্দ্রনাথ কত সিদ্ধহস্ত ছিলেন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ব্যঙ্গকৌতুক-এ সংকলিত প্রবন্ধগুলি তার প্রমাণ। তীব্র ব্যঙ্গপ্রধান রচনাতেও রবীন্দ্রনাথের নিপুণতা কত বেশী ছিল তার প্রমাণ 'ভানুসিংহের জীবনী' ও 'রসিকতার ফলাফল'। লঘু কৌতুকরস, মৃদু এবং শাণিত ব্যঙ্গপ্রবণতা শুধু রবীন্দ্রনাথের উক্ত শ্রেণীর রচনাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে নি, কবির ধর্মচেতনামূলক প্রবন্ধ ছাড়া আর প্রায় সমস্ত শ্রেণীর প্রবন্ধে দীপ্তি সঞ্চার করেছে।

বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রমনের কৌতূহল কত প্রবল এবং কত অকৃত্রিম ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কীয় ও বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধই তার প্রমাণ। বাংলা দেশে বাংলা ভাষার আলোচনা যখন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখন রবীন্দ্রনাথ

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সুত্রপাত করে পথিকৃতের গৌরব অর্জন করেন। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আধুনিক ভাষাতত্ত্ব-সম্মত প্রণালীর সাহায্যে বাংলা ব্যাকরণের নানাবিধ সমস্যার উপর তিনি যে নতুন আলোকসম্পাত করেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তা প্রকাশিত হয় 'শব্দতত্ত্ব' নামে। মৃত্যুর মাত্র কয়েক বৎসর পুর্বে সরল ভঙ্গীতে সর্বসাধারণের জন্য 'বাংলা ভাষা পরিচয়' (১৯৩৮) রচনা করে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কৃত্য সম্পাদন করেন।

বিবিধ বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল সহজাত হলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বাল্যাবধি অতি তীব্র। বহু কর্মে লিপ্ত থেকেও পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কীয় তথ্য ও সিদ্ধান্তকে সরল সরস ভঙ্গীতে প্রকাশ করেন 'বিশ্বপরিচয়' নামক গ্রন্থে (১৯৩৭)। শুধুমাত্র রসের সাধনায় নয়—কঠোর ও কঠিন মননের সাধনায়ও জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রবীন্দ্রপ্রতিভা কত সতেজ ও সচেতন ছিল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিশ্বপরিচয় তার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সর্বশেষে শুধু এ কথাই বলা যায়, অক্লান্ত সাহিত্যকর্মী রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে এ বিপুলপ্রসার প্রবন্ধ সাহিত্য না পেলে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিভিন্ন দিক নির্ণয়ে পাঠকের ভ্রান্তি ঘটত বারে বারে। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রধর্মী প্রবন্ধ সাহিত্য রবীন্দ্র-মন ও রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের অভ্রান্ত নিদর্শন। কাব্যে নাটকে গল্পে উপন্যাসে যে কথাকে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি সে বক্তব্যকে বিশদ করে তুলেছেন প্রবন্ধ সাহিত্যে। এ কারণে রবীন্দ্র-মন এবং রবীন্দ্র সাহিত্যের সামগ্রিক রূপের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য রবীন্দ্র-প্রবন্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি অপরিহার্য। রবীন্দ্র প্রবন্ধ রবীন্দ্র-মন ও রবীন্দ্র সাহিত্য জগতে প্রবেশপথের চাবিকাঠি।

● ● ●

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্র বিরোধ : রবীন্দ্র বরণ

সৃষ্টির জগতে গতানুগতিকতার সীমা অতিক্রম করে যখনই কোন মৌলিক প্রতিভার আবির্ভাব হয় তখনই সমালোচক সমাজ চঞ্চল হয়ে উঠেন। প্রকৃত সাহিত্যবোধ ও দূরদৃষ্টিহীন এক শ্রেণীর সমালোচক পুরাতনের প্রতি অন্ধ মোহে সমালোচনার সম্মার্জনী দিয়ে নব্যপন্থী সাহিত্যকে বারবার আঘাত করে অহেতুক আনন্দ অনুভব করেন। আবার যে সমস্ত সমালোচকের সাহিত্যবোধ তীক্ষ্ণ ও দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী তাঁরা সহৃদয় সমালোচনার সাহায্যে সাহিত্যে নতুন আবির্ভাবকে স্বাগত জানান—স্রষ্টার নবসৃষ্টিচেতনাকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেন। সাহিত্যজগতে নবসৃষ্টির ইতিহাসে এরূপ ঘটনা হামেশাই দেখা গেছে। রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কাব্যজগতে মধুসূদনের চকিত আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে যে আলোচনা সমালোচনার ঝড় উঠেছিল তা থেমে এ মৌলিক স্রষ্টার নবসৃষ্টিকে স্বীকৃতি জানাতে বাঙালীর বেশ কিছুকাল সময় লেগেছিল। কথাসাহিত্যে বঙ্কিমের অভিনব রূপ রীতি ও ভাববস্তুর প্রবর্তনও সংস্কারান্ধ এক শ্রেণীর সমালোচকের সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছিল। অবশ্য বঙ্কিমের কথাসাহিত্যের অসামান্য জনপ্রিয়তার মুখে বঙ্কিম বিরোধিতা বেশীদিন টেকেনি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নবসৃষ্টিপ্রেরণাকে লক্ষ্য করে বাঙালী সমালোচক সমাজ বহুকাল ব্যাপী যে ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তার তুলনা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিরল। রবীন্দ্র-বিরোধ ও রবীন্দ্র বরণের মধ্য দিয়ে বাঙালী সমালোচক গোষ্ঠী প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ যে সাহিত্য সচেতনতার পরিচয় দেন বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের তা একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নব্যরীতির সাহিত্যসৃষ্টির প্রতি এক শ্রেণীর সমালোচকের তীব্র বিরোধিতা এবং আর একশ্রেণীর সমালোচকের সুনিবিড় অনুরাগ শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের পক্ষে অসাধারণ বৈচিত্র্যময় নয়—আধুনিক বাংলা সমালোচনার দিক থেকেও অশেষ মূল্যসমৃদ্ধ।

নিজের দীর্ঘ জীবনের প্রায় সাতষট্টি বৎসর কাল সময় ব্যাপী রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য রচনা করেছেন। সার্থক সাহিত্য রচনার কথা ধরলেও সে

কাল-পরিধি প্রায় ষাট বৎসর। এ দীর্ঘায়ত কালবৃত্তের মধ্যে এক শ্রেণীর সাহিত্যকর্মী রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যের সমালোচনা করে যেমন আনন্দ ও উত্তেজনা অনুভব করতেন তেমনি আর এক শ্রেণীর সাহিত্যকর্মী তাঁর অভিনব প্রতিভাকে সানন্দ অভ্যর্থনা জানিয়ে উৎফুল্ল হতেন। আবার অনেক সময় দেখা গেছে ঘটনা ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে একই ব্যক্তির রবীন্দ্র-অনুরাগ ক্রমে ক্রমে রবীন্দ্র-বিরোধে পরিণতি লাভ করেছে। এ রবীন্দ্র-বিরোধিতা সব সময় কবির প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও অসূয়া-প্রসূত এমন কথা বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে এক শ্রেণীর লেখকের সাহিত্য প্রত্যয়ের পার্থক্যেই রবীন্দ্র-বিরোধ এত তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন জীবন ভাষ্যকার এ প্রত্যক্ষ সত্যকে অস্বীকার করে রবীন্দ্র-বিরোধিতাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে রবীন্দ্র-বিরোধিতার অন্যতম কারণ হল এক শ্রেণীর বিদ্বেষ-পরায়ণ লোকের ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও অসূয়া। রবীন্দ্রনাথ অভিজাত বংশের সন্তান, রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের লোক, রবীন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণ আচার সংস্কারবিরোধী—এ সমস্ত কারণেই এক শ্রেণীর সমালোচক রবীন্দ্র-বিরোধী হয়েছিলেন—এ ধরনের উক্তি রবীন্দ্র-বিরোধীদের বুদ্ধি বিবেচনা ও সাহিত্যজ্ঞানের প্রতি চরম অনাস্থা প্রদর্শন করা ছাড়া আর কিছু নয়। কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর *On the Edges of Time* গ্রন্থে বলেছেন :

> Hardly any of these were literary criticisms—they were acrimonious and sometimes even scurrilous.

সমালোচকদের প্রতি উদ্দেশ্য আরোপ করে তিনি আরো বলেছেন :

> One obvious reason for the persistence of such vituperations appearing regularly in a section of the Bengali Press, was that the editors had early discovered that slandering Father paid handsomely.

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক আভিজাত্য ও রচনার স্বাতন্ত্র্য সমালোচকদের তীব্র সমালোচনার বিষয় হয়েছিল এটা সত্য। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত

ছিলেন বলেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং বিপিনচন্দ্র পালের মত সনাতনপন্থী ব্যক্তি রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেছিলেন—এ ধরনের মন্তব্য অবশ্যই প্রতিবাদযোগ্য।

রবীন্দ্রানুরাগী শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত রবীন্দ্র-বিরোধীদের সম্পর্কে 'রবীন্দ্র চর্চার ভূমিকা' গ্রন্থে বলেছেন :

> এই যে প্রতিপক্ষদলের ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কীর্তির ইতিহাসে এর মূল্যও কম নয়। তা ছাড়া এঁদের মধ্যে এমন মানুষরা ছিলেন, যাঁদের বাংলা দেশে সম্মানযোগ্য স্থান ও দান আছে এবং সবাই ঈর্ষা, অসূয়া বা মূঢ়তা বশেই রবীন্দ্র-বিরোধিতা করেন নি। তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধাশীলও ছিলেন না সবাই। এ দিকের ইতিহাস লেখা হয়নি আজো।

রবীন্দ্র-বিরোধী সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূল সমালোচনা অনেক সময় রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া হইত না—হইত তাঁহার স্তাবক অনুকারী শিষ্যবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া। কালে এই সমালোচকের দল রবীন্দ্র-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে, এই সমালোচক শ্রেণীর মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অনেক মনীষীও ছিলেন এবং তাঁহাদের সকল মতামতই বিদ্বেষপ্রসূত বলিয়া উপেক্ষা করা সুস্থ দৃষ্টির চিহ্ন নহে।

রবীন্দ্র-বিরোধিতার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক জীবন ভাষ্যকার শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনি *Rabindranath Tagore : a Biography* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন :

> He was abused for his radicalism.…They never forgave him for not sharing their superstitions, the biggest of which was the patriotic delusion that they were God's chosen people. Tagoro loved his country and his people but made no secret of the fact that he admired

the British character more than the Indian. This his compatriots never forgave him. For this history will honour him.

রবীন্দ্র সমালোচনার বিচিত্র প্রকৃতি এবং রবীন্দ্র-মনে তা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার সামগ্রিক পরিচয় দান প্রসঙ্গে শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত 'রবীন্দ্রচর্চার ভূমিকা' গ্রন্থে আরও বলেছেন :

> রক্ষণশীলেরা তাঁকে বলেছেন উন্মার্গের প্রশ্রয়দাতা, আবার প্রগতিবাদীরা বলেছেন স্থিতাবস্থার সমর্থক। নীতিবাগীশেরা বলেছেন ভোগাসক্তির আতিশয্য তাঁর রচনায়। বাস্তবপন্থীরা বলেছেন, দেহাতীত অর্থাৎ অতি-রোমান্টিক কল্পনাময়তাই তাঁর আগাগোড়া। বামপন্থীরা অভিযুক্ত করেছেন তাঁকে শোষণপরায়ণ বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমর্থক বলে। ধার্মিকরা তাঁর মধ্যে পেয়েছেন মেকী দার্শনিকতা ও সনাতন ধর্ম সম্পর্কে নিষ্ঠাহীনতা। বৈজ্ঞানিক নিরীশ্বরবাদীরা আবার তাঁকে চিহ্নিত করেছেন মানবতাবাদী ধর্মনিষ্ঠ বলে। অর্থাৎ দুই দলই খণ্ড নিয়ে বিবাদ করেছেন, অখণ্ড রবীন্দ্রনাথ যার উর্ধ্বেই থেকেছেন বরাবর।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্র বিরোধের দীর্ঘ ও বিচিত্র ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা হচ্ছে এখানে।

সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে রবীন্দ্রনাথ বহু বিরোধিতার গ্লানি ও সমালোচনার আঘাত সহ্য করেছেন। তাঁর রচনা ও ব্যক্তিত্বের অনুরাগী অসংখ্য পাঠকের নিকট থেকে অভ্যর্থনাও তিনি কম লাভ করেননি। কিন্তু এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্র জীবনে এ সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনার প্রকৃতি এক ছিল না। পূর্ণ যৌবনে ও প্রৌঢ়ত্বে দেশ বিদেশব্যাপী সাহিত্য-খ্যাতি লাভ করবার পূর্বে সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি যে সাহিত্য-বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের ভাষণে তিনি সে সমালোচনার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন তাঁর আত্মপরিচয়ে (দ্রষ্টব্য : ৮১ পৃষ্ঠা) :

> তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে

প্রশ্রয় দেননি—আধো আধো বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদূষকের নয়, সেটা বিদূষণ ব্যবসায়ের অঙ্গ ছিল না। তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিলনা লেশমাত্র। বিমুখতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও বিদ্বেষ দেখা দেয়নি। তাই প্রশ্রয়ের অভাব সত্ত্বেও বিরুদ্ধ রীতির মধ্য দিয়েও আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ যখন মাত্র তেইশ বৎসরের যুবক তখন সে যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয়। ইতিপূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র কবিকে ভবিষ্যৎ কবি-সভার অগ্রণী কবিরূপে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ ঘটে ধর্ম-বিষয়ক আলোচনা নিয়ে। ১২৯১ সনের 'প্রচার' পত্রিকায় হিন্দুধর্মের সমর্থনমূলক বঙ্কিমের একটি প্রবন্ধই এ বিবাদের মূলসূত্র। ব্রাহ্মসমাজের অপর কয়েকজন বর্ষীয়ান্ নেতার সঙ্গে যুবক রবীন্দ্রনাথও যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে সত্যধর্মের লঙ্ঘনকারী বলে আক্রমণ করেন তখন বঙ্কিম তাঁর 'প্রচার' পত্রিকায় 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে সে আক্রমণের প্রত্যুত্তর দেন। সে প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত আক্রমণের জন্য দায়ী করেন রবীন্দ্রনাথের উৎসাহদাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দকে। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য নিজের ঔদার্যগুণে পরে এ বিরোধের কথা ভুলে যান। এ চারিত্রিক মহত্ত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনব্যাপী বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন।

বঙ্কিমবন্ধু অক্ষয়চন্দ্র সরকারও ছিলেন যুবক রবীন্দ্রনাথের 'রূপ ও গুণমুগ্ধ'। রবীন্দ্রনাথের নতুন ধরনের কবিতার জন্য সে সময় কোন কোন সমালোচক যখন কবিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন অক্ষয়চন্দ্র তখন ১২৯১ সনের 'নবজীবন' পত্রিকায় 'ভাই হাততালি' নামক প্রবন্ধ লিখে কাব্য-যশোলিপ্সু তরুণ কবিকে সস্তা প্রশংসাবাণীর দ্বারা বিচলিত না হতে উপদেশ দেন। এ সমালোচনা সত্ত্বেও ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব বিচার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে, বঙ্কিম ও হেমচন্দ্রের জীবনীগ্রন্থে রবীন্দ্র-প্রতিভাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানান অক্ষয়চন্দ্র।

সে যুগের খ্যাতিমান সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু নব্য হিন্দুধর্মের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। চন্দ্রনাথের লয়-তত্ত্ব সম্পর্কীয় আলোচনাকে সমালোচনা করায়

চন্দ্রনাথ খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে 'স্বজাতিদ্রোহী' কথাটি প্রয়োগ করেন। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'কড়াক্রান্তি' নামক প্রবন্ধে চন্দ্রনাথকে 'অন্ধ আত্মাভিমানী' বলে আক্রমণ করেন। কেউ কেউ মনে করেন এ বাদানুবাদের পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় চন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে 'হিং টিং ছট্' কবিতা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য সাধনার পৃষ্ঠায় বলেন— নব্যহিন্দু ধর্মের উদ্ভট ব্যাখ্যাকে লক্ষ্য করেই তিনি এ ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছিলেন। কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ তাঁর লক্ষ্য ছিল না।

তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ নবতর জীবনদৃষ্টি ও রচনাশৈলির সাহায্যে কয়েকখানি কাব্য নাটক নিয়ে সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করবার পর ঊনবিংশ শতাব্দীয় যে কয়েকজন লেখক ও মনীষী রবীন্দ্র প্রতিভাকে সানন্দ স্বীকৃতি জানিয়ে তৎকালীন লেখক সমাজে বরণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। কালীপ্রসন্ন ঘোষ নিজের 'বান্ধব' পত্রিকায় কবিকাহিনী ও রুদ্রচণ্ডের অনুকূল সমালোচনা করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'এডুকেশন গেজেটে' মন্তব্য করেন 'প্রভাত সঙ্গীত ভারতীয় ধারায় রবীন্দ্রনাথের মহত্তম প্রকৃতিপ্রীতির সানন্দ অভিব্যক্তি।' 'বাল্মীকি প্রতিভা'র অভিনয় দর্শনে ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মত মনীষী ও সাহিত্যিক রবীন্দ্র-প্রতিভাকে সোৎসাহ স্বীকৃতি জানান।

সাহিত্য জগতে রবীন্দ্র বিরোধিতা সর্বপ্রথম প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথের যৌবনে রচিত এবং ১২৯৩ (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) সনে প্রকাশিত 'কড়ি ও কোমল'কে কেন্দ্র করে। 'হিতবাদী' পত্রিকার রক্ষণশীল লেখক এবং প্রাচীনপন্থী সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'রাহু' ছদ্মনামে কড়ি ও কোমলের একখানি প্যারডি (মিঠে কড়া) রচনা করে রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভাষাভঙ্গী, রুচিবোধ—সব কিছুকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রকাব্যের সৌন্দর্যজগতে প্রবেশ করবার মত সংস্কার সে যুগে কালীপ্রসন্নের মত রক্ষণশীল সাহিত্যিকেরা অর্জন করতে পারেন নি। তাঁরই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে কোন কোন প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিক তাই রবীন্দ্র-বিদূষণে মুখর হয়ে উঠেন।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এ রবীন্দ্র বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে আর একশ্রেণীর রসগ্রাহী নব্যপন্থী লেখকের মধ্যে রবীন্দ্র কাব্যপ্রতিভাকে সাগ্রহে বরণ করে নেবার প্রবণতা দেখা দেয়। কড়ি ও কোমল প্রকাশের এক বৎসর পরে 'নব্যভারত' পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী এ বহুনিন্দিত কাব্যখানির সমালোচনায় এ মন্তব্য করেন, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা, সহৃদয়তা, প্রেম ও জ্ঞানের পরিচয়ে উজ্জ্বল কড়ি ও কোমল। কড়ি ও কোমলের কবিকে প্রথম শ্রেণীর কবি বলে উল্লেখ করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। সমসাময়িক কবি গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দ দাস প্রভৃতির তুলনায় তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষার কমনীয়তা, ভাবের উচ্ছ্বাস এবং চিন্তার গভীরতা অনেক বেশী বলেই তাঁর ধারণা। রবীন্দ্রনাথের লিরিক কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অনুরূপ প্রতিভা সেদিন নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল দেবীপ্রসন্নের নিকট। রবীন্দ্র বিদূষণের সঙ্গে রবীন্দ্র বরণের চমৎকার দৃষ্টান্ত কড়ি ও কোমলের সমালোচনা।

রবীন্দ্র সাহিত্যজীবনের দীর্ঘকাল ব্যাপী বিরোধিতার ইতিহাসে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকার ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। বহুকাল যাবৎ রবীন্দ্রবিরোধীদের প্রধান বাহন রূপে ব্যবহৃত হওয়ায় এ সাহিত্য পত্রখানি পুরোপুরি রবীন্দ্রবিরোধী বলে কুখ্যাতি অর্জন করেছে! সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকেও অবিমিশ্র রবীন্দ্র-বিদ্বেষী বলে মনে করা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-বিরোধিতার ইতিহাসে সুরেশচন্দ্র সমাজশতি ও তাঁর সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা একটু ভিন্নতর। মনোভাবের দিক থেকে রক্ষণশীল হলেও আবাল্য সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হওয়ায় সমাজপতি মশাই এমন সাহিত্যসংস্কার অর্জন করেছিলেন যার সাহায্যে তিনি সাহিত্যে অভিনন্দনযোগ্য ও নিন্দনীয় বিষয়কে বুঝবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। সাহিত্যের পৃষ্ঠায় দৃঢ়হস্তে তিনি সাহিত্যের দোষগুণ বিচার করতে ভালবাসতেন। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রতিও তিনি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের উৎকর্ষও মোটামুটি তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। তবে রক্ষণশীলতার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের নব্যপন্থী সাহিত্যকে অকুণ্ঠভাবে বরণ করে নিতে তাঁর

সাহিত্য সংস্কারে বাধত। সেজন্য সাহিত্যের পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রসাহিত্যের দোষগুণ বিচারের সাহায্যে রবীন্দ্র বিরোধিতাকে সাহিত্যের খাতে প্রবাহিত করে দিতে তিনি সচেষ্ট হন। কোন কোন সময়ে ব্যক্তিগত সমালোচনাকে তিনি যে প্রশ্রয় দিতেন না এমন নয়। তবে সে যুগের নির্জলা রবীন্দ্র বিরোধিতার মধ্যে সমাজপতির রবীন্দ্র-বিরোধিতা ছিল মুখ্যত সাহিত্যিক।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কে সমাজপতি মশাই কত আশার ভাব পোষণ করতেন ১৮৯৯ সনের সাহিত্যের সম্পাদকীয় মন্তব্য তার প্রমাণ। সম্পাদক হিসেবে নানা অসুবিধার কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ যখন ভারতীর সম্পাদনা ত্যাগ করেন সমাজপতি মশাই তখন উল্লসিত হয়ে মন্তব্য করেন, অনবরত সাময়িক পত্রের চাহিদা পূর্ণ করতে গিয়ে ভাস্বর প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-শিল্পের অবনতি ঘটছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সাময়িক পত্রের জন্য লেখার জোগান দেওয়ার চাইতে পরিপূর্ণ অবকাশের মধ্যে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করাই উচিত।

সমাজপতি মশাইয়ের অভিযোগ ছিল রবীন্দ্রনাথের স্তাবক ভক্তদের বিরুদ্ধে। ১৩০৬ সনের আষাঢ় সংখ্যা প্রদীপে রবীন্দ্রভক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'একটি কুকুরের প্রতি' নামক ব্যঙ্গ কবিতার সাহায্যে যখন রবীন্দ্রনাথকে 'নবীন রবি' এবং রবীন্দ্রসমালোচক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-কে (সমাজপতি মশাইয়ের অনুমান) কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেন তখন সমাজপতি মশাই সমালোচকের এ ধরনের মনোভাবকে 'মোসাহেবি' এবং সমালোচনার ভাষাকে 'মেছুনীর ভাষা' বলে অভিহিত করেন। সে সম্পাদকীয় মন্তব্যে তিনি আরও অভিযোগ করেন—এ সমস্ত স্তাবক ভক্তকে প্রশ্রয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পবিত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিগানের যুগকেই পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করছেন। ১৩০৬ সনের মাঘ সংখ্যা 'প্রদীপে' 'কণিকা'র সমালোচনায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যখন লেখেন—সমালোচকদের মুণ্ডপাত করবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ কণিকার অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন—তখন সে বৎসরের ফাল্গুন সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় সমাজপতি মশাই এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে নেহাৎ 'বিদ্বেষবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য'ই অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মশাই রবীন্দ্রনাথের উপর এরূপ হীন উদ্দেশ্য আরোপ করেছেন। রবীন্দ্রভক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের মর্জিমত

যখন 'পসারিনী' কবিতার উদ্ভট ব্যাখ্যা করেন তখন ১৩১৭ সনের 'দেবালয়' পত্রিকায় সে ব্যাখ্যাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণের খোঁচা দিয়ে তিনি লেখেন—'হে ভগবান, রবীন্দ্রনাথ নবযুগের বাংলা সাহিত্যের গৌরব—তুমি তাঁহাকে এ চারুসম্প্রদায়ের নির্লজ্জ স্তাবকতা, নির্জলা খোশামুদি এবং নিরবচ্ছিন্ন বিড়ম্বনার নরক হইতে উদ্ধার কর।'

সমাজপতি মশাইয়ের সাহিত্যবোধ যে অগভীর ছিল না সাহিত্যের পৃষ্ঠায় তাঁর রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনাই প্রমাণ। ১২৯৮ (১৮৯১) সনের পৌষ মাসের সাহিত্য পত্রিকায় তিনি 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের পরিণতি সম্ভাব্যতার সীমাকে অতিক্রম করেছে বলে অভিযোগ করেন। ১৩০৭ সনের শ্রাবণ সংখ্যা 'সাহিত্যে' তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষ' কবিতার কোন কোন অংশকে কৃত্রিমতা দোষদুষ্ট এবং শব্দঝঙ্কারমুখরিত বলে অভিযোগ করেন। পরবর্তী এক সংখ্যা সাহিত্যে তিনি 'পিপাসী' কবিতাকে কৃত্রিমতাদোষদুষ্ট বলে মন্তব্য করেন। 'মৃত্যুর পরে' নামক কবিতার সমালোচনায় তিনি সাহিত্য পত্রিকায় লেখেন—বহুকাল যাবৎ কাব্যচর্চা করলেও কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের fitness ও proposition জ্ঞান হয়নি। তাঁর অনেক কবিতা অনাবশ্যক দীর্ঘ এবং বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যের তুলনায় অনেক কবিতার ছন্দের গতি অধিক মাত্রায় দ্রুত। ১৩১১ সনের ভাদ্র সংখ্যার সাহিত্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিরুদ্ধে অর্থহীনতার অভিযোগ আনয়ন করেন। সে বৎসরের অগ্রহায়ণ সংখ্যা সাহিত্যে তিনি নৌকাডুবিরও বিরূপ সমালোচনা করেন।

সাহিত্য পত্রিকায় সমাজপতি মশাই শুধুমাত্র রবীন্দ্রসাহিত্যের দোষত্রুটি প্রদর্শনে যে তৎপর ছিলেন তা নয়—রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে ও কার্যে যা তাঁর নিকট প্রশংসনীয় মনে হত তা উদ্‌ঘাটিত করে প্রকৃত গুণগ্রাহিতারও পরিচয় দিতেন। 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশবাসীকে স্বাবলম্বী হবার জন্যে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন সে স্বাদেশিক মনোভাবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ১৩১২ সনের সাহিত্য পত্রিকায় তিনি কবির উদ্দেশে অকুণ্ঠ প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করেন। সকল কার্যে মাতৃভাষা ব্যবহার করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুল আবেদনকেও তিনি সোৎসাহ সমর্থন জানান। 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তবর্তী

ছাত্রদের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকসম্মত প্রণালীতে ব্যাকরণ রচনার যে প্রস্তাব দেন তাও সমাজপতি মশাইয়ের নির্দ্বন্দ্ব সমর্থন লাভ করে। তিনি রবীন্দ্রনাথকেই বাংলা দেশে এ সংগঠনমূলক কাজের যোগ্যতম নায়ক বলে মত প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক 'সোনার বাংলা' গানটি প্রকাশিত হবার পর সমাজপতি মশাই সে সঙ্গীতের উচ্চ প্রসংসা করেন।

কিন্তু রবীন্দ্ররচনায় কোন স্খলন বা দোষত্রুটি দেখলেই সমাজপতি মশাইয়ের সমালোচনার খড়্গ আবার উদ্যত হয়ে উঠত। ১৩১৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় তিনি অভিযোগ করেন সমাসবদ্ধ সংস্কৃতানুসারী শব্দের সঙ্গে চলিত ভাষা ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ যথেচ্ছাচারের পরিচয় দিয়েছেন। অধ্যাত্মভাবাপন্ন কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একই ভাবকে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত করেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। একই বৎসরের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সাহিত্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের ধর্মদেশনার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনয়ন করেন। পরের এক সংখ্যার সাহিত্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম উপদেশকে 'তত্ত্ব ও কবিত্বের বর্ণশঙ্কর' বলে উপহাস করেন। 'মাতৃ অভিষেক' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দেশজননীর যে মূর্তি অঙ্কিত করেন তা কবির খঞ্জ কল্পনার পরিচায়ক বলে সমাজপতি মশাই মন্তব্য করেন। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন অধ্যাত্মবিষয়ক কবিতা প্রচারধর্মিতার প্রভাবে কাব্যধর্মবর্জিত হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। রবীন্দ্র প্রবন্ধের বক্তব্যের জটিলতার প্রতিও তিনি সাহিত্যের একটি সংখ্যায় ইঙ্গিত করেন।

রবীন্দ্রভক্তদের অতিশয়োক্তিকে সমাজপতি মশাই যুক্তির তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে কি ভাবে খণ্ড বিখণ্ড করে দিতেন ১৩১৭ সনে প্রবাসীতে প্রকাশিত বিধুশেখর ভট্টাচার্যের 'ভক্ত ও অপমান' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতি আক্রমণই তার প্রমাণ। এ প্রবন্ধে ভট্টাচার্য মশাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে এত ভক্তিভাবের জাগরণ আর ঘটেনি। সমাজপতি মশাই বৈষ্ণব ও শাক্ত কবিদের ভক্তিবিষয়ক কবিতার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ভট্টাচার্য মশাইয়ের উক্ত মন্তব্যকে নির্লজ্জ স্তাবকতা বলে ধিক্কৃত করেন।

কোন কোন সময় সমাজপতি মশাই ব্যক্তিগত সমালোচনাকেও যে

প্রশ্রয় দিতেন জীবনস্মৃতির প্রতি বক্র ইঙ্গিতই তার প্রমাণ। সাহিত্য পত্রিকায় উক্ত গ্রন্থকে তিনি বিনয়ের ছদ্মবেশে রবীন্দ্রনাথের আত্মম্ভরিতার প্রকাশ বলে অভিহিত করেন। ১৩১৯ সনের 'অর্চনা' পত্রিকায় রবীন্দ্র-বিদ্বেষী অমরেন্দ্রনাথ রায় যখন রবীন্দ্রনাথের রচনা-রীতিকে হেঁয়ালিপূর্ণ বলে আক্রমণ করেন সমাজপতি মশাইও এ অভিযোগকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। উক্ত সংখ্যায় তিনি রাজনীতি সমাজনীতি এমনি কি কাব্যনীতিতেও রবীন্দ্রনাথের মত নিত্য-পরিবর্তনশীল বলে মন্তব্য করেন।

অভিনব সাহিত্যকীর্তির জন্য পাশ্চাত্ত্য জগতে স্বীকৃতি পাবার পর রবীন্দ্রভক্তরা একদিকে যেমন রবীন্দ্রপ্রশস্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন তেমনি আর একশ্রেণীর সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেন। শেষোক্ত শ্রেণীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে সমাজপতির সমালোচনার সুরও ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন 'ইংলণ্ডে সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা' শীর্ষক সংবাদ পরিবেশন করেন, তখন সমাজপতি মশাই ১৩১৯ সনের কার্তিক সংখ্যা সাহিত্যে মন্তব্য করেন—ইংলণ্ডে কবি সংবর্ধনায় সে দেশের কোন কোন সুধী যদি কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব বাস্তবিকই স্বীকার করে থাকেন—তাহলে বুঝতে হবে জগতের সাহিত্য দেউলিয়া হয়ে গেছে। এ ছাড়া তাঁর অভিযোগ হল—যে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে দেশের জনসাধারণের মধ্যে থেকে দেশবাসীর সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করতেন, পাশ্চাত্ত্য জগতে স্বীকৃতি পাবার পর তিনি কতিপয় ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে জনজীবনের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে গেছেন। এ ভাবে সমাজপতি মশাই কখনও রবীন্দ্রসাহিত্য কখনও রবীন্দ্রব্যক্তিত্বকে আক্রমণ করে রবীন্দ্র বিরোধী আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুললেন।

এর পর নতুন নতুন নাটক উপন্যাস গল্প প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে যতই অক্লান্ত উদ্যমের পরিচয় দিতে লাগলেন রবীন্দ্রানুরাগী ও রবীন্দ্রবিরোধী সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের সমালোচনায় ততই সক্রিয় হয়ে উঠলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজা ও রাণী' প্রকাশিত হবার পর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সাহিত্য পত্রিকায় সুকবি

গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী একটি উচ্ছ্বসিত সমালোচনা লিখে এ অভিমত প্রকাশ করেন যে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গীতিকাব্য অপেক্ষা এ নাটকের সাহিত্যোৎকর্ষ অনেক বেশী। কিন্তু নাট্যকলার দিক থেকে নাটকখানির সমালোচনা করে সুসাহিত্যক নিত্যকৃষ্ণ বসু মন্তব্য করেন—রাজা ও রাণীতে চার পাঁচটির বেশী নাট্যগুণান্বিত সংলাপ নেই। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে উহা রচিত তা কৃত্রিম (affected)। নাটকের অধিকাংশ চরিত্র সঙ্গতিহীন এবং পরিণতি অপ্রত্যাশিত ও বিসদৃশ। উক্ত সমালোচকের মতে এ নাটকের সব চাইতে বড় দুর্বলতা হল, নাটক রচনায় আত্মবিলুপ্তি ঘটিয়ে নাট্যকার নাটকীয় চরিত্রকে উজ্জ্বল রেখায় আঁকতে পারেন নি।

রবীন্দ্র সাহিত্যসমালোচনা এ ভাবে উচ্ছ্বসিত আবেগপ্রকাশের স্তরকে অতিক্রম করে ক্রমশঃ বিশ্লেষণধর্মী হয়ে উঠল।

রবীন্দ্র প্রবন্ধও এ সময় সমালোচকের সমীক্ষার বিষয়ে পরিণত হল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এমারেল্ড্ নাট্যশালায় পঠিত রবীন্দ্রনাথের 'মন্ত্রি অভিষেক' প্রবন্ধকে সে বৎসরের 'নব্য ভারত' পত্রিকায় অভিনন্দিত করেন বিশিষ্ট সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। তবে উক্ত প্রবন্ধের মতামত পূর্ববর্তী রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'হাতে কলমে'র সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ ছাড়া উক্ত প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতামতেরও সমালোচনা করেন।

রবীন্দ্র প্রতিভামুগ্ধ প্রিয়নাথ সেন ১৮৯০ সনের সাহিত্য পত্রিকায় 'মানসী' কাব্যের বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় দান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকাব্য প্রতিভাকে বরণ করেন। রবীন্দ্রকাব্যের উৎকর্ষ নির্ণায়ক এরূপ রসগ্রাহী আলোচনা ইতিপূর্বে আর বেশী প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মতে ভাব ও ভাষার অকৃত্রিমতা, অপূর্ব শব্দমন্ত্র, বিস্ময়কর ছন্দোবৈচিত্র্য, দুর্দমনীয় সৌন্দর্যপিপাসা, অপার্থিব বিষাদ, জড়জগতের সঙ্গে চেতনাময় মানবজগতের নিগূঢ় সম্বন্ধ আবিষ্কার, প্রেমানু-ভূতির বিস্তৃতি ও গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে বহির্দৃষ্টির প্রসার—এ গ্রন্থকে কাব্যজগতে সার্থকতার সীমায় উত্তীর্ণ করেছে।

প্রিয়নাথ সেনের উক্ত সমালোচনা একটু উচ্ছ্বাসপূর্ণ হলেও রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার কয়েকটি সূত্র এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এ সমস্ত সূত্র অনুসরণে পরবর্তী বহু সমালোচক রবীন্দ্রপ্রতিভার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন।

অথচ সে যুগের সমালোচক নিত্যকৃষ্ণ বসু ১৩০০ সালের 'মানসী' পত্রিকায় প্রিয়নাথের সমালোচনাকে 'অন্ধ ভক্তের স্তুতিমাত্র' বলে উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে রবীন্দ্র বরণের সঙ্গে রবীন্দ্র বিরোধের এটা চমৎকার দৃষ্টান্ত।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'চিত্রাঙ্গদা'কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রবিরোধী মহলে যে উত্তেজনার ঢেউ উত্থিত হয় রবীন্দ্রনাথের খুব কম রচনাকে নিয়ে সেরূপ হয়েছে। এ কাব্যনাট্যখানি প্রকাশের সতের বৎসর পরে ১৩১৩ (১৯০৯) সনের সাহিত্য পত্রিকায় 'কাব্যে নীতি' নামক প্রবন্ধ লিখে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনয়ন করেন। তাঁর মতে 'চিত্রাঙ্গদা'য় যে সম্ভোগের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা শুধু indecent নয় immoral ও। পাশ্চাত্ত্য সমাজের কোন লেখকও প্রাক্-বিবাহ পর্বের এরূপ দৈহিক মিলনের চিত্র আঁকতে সঙ্কুচিত হতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মতে যে কাব্যের কেন্দ্রীয় ভাব দুর্নীতিগ্রস্ত সে কাব্য রস বা সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে যেমন অক্ষম তেমনি পাঠকমনেও কোন উন্নত ভাব জাগ্রত করতে পারে না। তাঁর মতে চিত্রাঙ্গদায় পাপকে যেরূপ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা হয়েছে তার তুলনা সাহিত্যে বিরল এবং এরূপ দুর্নীতিগ্রস্ত কাব্যকে দগ্ধ করা উচিত।

দ্বিজেন্দ্রলালের নীতিভিত্তিক সাহিত্য সমালোচনার উত্তর দেন প্রিয়নাথ সেন সে বৎসরের কার্তিক সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায়। চিত্রাঙ্গদাকে সৌন্দর্য ও রসসৃষ্টির দিক থেকে বিচার করে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের নীতিঘটিত সমালোচনার যুক্তিকে খণ্ডন করেন। একই বৎসরের সাহিত্য পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সুসাহিত্যিক ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ও চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনার প্রতি তির্যক কটাক্ষ করেন। অতঃপর রবীন্দ্র সমালোচক এডওয়ার্ড টমসন তাঁর *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist* গ্রন্থে চিত্রাঙ্গদাকে lyrical feast বলে অভিনন্দিত করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনার সুদীর্ঘ আঠার বৎসর পরে সাহিত্যাদর্শের দিক থেকে চিত্রাঙ্গদার উল্লেখযোগ্য রসগ্রাহী সমালোচনা করেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরী চিত্রাঙ্গদাকে বিচার করেন মুখ্যত সৌন্দর্যসৃষ্টি ও রসসৃষ্টির দিক থেকে। তাঁর মতে যেহেতু রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা কাব্যে মানুষের যৌবনস্বপ্নকে যাদুকরী ভাষার সাহায্যে অপরূপ রূপজগতে

সার্থকভাবে মুক্তি দিয়েছেন সেহেতু চিত্রাঙ্গদা রসোত্তীর্ণ কাব্য বলে বিবেচিত হবার যোগ্য। তাঁর মতে, 'কাব্যের আবেদন মানুষের moral sense-এর কাছে নয়—spiritual sense-এর কাছে'। এ সাহিত্যাদর্শে আস্থা থাকলে একথা স্বীকার করতেই হয় spiritual হিসেবে যা অমৃত moral হিসেবে তা কখনও বিষ হতে পারে না। যে ব্যক্তি কাব্যকে কামলোক থেকে রূপলোকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি। কাব্য চিত্র ও সঙ্গীত—এ ত্রিধারার সম্মিলনে কবিকল্পনা যখন সার্থক রসসৃষ্টি করে সে মুহূর্তে কাব্য eroticismকে অতিক্রম করে—যেমন করেছিল কালিদাসের মেঘদূত ও কুমারসম্ভব কাব্য। লেখকের পরিমিতিবোধ ও কাব্যের পরিচ্ছন্ন আয়তনও চিত্রাঙ্গদার অভূতপূর্ব সার্থকতার মূলে।

রবীন্দ্রবিরোধিতা ও রবীন্দ্রবরণের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা সমালোচনা সাহিত্য কিভাবে নতুন নতুন আদর্শ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল উক্ত সমালোচনাগুলিই তার প্রমাণ। চিত্রাঙ্গদার সমালোচনাকে কেন্দ্র করে কোন কোন সমালোচক সাহিত্যে সনাতন নীতির মাপকাঠিকে অতিক্রম করে আর্টসর্বস্ব মতবাদের দিকে ঝুঁকতে শুরু করল।

এরপর রবীন্দ্র কাব্যের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন অভিযান চালনা করেন এক শ্রেণীর রবীন্দ্র বিরোধী সমালোচক। ১৩০০ (১৮৯৩) সনে সাধনা পত্রিকায় 'সোনার তরী' কবিতা প্রকাশের তের বৎসর পরে ১৩১৩ সনের কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে উক্ত কবিতা সম্পর্কে কবিকল্পনার অসঙ্গতির অভিযোগ আনয়ন করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সমালোচক নিত্যকৃষ্ণ বসু সোনার তরীকে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য কবিতা বলে সমালোচনা করেন। অপর পক্ষে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক যদুনাথ সরকার ও রমাপ্রসাদ চন্দ সোনার তরী কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রপ্রতিভার অভিনব বিকাশকে অভ্যর্থনা জানান। রবীন্দ্রানুরাগী মোহিতচন্দ্র সেনও চমৎকার রসগ্রাহী ব্যাখ্যার সাহায্যে সোনার তরী কবিতাকে অভিনন্দিত করেন।

সোনার তরী প্রকাশের পর বিচিত্র ভাব ও রূপধর্মী রচনার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ কাব্যজগতে নতুন নতুন বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর লেখক ও সমালোচকদের মধ্যে জেগে উঠছে রবীন্দ্র

বিরোধের উত্তেজনা ও রবীন্দ্রবরণের আগ্রহ। ১৩০২ (১৮৯৫) সনে চিত্রা কাব্য প্রকাশিত হবার পর ১৩০৩ (১৮৯৬) সনের 'দাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্র-প্রতিভামুগ্ধ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উক্ত কবিতা সম্পর্কে যে দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন তাতে সমালোচকের সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টি অপেক্ষা মুগ্ধ ভক্তের পূজারতি প্রকাশ পেল বেশী। ১৩০৫ সনের প্রদীপ পত্রিকায় উর্বশী কবিতার সৌন্দর্য বিশ্লেষণে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সমালোচকের সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টির পরিচয় দিলেন। তাঁর মতে এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের রূপ-পরিকল্পনা অমূর্ত ও সূক্ষ্ম ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে বৎসর 'চৈতালি' কাব্য প্রকাশের পর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রবীন্দ্র কবিপ্রতিভার সীমাবদ্ধতা প্রদর্শন করে 'দাসী' পত্রিকায় একটি বিরূপ সমালোচনা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান অভিযোগ, রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা অলংকৃত—যা গভীরতম ভাব প্রকাশের অনুপযোগী। রবীন্দ্রানুরাগী রমনীমোহন ঘোষ রবীন্দ্রনাথের মতামত উদ্ধার করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যুক্তাক্ষরবহুল অলংকৃত ভাষা ভাল কবিতার অন্যতম লক্ষণ। হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষের দ্বিতীয় অভিযোগ—রবীন্দ্রকাব্যে ইংরেজী কাব্যের বৈচিত্র্য ও সজীবতা নেই—সে কাব্য বহুস্থানে বিষাদভারানত ও করুণ—নিতান্ত রুগ্ন ও অশ্রুজল প্লাবিত। রমনীমোহন ঘোষ এ অভিযোগ আংশিক ভাবে স্বীকার করেও বলেন, 'এবার ফিরাও মোরে'-র মত কবিতায় সতেজ সুরের সন্ধান পাওয়া যায়। হেমেন্দ্রপ্রসাদের তৃতীয় অভিযোগ—রবীন্দ্রকবিতায় ইংরেজী কবিতার সংহতি নেই। তা সহজে পাঠক অন্তরে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। রমনীমোহন ঘোষ এ অভিযোগের উত্তরে বলেন, বাংলা কবিতার এ দুর্বলতা বাঙালী কবির অক্ষমতাজনিত নয়। বাংলা ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণের প্রভেদ সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত হয়নি বলেই বাঙালী কবিরা 'ভাষার খর্বতা অত্যুক্তির দ্বারা' পূরণ করে নেবার চেষ্টা করেন। চৈতালি কাব্যের কোন কোন কবিতায় এত ঘন সংসক্তি আছে যে সেগুলি 'যেন বাস্তবিকই লঘু বাণের মত ক্ষিপ্র গতিতে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বিদ্ধ হইতে থাকে।' তাঁর মতে চৈতালি কাব্যের অধিকাংশ কবিতা ভাষার অনাড়ম্বর প্রকাশে সহজ হৃদয় সংবেদ্য এবং নিটোল মুক্তার মত উজ্জ্বল। ১৩০৬ (১৮৯৯) সনে 'কথা' কাব্য প্রকাশিত হবার পর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এ কাব্যখানির

আদর্শচেতনা ব্যাখ্যা করে যে উৎকৃষ্ট সমালোচনা করেন ইতিপূর্বে এ ধরনের সমালোচনা দেখা যায় নি। ১৩০৭ (১৯০০) সনে 'ক্ষণিকা' কাব্য প্রকাশের পর বঙ্কিম যুগের বিশিষ্ট সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু কাব্য খানিকে অভিনন্দিত করে রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লেখেন তাতে কবি খুবই উৎসাহিত হন। কোন কোন সমালোচক ক্ষণিকা সম্পর্কে এমন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এ কাব্যের ভাষা সুন্দর হলেও গভীর অর্থযুক্ত নয়। রবীন্দ্রানুরাগী সতীশচন্দ্র রায় এ মত খণ্ডন করে বলেন, ক্ষণিকায় রবীন্দ্রনাথের লিরিক প্রতিভার চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে। এ কাব্যের ভাষায় পদগুলি স্বল্পাক্ষর হওয়ায় উহার ছন্দ এত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ভাবপ্রকাশের সম্পূর্ণ অনুকূল। তাঁর মতে ক্ষণিকার মূল সুরও শান্তি ও ব্যাপ্তি—অসীমে প্রসার। কবির ব্যক্তিগত আনন্দ এ কাব্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সরস সুন্দর বিস্তার লাভ করেছে। চৈতালি কাব্যে কবি-অনুভূত শান্তির মধ্যে রসনিবিড়তা নেই। ক্ষণিকা কাব্যে কবি যে শান্তি অনুভব করেছেন তা শুধুমাত্র সহজ নয়—অতি নিবিড় রসরসিকতার স্পর্শে উজ্জ্বল।

কবি প্রতিভার গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বকবি হওয়ার যোগ্যতা আছে—এ ভবিষ্যদ্বাণী করেন সর্বপ্রথমে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'সোফিয়া' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি রবীন্দ্রনাথকে World Poet of Bengal বলে সংবর্ধিত করেন। পরবর্তী বৎসরের (১৯০১) The Twentieth Century পত্রিকায় তিনি সে বৎসরে প্রকাশিত নৈবেদ্যের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সশ্রদ্ধ রবীন্দ্র বরণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র প্রতিভা ক্রমশঃ দেশব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করে।

রবীন্দ্র বিরোধী মহলে রবীন্দ্র কাব্য যখন অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বলে নিন্দিত তখন রবীন্দ্র কাব্যকে ভাব ও বিষয়বৈচিত্র্য অনুযায়ী বিন্যস্ত করে সম্পাদনা করেন ১৩০০ (১৯০৩) সনে স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন। এতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে রবীন্দ্র কাব্যজগতে প্রবেশের বাধা বহুলাংশে দূরীভূত হয়েছিল। স্বীয় সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে কৃত্রিমতার অভিযোগকে অস্বীকার করে বলেন, রবীন্দ্রকাব্য সুগভীর ভাবপ্রত্যয়ের উপর

প্রতিষ্ঠিত বলে প্রকৃতির সঙ্গে কবিঅন্তরের যোগ অতি নিবিড় ও অকৃত্রিম। রবীন্দ্রনাথ অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের পূজারী। এ কারণে তাঁর কাব্যে স্থূল বস্তুধর্ম অপেক্ষা ভাব সংকেতই প্রাধান্য পেয়েছে। যুগ যুগান্তর ও লোক লোকান্তরের সঙ্গে অন্তরের যোগে রবীন্দ্রকাব্য অনন্যসাধারণ ব্যাপ্তি লাভ করেছে। জীবনের গভীর ভাবের মত লঘু ভাবের অনুভবও রবীন্দ্রকাব্যকে ব্যাপ্তি দিয়েছে। সর্বোপরি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছের মধ্যে বৃহতের উপলব্ধি রবীন্দ্র কাব্যের গৌরবের মূলে।

যে সমস্ত রবীন্দ্রানুরাগী এ সময় রবীন্দ্রকাব্যপ্রতিভাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করে নিয়ে পাঠক সমাজে একান্ত নিষ্ঠায় প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন তাঁদের অন্যতম।

ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ পরবর্তী কালে রবীন্দ্র বিরোধিতায় মুখর হয়ে উঠলেও রবীন্দ্রকাব্যের তিনি যে বিশিষ্ট অনুরাগী ছিলেন ১৩২০ (১৯১৩) সনের সাহিত্যে প্রকাশিত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যরহস্য' নামক প্রবন্ধই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন, সীমার মধ্যে অসীম, রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধিই রবীন্দ্রকাব্যকে মহান পরিণতি দান করেছে। রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্নিহিত ভাববিশ্লেষণে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তিনি যে সূত্র নির্দেশ করেছিলেন তা পরবর্তী সমালোচকদের পথনির্দেশ করেছে।

১৩১৮ (১৯১১) সনে 'অচলায়তন' প্রকাশিত হবার পর কোন কোন রবীন্দ্র সমালোচক ধর্মীয় চেতনার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন। তাঁদের অভিযোগ, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। সেজন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি হিন্দুধর্মের বহুযুগ প্রচলিত আচার বিচার ও মন্ত্রোচ্চারণকে বিদ্রূপ ও উপহাস করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ সমস্ত অসাহিত্যিক সমালোচনার উত্তর দেননি। কিন্তু বিদগ্ধ সাহিত্যিক ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় যখন যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেন যে হিন্দুর আচার বিচার ও মন্ত্রোচ্চারণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আক্রমণ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত তখন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যধর্মের দিক থেকে ললিতকুমারের অভিযোগের উত্তর দেন। তিনি বলেন, অচলায়তনে পিপাসার্ত মানবাত্মার ক্রন্দনকে রূপ দিতে গিয়েই হিন্দুর বহুকালীন আচারসর্বস্বতাকে আঘাত

করা হয়েছে। এ নাটকের আবেদন সার্বজনীন। এ ছাড়া অচলায়তনে তিনি শুধু সমাজকে ভাঙবার কথাই বলেননি—গড়বার কথাও বলেছেন। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের এ সৃজনধর্মী কল্পনার মর্ম গ্রহণ করতে না পেরে রবীন্দ্র সমালোচক মহলে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল।

নব্যপন্থী গল্প উপন্যাসের জন্যও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথকে কম বিরোধিতা সহ্য করতে হয়নি। সাহিত্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১৩০৯ (১৯০২) সনে প্রকাশিত 'চোখের বালি'র সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে 'ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ, সাহিত্যনীতির শৈথিল্য, মৌলিকতার অভাব এবং অনুকরণের দীনতা'র অভিযোগ আনয়ন করেন। চোখের বালি ও নষ্টনীড়ে রবীন্দ্রনাথ দুর্নীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন—এরূপ অভিযোগও তাঁর সমালোচনায় প্রাধান্য পায়। তাঁরই অনুরোধে যতীন্দ্রমোহন সিংহ ১৩২৭ (১৯১০) সনে 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক প্রবন্ধ লিখে চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে উপন্যাস এবং নষ্টনীড় গল্পের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন। এ ভাবে একশ্রেণীর পাঠক ও সমালোচক মহলে উত্তেজনার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। এ উত্তাপ স্তিমিত হয় ১৩৩৮ সনে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র যখন চোখের বালি উপন্যাসকে সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক বলে অভিনন্দিত করেন।

ভাষা সম্পর্কীয় নতুন নতুন মতামতের জন্যও রবীন্দ্রনাথকে কম বিরোধিতা সহ্য করতে হয়নি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভাষাতত্ত্ব শব্দতত্ত্ব ব্যাকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৩১৮ (১৯১১) সনে সাহিত্য পত্রিকায় ভাষাতত্ত্ববিদ্ বিজয়চন্দ্র মজুমদার ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নতুন মতবাদকে আক্রমণ করে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সে প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের ধ্বনি অনুযায়ী বানান প্রচলিত করবার প্রয়াসকে নিন্দা করেন। শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত কল্পনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। বিজয়চন্দ্রের সর্বশেষ অভিযোগ হল—রবীন্দ্রনাথ আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানের মূলসূত্রের সঙ্গে সম্যক পরিচিত না হয়ে বাংলা ভাষা অনুশীলনে অনধিকারচর্চার পরিচয় দিয়েছেন। ধ্বনিসম্মত বানান পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করে তিনি

লিখেছিলেন—'রোবিন্দ্রোবাবু জোদি আগ্‌গাঁ দ-a-ন (than) তা হোলে এই নোতুন বানান গং-আয় সমর্পোন কোরি।'

অথচ পরবর্তীকালে বহুভাষাবিদ্‌ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাশিল্পীদের অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন। এ ছাড়া সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের মত বিদগ্ধ ব্যক্তিগণও রবীন্দ্রনাথের শব্দ ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যাঁরা অস্পষ্টতার অভিযোগ এনেছিলেন ১৩১৬ (১৯১০) ও ১৩১৮ (১৯১২) সনে রাজা ও ডাকঘর প্রকাশের পর তাঁরা আরো বিভ্রান্ত হলেন। রবীন্দ্রভাবপ্রবুদ্ধ সমালোচক অজিতচন্দ্র চক্রবর্তী ভারতী পত্রিকায় এ বিগ্রহরূপী (symbolical) নাটকগুলির ভাবসৌন্দর্য ব্যাখ্যা করে পাঠকমনের সঙ্গে এ শ্রেণীর নাটকের পরিচয় সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

সুদীর্ঘ রবীন্দ্র বিরোধিতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধের অধ্যায়টি খুবই উল্লেখযোগ্য। কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে দ্বিজেন্দ্রলালের কোন কোন কাব্যের (আর্যগাথা, আষাঢ়ে, মন্দ্র) অনুকূল সমালোচনা প্রকাশ করে দ্বিজেন্দ্রলালকে সাহিত্যজগতে পরিচিত করতে প্রয়াসী হন। দ্বিজেন্দ্রলালও 'গোরা'র উচ্ছ্বসিত সমালোচনা প্রকাশ করে রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় দেন। এতে দুই প্রতিভাধর লেখকের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন 'বঙ্গভাষা ও লেখক' গ্রন্থে স্বীয় কাব্যজীবনের প্রেরণা হিসেবে ঐশী শক্তির কথা উল্লেখ করেন দ্বিজেন্দ্রলাল তখন দুর্নীতির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রনাথ এ সমস্ত অভিযোগের কোন উত্তর দেননি। কিন্তু রবীন্দ্রভক্ত কোন কোন লেখক (যেমন দ্বিজেন বাগচী, যতীন বাগচী, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি) উগ্র ও অসহিষ্ণু ভাষায় প্রবন্ধ লিখে উক্ত অভিযোগের উত্তর দেন। রবীন্দ্র সমর্থক ও রবীন্দ্রবিরোধী দুই দলের মধ্যে এভাবে রবীন্দ্রবিরোধ ও রবীন্দ্র বরণের

পালাটি সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করল। সাহিত্যে আদর্শগত মতবিরোধ নিয়ে দ্বন্দ্বের এত উগ্রতা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। দ্বিজেন্দ্রলালের এ অসহিষ্ণু রবীন্দ্রবিরোধিতার পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুর পরিবারের প্রতি হীন আক্রমণাত্মক 'আনন্দ বিদায়' নাটকের রচনা ও অভিনয়—যে অভিনয়ের ফলে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র অনুরাগীদের হাতে লাঞ্ছিত পর্যন্ত হয়েছিলেন। এতে রবীন্দ্রনাথের অবশ্য কোন হাত ছিল না। এ নাটক অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিদেশে। .

দ্বিজেন্দ্রলালের এ রবীন্দ্র বিরোধিতায় আতিশয্য ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এ রবীন্দ্রবিরোধিতার সবটাই ব্যক্তিগত আক্রোশপ্রসূত বললে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি অবিচার করা হয়। দেশাত্মবোধক নাটক প্রতাপাদিত্য (১৩১২) রচনা করে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন দেশবাসী কর্তৃক প্রবলভাবে অভিনন্দিত হন-রবীন্দ্রনাথ তখন এ নাটক সম্পর্কে নীরব ছিলেন। এতে বন্ধু রবীন্দ্রনাথের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্তবিমুখতা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল বিরোধের এটাই মূল উৎস মনে করা ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল কত সশ্রদ্ধ ছিলেন ১৩১২ সনে বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষে সভাপতি নির্বাচন প্রশ্নে দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে অকুণ্ঠ সমর্থনের ভিতর তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ১৩১২ (১৯০৬) সন থেকে কাব্যে অস্পষ্টতা বিষয়ক বিতর্কে তিনি প্রকাশ্যে রবীন্দ্রবিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। সাহিত্যের আদর্শের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষতার সমর্থক। রবীন্দ্রকাব্যের অস্পষ্টতাকে নিন্দা করে এবং কাব্যে স্পষ্টতা প্রাঞ্জলতা প্রভৃতির সমর্থনে তিনি সাহিত্যে ও বঙ্গদর্শনে কয়েকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রকাব্যের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রানুরাগী কোন কোন লেখক রবীন্দ্রকাব্যের অস্পষ্ট সৌন্দর্যের সমর্থনে প্রবন্ধ রচনা করবার পর দ্বিজেন্দ্রলালের ক্রোধ আরো বেশী উদ্দীপ্ত হয়। তখন তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের তথাকথিত দুর্নীতির আদর্শকে আক্রমণ করে রবীন্দ্রবিরোধিতার পরিচয় দিতে শুরু করেন। কাব্যে অস্পষ্টতা ও দুর্নীতি বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের এ তীব্র রবীন্দ্র-বিরোধিতা সে যুগের প্রাচীনপন্থী সাহিত্যাদর্শেরই প্রত্যয়জনিত। এতে দ্বিজেন্দ্রলালকে দোষ দেওয়া যায় না। রবীন্দ্র সাহিত্যের সূক্ষ্ম ও রোমান্টিক সৌন্দর্য

উপলব্ধি ও উপভোগ করবার মত ক্ষমতা তখনও দেশের মধ্যে প্রসার লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের এ অনমনীয় মনোভাবের ভিতর সে যুগের সাহিত্যসংস্কারেরই একটি সুস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। সতীশচন্দ্র রায়, প্রিয়নাথ সেন, অজিত চক্রবর্তী, মোহিত সেন প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র অঙ্গুলিগন্য সাহিত্যিক সে যুগের রবীন্দ্র সাহিত্যের সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন ও উপভোগ করতে পেরেছিলেন। তাঁদের রবীন্দ্র সাহিত্য বিশ্লেষণ ও রবীন্দ্রকাব্য উপভোগের মধ্য দিয়ে বাঙালীর সাহিত্যরুচি ক্রমশঃ একটি নতুন যুগের অভিমুখী হচ্ছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্রবিরোধিতার সমকালে আর একজন মনীষী বাঙালীর দুর্ধর্ষ রবীন্দ্রবিরোধিতা রবীন্দ্র সমালোচক মহলে উত্তপ্ত উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল ১৩১৮ চৈত্রসংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'চরিত চিত্র' নামক প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে নির্মম ভাবে আক্রমণ করলেন। বিপিনচন্দ্রের রবীন্দ্র সমালোচনার লক্ষ্য রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে রবীন্দ্রজীবনই ছিল বেশী। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে তিনিই সর্বপ্রথম বস্তুতন্ত্রহীনতার অভিযোগ আনয়ন করেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, ধর্মবোধ, সমাজসংস্কার, দেশসেবা—সব কিছুই বস্তুতন্ত্রহীন। আজীবন ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হয়ে তিনি জীবন, সাহিত্য, ধর্ম, দেশ, এবং বিশ্বমানব প্রভৃতিকে বাস্তবস্বরূপে প্রত্যক্ষ করবার দৃষ্টি অর্জন করতে পারেন নি—সব কিছুকে দেখেছেন ভাবময় মায়ার দৃষ্টিতে। রবীন্দ্রদৃষ্টির ও অনুভূতির এ কৃত্রিমতা রবীন্দ্রজীবনের মত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিকর্মকেও একটি বিরাট ফাঁকিতে পরিণত করেছে। বিপিনচন্দ্রের রবীন্দ্র বিরোধী আন্দোলনকে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় আরও জোরদার করে তোলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্রের বস্তুতন্ত্রহীনতার অভিযোগ রবীন্দ্রবিরোধী মহলকে বহুকাল পর্যন্ত নতুন নতুন অভিযোগ আনতে উৎসাহিত করেছে। পরবর্তীকালে অতি আধুনিক নামধারী সাহিত্যিক সমাজ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে বাস্তবনিষ্ঠার অভাবের অভিযোগ এনে বাংলা সাহিত্যে তুমুল কোলাহল শুরু করেন, তার উৎসে ছিল বিপিনচন্দ্রের এ বস্তুতন্ত্রহীনতার আন্দোলন। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্রের এ

বস্তুতন্ত্রহীনতার আন্দোলনকে সমর্থন ও বেগবান করে তোলেন এ সময় তরুণ অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল ও বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্যক্তিগত জীবন সমালোচনার ভিত্তিতে যে রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলন শুরু হল তার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬০ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন :

> যেহেতু রবীন্দ্রনাথ 'ব্যর্থ রাজনীতির উচ্ছ্বাসমার্গ ত্যাগ করিয়া সংগঠনপন্থী, বর্ণাশ্রম ধর্মের জয়গান না গাহিয়া বৃহত্তর মনুষ্যত্বের বাণী প্রচারক, স্বাজাত্যের মিথ্যা গৌরব রটনায় তাঁর লেখনী পরাঙ্মুখ, লৌকিক হিন্দুধর্মকে প্রবন্ধ নাটকাদি রচনা দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত করেন, এখন তিনি সংস্কারহীন, হিন্দুধর্মের সবই সত্য, হিন্দুধর্মের সবই তত্ত্ব—বলিয়া লোক সাধারণকে মোহাচ্ছন্ন করিতে তিনি একেবারেই নারাজ। এই সব কারণে তাঁহার বিরোধী দলের উদ্ভব।'

বিপিনচন্দ্রের এ প্রচণ্ড রবীন্দ্র বিরোধিতার মুখে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্ম ও দেশাত্মবোধকে সমর্থন জানিয়ে কবির প্রাণোদ্যমকে যাঁরা সতেজ রেখেছিলেন রবীন্দ্রানুরাগী অজিত চক্রবর্তী তাঁদের অন্যতম। 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রহীন' [প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৯ (১৯১২)] শীর্ষক প্রবন্ধে নানা যুক্তির অবতারণার সাহায্যে তিনি বিপিনচন্দ্রের মতকে খণ্ডন করেন। এ ছাড়া এ সময় রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য দেশে যে সম্মান লাভ করেছিলেন স্বেচ্ছায় তার প্রচারের ভার গ্রহণ করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত প্রবাসী ও মডার্ণ রিভ্যু পত্রদ্বয়ে। রবীন্দ্রানুরাগী সি. এফ. এন্‌ড্রুসও Civil and Military Gazette-এ গীতাঞ্জলির বিস্তৃত সমালোচনা লিখে এবং সিমলায় রবীন্দ্র সম্পর্কীয় বক্তৃতায় কবিকে Poet-Laureate of Asia বলে অভিহিত করে রবীন্দ্রপ্রতিভার গৌরবকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেন।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্র বিরোধীদের মধ্যে চলছে রবীন্দ্র প্রতিভাকে হেয় প্রতিপন্ন করবার নানা ধরনের চেষ্টা, আবার রবীন্দ্র অনুরাগীদের মধ্যে চলেছে কবির প্রতিভাকে দেশের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি জানাবার জন্য উদ্‌যোগ আয়োজন। এ উদ্‌যোগের পরিণতি রবীন্দ্রনাথের

পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় সার্বজনীন সংবর্ধনা জ্ঞাপন। এ সংবর্ধনার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। সকল প্রকার বিরোধের মুখে রবীন্দ্র প্রতিভার গৌরবকে দেশবাসীর সামনে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যতীন্দ্রমোহনের উদ্যম ছিল নিরবচ্ছিন্ন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথকে নির্দয়ভাবে আক্রমণ করেন যতীন্দ্রমোহন তখন রবীন্দ্রনাথের পক্ষাবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তব্যের উত্তর দেন। কবির মহাপ্রয়াণের পর ১৩৫৪ (১৯৪৭) সনে যতীন্দ্রমোহন 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগ সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের মহিমা ব্যাখ্যা করেন। এ গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ ও সমালোচনা সাহিত্য' অংশে তিনি মন্তব্য করেন—শ্রদ্ধাদৃষ্টি ও সৃজনধর্মিতা রবীন্দ্র সমালোচনাকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মূল্যসমৃদ্ধ করেছে।

কিন্তু দেশবাসীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পরও রবীন্দ্র বিরোধিতা বন্ধ হল না। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ পাবার পর রবীন্দ্র বিরোধী মহলে বিমিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। কবির ব্যক্তিগত সমালোচনায় যারা এতদিন পঞ্চমুখ ছিলেন তাদের নিন্দার বেগ ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে এল। কিন্তু এ সময়ে একটি ঘটনা রবীন্দ্র বিরোধিতাকে নতুন করে জাগ্রত করল। সাহিত্য জগতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাবার পর বহু ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অভ্যর্থিত করেন। এঁদের মধ্যে এমন লোক ছিলেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কোন রচনাই হয়ত কোনদিন পড়েননি। নোবেল প্রাইজের খবর পাবার কয়েকদিন পর (২৩শে নবেম্বর, ১৯১৩) কলকাতা থেকে ৫০০ জন জ্ঞানীগুণীর এক প্রতিনিধিদল রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধিত করবার জন্য শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত হন। বহুকাল পর্যন্ত দেশবাসীর বিরূপ সমালোচনার আঘাতে রবীন্দ্রমন তখন তিক্ত ও বিরক্ত। সেজন্যে দেশবাসীর এ সংবর্ধনাকে তিনি সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁর মনে হল বিদেশে সম্মান পাবার পর দেশবাসীরা তাঁর অর্জিত সম্মানকেই সম্মান দেবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে।

বন্ধু রোটেনস্টাইনের নিকট ১৯১৩ সনে ১৮ই নভেম্বর তারিখের চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

I cannot tell you how tired I am of all these shouting,

the stupendous amount of its unreality being something appalling. Really these people honour the honour in me and not myself.

অভিমানের বশবর্তী হয়ে তিনি এ সংবর্ধনাকে দেশবাসীর হৃদয়ের অকৃত্রিম অভিব্যক্তি বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। সে সংবর্ধনা সভায় তিনি যে প্রত্যভিভাষণ দেন তাতে তাঁর এ তিক্ত মনোভাব উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় কলকাতার সাহিত্যসমাজে রবীন্দ্রবিরোধিতা আরো তীব্র আকার ধারণ করল। রবীন্দ্রবিরোধীদের মধ্যে একমাত্র বিপিনচন্দ্র পালই রবীন্দ্রনাথের এ তিক্ত মনোভাবকে স্বাভাবিক বলে বর্ণনা করেন।

এ পর্যায়ে যাঁরা রবীন্দ্রবিরোধিতার পরিচয় দেন তাঁরা অনেকেই দেশের মধ্যে জ্ঞানীগুণী ও সাহিত্যবোদ্ধা বলে স্বীকৃত, আবার কেউ কেউ সমকালীন শ্রেষ্ঠ সৃজনধর্মী সাহিত্যকর্মী। তাঁদের রবীন্দ্রসমালোচনাও পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যয়জাত। অন্ধ সংস্কারের মূঢ়তাও যে কোন কোন সমালোচককে রবীন্দ্রবিরোধী সমালোচনায় প্রণোদিত করেনি—এমন বলা যায় না। এ রবীন্দ্রবিরোধীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শশাঙ্কমোহন সেন, যতীন্দ্রমোহন সিংহ, দীনেশচন্দ্র সেন, চিত্তরঞ্জন দাস, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি। আরো কিছুকাল পরে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি যোগ দেওয়ায় রবীন্দ্র বিরোধী আন্দোলন খুব শক্তি সঞ্চয় করে। সাহিত্য, নারায়ণ, মানসী, অর্চনা এবং মফস্বলের কোন কোন পত্র পত্রিকাও এ সময় রবীন্দ্র বিদূষণের প্রধান ঘাঁটি রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রবল রবীন্দ্রবিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন প্রতিভাকে সাগ্রহে বরণ করে নেবার প্রবৃত্তি দেখা দিল আর এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের মধ্যে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, অমল হোম, করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী প্রভৃতি কবি লেখক সাংবাদিক ও সাহিত্যিকও এ সময়ে বিভিন্ন রচনা ও আলোচনার

সাহায্যে রবীন্দ্রসাহিত্যকে দেশের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হন। রবীন্দ্রবিরোধীরা যে শুধু ঝাঁজালো সমালোচনা ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সাহায্যে সাহিত্যের আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুলতেন তা নয়, কোন কোন সময় রবীন্দ্র অনুরাগীরাও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে যে সমস্ত মন্তব্য ও সমালোচনা করতেন তাও সুরুচির সীমাকে লঙ্ঘন করত।

কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেনের অভিযোগ—রবীন্দ্রনাথের অলংকৃত ভাষা বহুস্থলে কবির ভাবকে 'আবৃত ও আচ্ছন্ন' করেছে। নাগরিক বৈদগ্ধ্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কবি বহুস্থলে স্বভাবের সীমাকে অতিক্রম করেছেন। ক্ষুদ্র বস্তুকে আদর্শায়িত দৃষ্টিতে দেখবার ফলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রচনাপ্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। নাটকের বহিরঙ্গের দিকে অতিরিক্ত মনোযোগী হওয়ায় রবীন্দ্রনাটক জীবনধর্মী হয়ে উঠেনি। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা মৌলিকতাহীন—অদ্বৈতবেদান্ত ও উপনিষদের ব্যঙ্গ মাত্র। রবীন্দ্রনাটককে তিনি কল্পনাপ্রবণ কবির খেয়ালীপনার পরিচয় বলে অভিহিত করেন।

'সাহিত্য' পত্রের পরে যে পত্রিকাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রবিরোধিতা প্রবল আকার ধারণ করে সে হল চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত সনাতনপন্থীদের 'নারায়ণ'। চিত্তরঞ্জন দাসের মতে বাঙালীর যে খাঁটি প্রাণধর্ম বৈষ্ণব কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রকাব্যে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না। রবীন্দ্রকাব্য মুখ্যত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-প্রভাবিত। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ যে বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের লোক সে ধর্মও খ্রীষ্টধর্ম-প্রভাবিত। তাঁর বিশ্বপ্রেম ও মানবধর্মের পশ্চাতেও কোন গভীর উপলব্ধি নেই—সমস্তই কৃত্রিম। ভাব ও উপলব্ধির জগতে এ কৃত্রিমতাকে ঢাকবার চেষ্টা করেছেন তিনি অলংকৃত ভাষার সাহায্যে।

পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরপূর্ণ রবীন্দ্রসমালোচনার এ সূত্রগুলি তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ করল রবীন্দ্রবিরোধীদের। পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি সনাতনপন্থী সমালোচক উক্ত সূত্র ধরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় রবীন্দ্রবিরোধিতা প্রচার করতে লাগলেন। এ উত্তপ্ত রবীন্দ্রবিরোধী আবহাওয়ায় কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে

আক্রমণ করতেও ছাড়লেন না। স্বদেশী আন্দোলন যখন বিপ্লব ও সন্ত্রাস-বাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণতি লাভ করে তখন রবীন্দ্রনাথ নেহাৎ কাপুরুষতা বশেই শান্তিনিকেতনে আশ্রয় নিয়েছেন, ইংরেজ সরকারের আনুকুল্যে তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন—এ ধরণের মুখরোচক ব্যক্তিগত সমালোচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রবিরোধিতা একটি কুৎসিত আকার ধারণ করল। নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পর সংবর্ধনা সভায় কবি দেশবাসীর প্রতি যে তিক্ত মনোভাবের পরিচয় দেন এ সমস্ত ব্যক্তিগত সমালোচনা তারই উত্তর বলে অনেকের ধারণা। রবীন্দ্রনাথ এ সমস্ত ইতর সমালোচনার কোন উত্তর দেননি। তবে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তিনি বাঙালীর স্বাদেশিকতার যে মুখোস খুলে দেন—তা এ ধরণের রবীন্দ্রসমালোচনার উত্তর বলেই কোন কোন রবীন্দ্রজীবনীকারের বিশ্বাস (দ্রষ্টব্য: কৃষ্ণ কৃপালনি, Rabindranath Tagore : a Biography)।

ইতিমধ্যে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্রে'র চলিত ভাষাকে সমর্থন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আবার নতুন করে সমালোচকদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হল। পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় 'নায়ক' পত্রের একটি প্রবন্ধে মত প্রকাশ করলেন, বিদ্যাসাগর যে গদ্যরীতির কাঠামো নির্মাণ করে গেছেন বঙ্কিমের মত প্রতিভাধর সাহিত্যিকও সে কাঠামো পরিবর্তন করতে সাহসী হননি। রবীন্দ্রনাথের এ সুদৃঢ় ভাষারীতি পরিবর্তন-প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় 'রাণাঘাট বার্তাবহে' 'সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার' নামক প্রবন্ধ লিখে এ কথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র সুষ্ঠু ও সাধু গদ্যরীতিকে পরিত্যাগ করে ভাষা ব্যবহারে চটুল ও মজলিসী রীতিকে আশ্রয় করেছেন—শুধুমাত্র জামাতৃ-প্রীতির বশে। রবীন্দ্রনাথের নব্যপন্থী ভাব ও ভাষার বিরুদ্ধে এ আন্দোলন ক্রমশ মফস্বলেও ছড়িয়ে পড়ে। '২৪ পরগণা বার্তাবহ' নামক সাপ্তাহিক পত্রে জনৈক অকিঞ্চন দাস প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন, কি ভাবের জগতে কি ভাষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কোন সময় বিদেশী কোন সময় স্বদেশী সাহিত্যের অনুকরণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর কবিতা আন্তরিকতাহীন ও বাহ্যাড়ম্বরময়। ভাষারীতিতেও তিনি জনসাধারণের বোধগম্যতার প্রতি লক্ষ্য না রেখে সর্বদা নিজের খেয়ালখুশীমত ভাষা ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের যে তিনখানি উপন্যাস সমালোচক মহলে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা হল ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ ও চার অধ্যায়। ১৩২৭ সনের সাহিত্য পত্রিকায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে ঘরে বাইরে উপন্যাসকে আক্রমণ করেন। প্রথমত, এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় ভাবধারাকে উপেক্ষা করে বিদেশী ভাবের আমদানী করেছেন। দ্বিতীয়ত, অবাস্তব কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় এবং পাশ্চাত্ত্য শিল্পাদর্শের অনুবর্তী হওয়ায় উপন্যাসশিল্প হিসেবেও ঘরে বাইরে ব্যর্থ হয়েছে। তৃতীয়ত, এ উপন্যাসে মানবমনের কুৎসিৎ দিকটাকে উদ্‌ঘাটিত করে লেখক সমাজের নৈতিক আবহাওয়াকে কলুষিত করেছেন।

ঘরে বাইরে উপন্যাসকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র বিরোধিতা মফস্বল সহরে পর্যন্ত কিভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ে 'বরিশাল হিতৈষী'তে প্রকাশিত 'নভেলে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধই তার প্রমাণ। উক্ত প্রবন্ধে লেখক ঘরে বাইরে উপন্যাসকে 'পরস্ত্রী মজাইবার' একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর স্বাদেশিক প্রয়াসকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। অথচ নিজে তিনি স্বদেশ সেবার দুঃখময় পথকে পরিত্যাগ করে যথেষ্ট অর্থসম্পত্তির মালিক হয়েছেন। এমনকি ইংরেজ প্রদত্ত 'স্যর' উপাধি গ্রহণ করতেও কুণ্ঠিত হননি। উক্ত লেখক আরো প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন, নৌকাডুবি, চোখের বালি, ঘরে বাইরে প্রভৃতি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সেও নিজের বিকৃতরুচির পরিচয় দিয়েছেন। উক্ত সমালোচক চতুরঙ্গকে ব্যাভিচারের চিত্র বলে সমালোচনা করেন।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের দিকে কোন কোন রবীন্দ্রভক্ত যখন রবীন্দ্রনাথকে 'ঋষি' আখ্যা দিয়ে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেন রবীন্দ্রবিরোধী মহলে তা তীব্র সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। ১৩২২ (১৯১৫) সনে অর্চনা সম্পাদক মন্তব্য করেন, প্রাচীন কবি কালিদাস ভবভূতি জয়দেব কিংবা আধুনিক কবি মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য লিখেছেন। অথচ কেউ তাঁদের ঋষি আখ্যা দেন নি। 'মন্ত্রদ্রষ্টা' অর্থে রবীন্দ্রনাথকে যদি ঋষি বলা হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্যঙ্গ ও উপহাসই করা হয়।

১৩২৩ সন থেকে ১৩৩৬ সনের মধ্যে প্রবাসী, সবুজপত্র, বিচিত্রা,

মাসিক বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন রচনা প্রকাশিত হয় সে রচনাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এ সময় মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকা। রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা ক্রমশঃ ব্যক্তিগত সমালোচনায় পর্যবসিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে পঙ্কিল করে তুলেছে বলে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রবিরোধী অমরেন্দ্রনাথ রায় ১৩২৭ সনে 'রবিয়ানা' নামক পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীন। অথচ পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ জীবনীকার. মৈত্রেয়ী দেবী মন্তব্য করেন একমাত্র সত্যানুসন্ধানের অভিপ্রায়েই রবীন্দ্রনাথ বারবার রাজনৈতিক মতামত পরিবর্তন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এ সত্যানু-সন্ধান প্রবৃত্তির প্রতি তিনি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

এ ভাবে রবীন্দ্র বিরোধিতার দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত হল।

রবীন্দ্র বিরোধিতার তৃতীয় পর্বে যে সমস্যা দেশব্যাপী শিক্ষিত মহলে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে সে হল সাহিত্যে বাস্তবতার সমস্যা। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল কতকটা দার্শনিক দৃষ্টির সাহায্যে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে বস্তুতন্ত্রহীনতার আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন তা পরিণতি লাভ করে সাহিত্যে বাস্তবতার আন্দোলনে। এ আন্দোলন রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণে ও আধুনিক সাহিত্যের প্রবণতা নির্ণয়ে সহায়তা করেছিল বলে আধুনিক সমালোচনার ইতিহাসে তার যথেষ্ট মূল্য আছে। এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে যে নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা শুরু হয় ইতিপূর্বেকার রবীন্দ্র বিরোধী আন্দোলনে তা প্রায় দেখা যায় নি। পূর্বেকার আন্দোলনের মত শুধুমাত্র গুণীজ্ঞানী মনীষী নন—কয়েকজন প্রতিভাশালী সৃষ্টিধর্মী শিল্পীও এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় এ পর্যায়ের রবীন্দ্র বিরোধী আন্দোলন সমস্ত দেশে ব্যাপ্তি লাভ করে।

সাহিত্যে বাস্তবতার প্রশ্নে এ পর্বে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। 'সাহিত্যে সমাজগঠনশক্তি' নামক প্রবন্ধ লিখে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজগৎ

মায়ার জগৎ, স্বপ্নের জগৎ। এ কারণে রবীন্দ্র সাহিত্য সুন্দর হলেও সজীবতাহীন। সমাজের নিম্নস্তরের জীবনকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তোলেন, যে সাহিত্য লোকহিত এবং লোকশিক্ষার কাজে লাগেনা সে সাহিত্যের ব্যবহারিক মূল্য কী? ১৩২১ সনে 'বাস্তব' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথ রাধাকমলের অভিযোগের উত্তরে লেখেন—সাহিত্যের মুখ্য অন্বিষ্ট রসবস্তু। রসের মধ্যে যে নিত্যতা আছে, বস্তুর মধ্যে তা নেই। সুতরাং বাস্তবকে প্রাধান্য দিয়ে কাব্য সৃষ্টি সম্ভব হলেও তা সাহিত্য পদবাচ্য হয় না। রাধাকমল রবীন্দ্রনাথের বাস্তব সম্পর্কীয় ধারণার উত্তর দেন ১৩২১ সনের সবুজপত্রে—'সাহিত্যে বাস্তবতা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে। সে প্রবন্ধে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেন, সাহিত্য স্থায়িত্ব লাভ করে শুধু নিত্যরসের গুণে নয়—নিত্যবস্তুর গুণে। সে মাসেই প্রমথ চৌধুরী 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কী?' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে সাহিত্যে বাস্তবতা সম্পর্কে নিজের মতামত জানান। এরপর ১৩২২ সালের সাহিত্যে রাধাকমল 'সাহিত্য ও স্বদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর মতামতকে আরও বিশদ করবার চেষ্টা করেন। এ ভাবে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুরাগী এবং রবীন্দ্র বিরোধীদের মধ্যে বাস্তবতার প্রশ্নে বিতর্ক বেশ জমে উঠে। রাধাকমলের লোকহিতের আদর্শকে খণ্ডন করে রবীন্দ্রনাথ বলেন—শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কোন কালেই লোকহিতের বাহন নয়। ফরমায়েশী সাহিত্য রচনা কখনও লেখকের আদর্শ হতে পারে না।

বর্তমান শতাব্দীর তিনের দশকের দিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নতুন করে সাহিত্যিক সংঘর্ষ বাধল নব্যপন্থী সাহিত্যিকদের সঙ্গে। নব্যপন্থীদের মুখপত্র ছিল কল্লোল, প্রগতি এবং কালিকলম পত্রিকা। তবে রবীন্দ্রবিরোধিতায় এ তিনখানি সাহিত্যপত্রের ভূমিকা একই রকম ছিল না। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ ছিলেন সচেতনভাবে সাহিত্যে বাস্তবতাসৃষ্টির সমর্থক। রবীন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এ গোষ্ঠীর প্রধান অভিযোগ হল—সে সাহিত্য আদর্শকে সৌন্দর্যের প্রচ্ছদে ভূষিত করতে গিয়ে জীবনের ক্লেদক্লিষ্ট দিককে যথার্থ বাস্তবধর্মী রূপ দিতে পারে নি—যেমন পেরেছে সমকালীন লেখক শরৎচন্দ্রের উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম অনুপ্রেরণা তাঁর উপন্যাসকেও শুচিতাধর্মী করে তুলেছে।

কালিকলম পত্রিকার সমালোচনার লক্ষ্য ছিল আর্ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী মত পরিবর্তন। 'পঞ্চভূত'-এ তিনি যেভাবে আর্টের ব্যাখ্যা করেন তা তাঁর পরবর্তী ব্যাখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলেই কালিকলমের অভিযোগ। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি প্রগতির যে সমস্ত সমালোচক রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালের রচনাকে শিথিল ও অসংলগ্ন বলে অভিযোগ করেন কালিকলম তাঁদেরও তীব্র সমালোচনা করেন। অরসিক রায় ছদ্মনামে সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজে'র বিদ্রূপ সমালোচনা করার পরে যখন রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বীকৃতিতে অত্যুৎসাহের পরিচয় দেন সে প্রয়াসকেও তীব্র ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করেন কালিকলম। কালিকলম রবীন্দ্রনাথের শেষের পর্যায়ের সমালোচনা এবং কোন কোন কবিতাকে প্রবলভাবে অভ্যর্থিত করেন। যে সমস্ত অর্বাচীন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনার প্রকৃত অর্থ না বুঝে রবীন্দ্রসমালোচনায় প্রবৃত্ত হন কিংবা যে সমস্ত কৌশলী লেখক রবীন্দ্র কবিতার অনুকরণে লিখিত অপরের লেখাকেও রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে চালিয়ে দেবার প্রয়াস পান—তাদেরও তীব্র নিন্দা করেন কালিকলম।

এ সময়ে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বাস্তবতার অনুকরণে এক শ্রেণীর লেখক শ্লীলতা ও ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করে মানবজীবনের নগ্ন চিত্রাঙ্কনে সক্রিয় হয়ে·উঠেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন ১৩৩৪ (১৯২৭) সনের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'সাহিত্যধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে নব্যপন্থীদের তথাকথিত বাস্তববাদী সাহিত্য রসসৃষ্টির দিক থেকে ব্যর্থ বলে ঘোষণা করেন। সে বৎসর ভাদ্র সংখ্যা বিচিত্রায় 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' প্রবন্ধে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের অভিযোগের উত্তর দেন। রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শকে সমর্থন করে সে বৎসরের আশ্বিন মাসের বিচিত্রা পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী রচনা করেন 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা বিচার'। নরেশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণের সমালোচনার যুক্তিপূর্ণ তীক্ষ্ণ উত্তর দেন সে বৎসরের অগ্রহায়ণের বিচিত্রা পত্রিকায়। কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের অকাল মৃত্যুতে নরেশচন্দ্রের সঙ্গে এ বাগ্‌বিতণ্ডার সাময়িক অবসান ঘটে।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি আজীবন শ্রদ্ধান্বিত হলেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি।

১৩৪০ সালের (১৯৩৩) শ্রাবণ মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় দীলিপকুমার রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র 'সাহিত্যের মাত্রা' নামে প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হবার পর শরৎচন্দ্র সে পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের মতের প্রতিবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ, সমসাময়িক নব্যপন্থী ঔপন্যাসিকেরা জীবনের বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘন করেছেন। সাহিত্যের মাত্রা বলতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মূলনীতিকেই বুঝিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের বক্তব্য, সাহিত্যে মূলনীতি বলে কোন স্থির পদার্থ নেই—থাকতে পারেনা। সাহিত্যের মূলনীতি লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কিছু নয়। শরৎচন্দ্রের মতে 'সাহিত্যে মূলনীতি'—কথাটি একটি মরীচিকা মাত্র।

আধুনিক উপন্যাসের আদর্শ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মতবিরোধ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের মতে, আধুনিক উপন্যাসের মননধর্ম মানুষের প্রাণের রূপকে শিল্পরূপ দিতে অসমর্থ। শরৎচন্দ্রের মতে, মানুষের প্রাণের রূপ আধুনিক উপন্যাসে 'চিন্তার সূর্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে'। রবীন্দ্রনাথের ধারণা, আধুনিক সমস্যামূলক উপন্যাস সাময়িকতার লক্ষণাক্রান্ত। সাময়িক আবেদন ফুরিয়ে গেলে সাহিত্যজগতে তাদের জনপ্রিয়তাও ক্ষুণ্ণ হবে। শরৎচন্দ্র কিন্তু মনে করতেন, বর্তমান কালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়। শিল্পী যদি গল্প উপন্যাসে সমসাময়িক জীবনসমস্যার সার্থক শিল্পরূপ দিতে পারেন তবে তার আবেদন কালজয়ী হতে বাধ্য।

'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেন, অতি-আধুনিক লেখকেরা নেহাৎ অভিনবত্ব প্রয়াসী হয়ে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বে-আব্রুতা আমদানি করেছেন। শরৎচন্দ্র এ অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেন ১৩৩৪ সনের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়। শরৎচন্দ্রের বক্তব্য হল, অতি-আধুনিক সাহিত্যের সামগ্রিক রূপের সঙ্গে পরিচিত না হয়েই রবীন্দ্রনাথ এ শ্রেণীর লেখকদের বিরুদ্ধে একতরফা রায় দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে অতি-আধুনিক লেখকেরাও পূর্বযুগের লেখকদের মত বিশ্বাস করেন, শুধুমাত্র জীবনের নোংরা সত্যের রূপ দিলেই সাহিত্য হয়না।

সাহিত্যের মূলনীতি সম্পর্কে বহু তর্ক-বিতর্কের পর রবীন্দ্রনাথ ১৩৩০ (১৯২৬) সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় 'সাহিত্যে নবত্ব' শীর্ষক

প্রবন্ধ লিখে এ বিষয়ে তাঁর শেষ মতামত ব্যক্ত করেন। নব্যপন্থী সাহিত্যের আদর্শ সম্পর্কে এ সমস্ত তর্ক বিতর্কের ফল আর যাই হোক—বহু মনীষী সাহিত্যিকের নতুন নতুন মত প্রকাশে ও পথ সন্ধানের পরিণতিরূপে আধুনিক বাংলা সমালোচনা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থী লেখকদের সাহিত্যিক দ্বন্দ্ব যখন চরমে উঠে রবীন্দ্রনাথকে তখন মীমাংসকের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হতে হয়। ১৩৩৪ (১৯২৭) সনের ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র নবীন ও প্রাচীন পন্থীদের একটি সমাবেশে প্রধান বক্তারূপে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার বে-আব্রু অসংযমকে যেমন নিন্দিত করলেন, তেমনি সমকালীন সমালোচকদের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ও আংশিক সাহিত্যবিচারকে সমালোচনার নামে অবিচার বলেই ঘোষণা করলেন। কবির মতে রচনাকে সামগ্রিকতার দিক থেকে বিচার না করলে কোন সমালোচনাই প্রকৃত মূল্যসমৃদ্ধ হতে পারেনা। রবীন্দ্রনাথের এ বিচার নব্য ও প্রাচীনপন্থী কোন পক্ষকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। উভয়পন্থী সাহিত্যিকই কিছুকাল পরে নতুন করে রবীন্দ্র বিরোধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রাচীনপন্থী 'শনিবারের চিঠি'র পরবর্তী রবীন্দ্র বিরোধিতা কোন সময় রবীন্দ্র সাহিত্যকে লক্ষ্য করে আবার কোন সময় কবিকে ব্যক্তিগত আক্রমণে পর্যবসিত হয়েছিল। বসুমতী সঞ্জীবনী প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী পত্রিকাও রবীন্দ্র-বিদূষণে অত্যুৎসাহী হয়ে উঠেছিল।

সাহিত্যে নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছাবার আগেই যে শক্তিমান সাহিত্যিক শনিবারের চিঠির আশ্রয়ে রবীন্দ্র-বিরোধিতাকে জোরালো করে তোলেন তিনি হলেন মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর মতে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ প্রভৃতি যে সমস্ত মনীষী আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতিকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথে এসে সে সংস্কৃতি বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। বিশ্বপ্রেম ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর অস্পষ্ট ধূঁয়ায় তিনি বাঙালীর সহজ ধর্ম ও সমাজাদর্শকে আচ্ছন্ন করেছেন। মোহিতলালের রবীন্দ্র-বিরোধিতার ভিত্তি সে যুগের অনেক রবীন্দ্র-বিরোধীদের মত এত অগভীর ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও অবিস্মরণীয় সাহিত্যকর্মের প্রতি আজীবন শ্রদ্ধান্বিত হয়েও শুধুমাত্র আদর্শগত পার্থক্যের দিক থেকেই তিনি রবীন্দ্র বিরোধিতার পরিচয় দেন। মোহিতলাল

ছিলেন বাঙালী সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ও প্রচারক। সেজন্য স্বজাতি-প্রীতির সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বসংস্কৃতি-সমন্বয়ের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠলেন তখন তা একান্তভাবে স্বজাতিপ্রেমিক মোহিতলালের তীব্র সমালোচনার সামগ্রী হয়ে উঠল। স্বজাতিপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম নিয়ে শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যই তাঁর রবীন্দ্রবিরোধিতায় বেগ ও বলিষ্ঠতার সঞ্চার করেছিল। না হলে সাহিত্যচিন্তা ও সাহিত্য উপভোগে তিনিও ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মত রসবাদী। তাঁর রবীন্দ্র সাহিত্য উপলব্ধির গভীরতার প্রমাণ 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য' 'রবি-প্রদক্ষিণ' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং 'জয়ন্তী উৎসর্গে' ও বিভিন্ন সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের তারুণ্য-প্রীতির প্রতিও তিনি ছিলেন আজীবন শ্রদ্ধান্বিত। এ কারণে ঔপন্যাসিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি সমালোচক 'শেষের কবিতা'র ভাববস্তু ও রচনা ভঙ্গীকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেও 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ' নামক প্রবন্ধে যৌবনধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ কী অপরূপ কাব্যসৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে—তার চমৎকার ব্যাখ্যা করেন মোহিতলাল। তবে মোহিতলালের সাহিত্যরুচি মুখ্যতঃ ক্লাসিকধর্মী হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যকে প্রথম পর্যায়ের কাব্যের মত তিনি কখনও সমান অনুরাগের চোখে দেখতে পারেন নি।

অবশেষে কবির সপ্ততি বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১১ই পৌষ ১৩৩৮ (১৯৩১) তারিখে দেশের সকল মত এবং পথাবলম্বী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম প্রতিভার স্বীকৃতিতে সাড়ম্বরে কলকাতায় জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান সমাপ্ত করলেন। এতে সাময়িকভাবে রবীন্দ্রবিরোধ স্থগিত হল। একটানা বিরোধিতার আঘাতে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর মন ইতিমধ্যে যে কতটা আহত হয়েছিল তার পরিচয় আছে এ উৎসব উপলক্ষে পঠিত তাঁর ভাষণে। যদিও তিনি সে ভাষণে প্রতিপক্ষের নির্মম সমালোচনাকে তাঁর 'খ্যাতি পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি' বলে অভিহিত করেন তথাপি এ সমস্ত 'অকুণ্ঠিত অকরুণ' সমালোচনা ও 'অপ্রতিহত অসম্মাননা'য় তিনি যে কতটা অন্তর্বেদনা অনুভব করেছিলেন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী তাঁর প্রিয়বন্ধু এণ্ড্রুসকে লিখিত একখানি চিঠিই তার প্রমাণ :

I had been suffering from a time of deep depression

and weariness. But I am sane and sound again and willing to live another hundred years, if critics would spare me ···. However, I am glad that there is still that child in me who has its weakness for human approbation. I must not feel myself too far above my critics.

কিন্তু দেশের সকল শ্রেণীর জ্ঞানী গুণী ও সাহিত্যিক রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্র প্রতিভাকে বরণ করে নিলেও অনুষ্ঠান সমাপ্তিতে দেখা গেল রবীন্দ্র-বিদূষণ নতুন আকারে দেখা দিয়েছে। জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত 'শনিবারের চিঠি'র বিশেষ সংখ্যায় সজনীকান্ত দাস ও তাঁর সহযোগীরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে অশ্রদ্ধাসূচক বাণী উচ্চারণ করলেন রবীন্দ্র বিরোধী তরুণদের মধ্যেও সে শ্রদ্ধাহীনতা দেখা যায়নি। ইতিপূর্বেও সজনীকান্ত দাস অরসিক রায় ছদ্মনামে 'নটরাজে'র বিরূপ সমালোচনা প্রকাশ করে রবীন্দ্র বিরোধী মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সে জনপ্রিয়তাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তিনি স্ব-সম্পাদিত শনিবারের চিঠির 'প্রসঙ্গ কথা' 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগে রবীন্দ্রনাথের অধুনাতম ভাষারীতি, ভাববৈচিত্র্য, চিঠিপত্র, চিত্রশিল্প, বিশ্বমানবতাবোধ ও ধর্মবিশ্বাসকে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় আক্রমণ করে ১৯৩১-৩২ সালের দিকে রবীন্দ্র বিরোধী আবহাওয়াকে আবার উত্তপ্ত করে তোলেন। এমনকি যে সমস্ত রবীন্দ্র-প্রতিভামুগ্ধ সমালোচক রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতাধর্মী কাব্য উপন্যাসের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে সাময়িক পত্রাদিতে প্রবন্ধ সমালোচনাদি লিখতেন, সজনীকান্ত তাঁদেরও তীক্ষ্ণ (কোন কোন সময় ব্যক্তিগত) বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ না করে ছাড়তেন না। এ হেন দুর্ধর্ষ রবীন্দ্র-বিরোধী সজনীকান্তও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র বরণে মুখর হয়েছিলেন—তাঁর পরবর্তী কাব্যে সাহিত্যে এবং জীবনে এ প্রমাণ আছে।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বেও রবীন্দ্রনাথকে দুটি বড় বড় বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল—একটি, 'চার অধ্যায়' উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর, আর একটি জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' নিয়ে। চার অধ্যায় উপন্যাসকে

সাহিত্যের দিক থেকে বিচার না করে বিরোধীপক্ষীয়েরা রাজনৈতিক মতামতের দিক থেকে বলতে শুরু করলেন—ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ স্যার জন এণ্ডারসনের অনুরোধে বিপ্লবীদের হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যই এ বই লিখেছেন। এক বৎসরের মধ্যেই এ বইয়ের সমস্ত কপি বিক্রী হয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রবিরোধীরা আরো প্রচার করলেন, সরকার বিপ্লব দমনের জন্য এ বই কিনে নিয়ে অন্তরীণাবদ্ধদের পড়তে দিচ্ছেন—প্রচার-পুস্তক হিসেবে এ বই সরকারের নিকট প্রচুর সমাদর পাচ্ছে। চার অধ্যায় নিয়ে রবীন্দ্র-বিরোধিতায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। অথচ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে ১৩৪৩ সনের 'কবিতা' পত্রিকায় সাহিত্যের দিক থেকে এ উপন্যাসখানির চমৎকার সমালোচনা করেন অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু।

সমস্ত ভারতবাসীর ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বন্দেমাতরম্-এর বাংলা অংশ বর্জন করবার জন্য যখন কথা উঠে রবীন্দ্রনাথ তখন সে প্রস্তাব সমর্থন করেন। রবীন্দ্র বিরোধীরা এতে কবির উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে মন্তব্য করতে লাগলেন, জাতির মুক্তিমন্ত্র বন্দেমাতরম্-এর অঙ্গচ্ছেদে অনুমোদন মাতৃঅঙ্গে অস্ত্রাঘাত ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের উপর হীন উদ্দেশ্য আরোপ করে বললেন, নিজের 'জনগণমন' সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করাবার প্রয়াসেই তিনি বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদে সমর্থন জানিয়েছেন। রবীন্দ্রবিরোধীদের মধ্যে অত্যুৎসাহী কেউ কেউ বললেন, রাজা পঞ্চম জর্জের দরবার উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবার অভিপ্রায়েই রবীন্দ্রনাথ এ সঙ্গীত রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ অভিযোগের প্রকাশ্য জবাব দিয়েছিলেন একখানি চিঠিতে—যা সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করেছে।

বিশ্বভারতীতে ও কলকাতার অপেশাদারী রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ যখন ভদ্র-ঘরের মেয়েদের নৃত্যগীত ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে উৎসাহিত করেন তখন তাঁর সে প্রচেষ্টাও প্রাচীনপন্থী সংস্কারান্ধ এক শ্রেণীর লোকের নিকট প্রচণ্ড সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। রক্ষণশীল 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন শুরু হয় এবং ক্রমশঃ তা দেশব্যাপী প্রসার লাভ করে। কিন্তু হেমেন্দ্রকুমার রায়, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং চারু রায়ের মত

শিল্পরসিক ব্যক্তি যখন রবীন্দ্রনাথের এ প্রাণধর্মী শিল্পোত্তমকেসমর্থন করেন, তখন এ বিষয়ে প্রতিপক্ষীয়দের রবীন্দ্র সমালোচনা আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ দেশব্যাপী প্রসার লাভ করায় মৃত্যুর পূর্বে জীর্ণ শরীরেও রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হল। বাম রাজনীতিপন্থীরা প্রচার করতে লাগলেন, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর অবসরপুষ্ট বুর্জোয়া সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং যেহেতু ধনীসন্তান হওয়ায় গজদন্তমিনারেই তাঁর বাস—সেজন্যে দেশের জনগণের সুখ দুঃখের সঙ্গে তিনি কখনও পরিচিত হননি এবং তাঁর সাহিত্যেও জনগণের দুঃখ বেদনাকে প্রতিফলিত করতে পারেননি। সুতরাং ভবিষ্যৎ শ্রেণীবন্ধনমুক্ত সমাজে রবীন্দ্র সাহিত্যের কোন মূল্যই থাকবে না। এ অভিযোগের উত্তর দিয়েছিলেন কবি রোগশয্যা থেকে লেখা একখানি চিঠিতে। সে পত্রে তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেন, শিল্পকে রসসমন্বিত ও আনন্দময় করে প্রকাশ করাই হল শিল্পীর ধর্ম। কোন বিশিষ্ট ছাঁচের মধ্যে ঢেলে শিল্পকে গড়ে তুলতে গেলে শিল্পীর স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। চিঠিপত্রে বামপন্থীদের সমালোচনা করলেও জনসাধারণের সুখ দুঃখকে রচনায় সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারেন নি বলে শেষ জীবনে তাঁর দুঃখেরও সীমা ছিল না। কবিতায় তিনি ভবিষ্যৎ জনগণের কবিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতেও কুণ্ঠিত হন নি। সাহিত্যে প্রগতিপন্থীরা অবশ্য কবির এ সমস্ত অন্তর্বিদীর্ণ বাণীকে নিজেদের উদ্দেশ্য প্রতিপাদন করবার কাজে লাগাতে দ্বিধা করেন নি।

১৯১১ (১৩১৮) সনে রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রবরণের পূর্বে থেকেই দেশের জ্ঞানীগুণী, সৃষ্টিধর্মী কবি-সাহিত্যিক এবং সাহিত্যবেত্তা অধ্যাপক সমাজ যেভাবে মূল্যসমৃদ্ধ আলোচনা সমালোচনার সাহায্যে রবীন্দ্র-বরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাতে দেশের মধ্যে রবীন্দ্র বিরোধিতা আর বেশী শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি। এ শ্রেণীর জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডক্টর রাধাকৃষ্ণাণ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার, সুপণ্ডিত ক্ষিতিমোহন

সেন, সুপণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, ডক্টর সরসীলাল সরকার, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু, অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত, অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পুলিনবিহারী সেন, ডক্টর শচীন সেন, অনুরূপা দেবী, প্রফুল্লকুমার সরকার, দীলিপকুমার রায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি অন্যতম। গভীর পাণ্ডিত্য, অনুভবেদ্য রসবোধ ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের সাহায্যে তাঁরা রবীন্দ্র জীবন, রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্ববিকাশ ও মহত্ত্বের দিককে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন। এতে রবীন্দ্রবিরোধী আবহাওয়া ক্রমশঃ নিরুত্তাপ হয়ে সমগ্র দেশব্যাপী শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে জানবার ও বুঝবার প্রয়াস বৃদ্ধি পায়। ১৯৩১ সনে রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম প্রতিভাকে বিশ্বসভায় প্রচারের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর জ্ঞানীগুণীদের রবীন্দ্র-বিষয়ক মন্তব্য এবং আলোচনা-সমালোচনা নিয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করেন The Golden Book of Tagore নামক সংকলন গ্রন্থ। এ সময়ে দেশের আরো কোন কোন জ্ঞানীগুণী ইংরেজীতে অনুরূপ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করে রবীন্দ্র বরণের মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল দেশবাসী 'জয়ন্তী উৎসর্গ' নামক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁর সার্বভৌম প্রতিভার উদ্দেশে যে বিনম্র শ্রদ্ধার অঞ্জলি সমর্পণ করেন সে ধারা আজো দেশের মধ্যে সজীব চেতনায় প্রবহমান।

অবশেষে কবির মহাপ্রয়াণের দীর্ঘ উনিশ বৎসর পরে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববাসীর অন্তর থেকে এ কালজয়ী প্রতিভার উদ্দেশে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি স্বতোৎসারিতভাবে সহস্রধারায় উৎসারিত হয়েছে, তাতে এটা মনে করা অহেতুক নয় যে, সকল বিরোধ বাধাকে অতিক্রম করে অমর কবি রবীন্দ্রনাথ সকল যুগের মানুষের মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

● ● ●

গ্রন্থপঞ্জী

রবীন্দ্র রচনাবলী (অচলিত সংগ্রহ সহ)--সম্পূর্ণ (বিশ্বভারতী ও পশ্চিম বঙ্গ সরকার সংস্করণ)

ডক্টর সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবনী ১—৪ খণ্ড

ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের একদিক

প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্র সরণী

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : রবীন্দ্রচর্চার ভূমিকা

সুধীরচন্দ্র কর : শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা

অমল হোম : পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্কর রায় : জীবন শিল্পী

বিশু মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র সাগর সঙ্গমে

ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : রবীন্দ্রনাথ

সুধীরঞ্জন দাস : আমাদের গুরুদেব

শিবনারায়ণ রায় : সাহিত্য চিন্তা

অরবিন্দ পোদ্দার : রবীন্দ্র মানস

শ্রীশ দাস : সাহিত্য সন্দর্শন

জীবনকৃষ্ণ শেঠ : রবীন্দ্র নাটক প্রসঙ্গ

Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore, (Macmillan, London, 1931)

Brojendranath Seal : New Essays in Criticism

Edward Thompson : Rabindranath Tagore—Poet and Dramatist.

Ramananda Chatterjee (Ed. by): Golden Book of Tagore (1931)

K. Kripalani : Rabinranath Tagore—A Biography.

Rathindranath Tagore : On the Edges of Time

Prof. Humayun Kabir : Introduction : Towards Universal Man (1962)

Sahitya Academy, New Delhi : Rabindra Nath Tagore—A Centenary volume, 1961 :

নিম্নোক্ত প্রবন্ধ সমূহ :

Prof. H. Sanyal : The Plays of Rabindranath Tagore.

Prof. N. K. Siddhanta : Rabindranath's Short Stories.

Prof. B. Bose : Rabindranath Tagore and Bengali Prose.

Rabindranath Tagore : Nationalism.

Personality

Sadhana

Vision of Indian History.

Crisis in Civilization.

The Religion of Man

Creative Unity.

● ● ●

নির্দেশিকা